বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ (১৯৯১-১৯৯৫) ঃ এর কার্যকারিতার পর্যালোচনা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ থেকে এম.ফিল. ডিগ্রীর জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ

জানুয়ারী - ২০০১

Dhaka University Library
384756

তত্ত্বাবধায়ক
এম. সাইফুল্লাহ ভূঁইয়া
অধ্যাপক
রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

384756

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

গবেষক
মোসাম্মৎ মরিয়ম খানম
রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

M.Phil.

GIFT

384756

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

প্রত্যয়ন পত্র

মোসাম্মৎ মরিয়ম খানম, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক এম. ফিল ডিগ্রীর জন্য দাখিলকৃত " বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ (১৯৯১-১৯৯৫)ঃ এর কার্যকারিতার পর্যালোচনা " গবেষণা অভিসন্দর্ভটি সম্পর্কে আমি প্রত্যয়ন করছি যে, এটি আমার প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে লিখিত হয়েছে। এই অভিসন্দর্ভটি অথবা এর কোনো অংশ কোনো ডিগ্রী অথবা প্রকাশনার জন্য কোথাও দাখিল করা হয়নি। এটি এখন কর্তৃপক্ষের নিকট জমা দেয়ার জন্য অনুমোদন করছি।

তারিখ ঃ ০৬-০১-২০০১
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা -১০০০

তত্ত্বাবধায়ক

এম, সাইফুল্লাহ ভূঁইয়া

এম, সাইফুল্লাহ ভূঁইয়া
অধ্যাপক
রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

384756

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

আইনসভার মাধ্যমে একটি দেশের আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক চিত্র ফুটে ওঠে। একজন অনভিজ্ঞ ব্যক্তি যে কোনো দেশের আইনসভা বিশ্লেষণ করে সে দেশের সার্বিক অবস্থা জানতে পারে। এম. ফিলের শিরোনাম নির্ধারণের সময় আমি লক্ষ্য করি যে, আমার জানামতে গবেষকরা বিভিন্ন বিষয় নিয়ে গবেষণা করলেও বাংলাদেশে আইনসভার ওপর তেমন গবেষণামূলক কাজ হয়নি। অথচ আইনসভা প্রত্যেক ব্যক্তির কাছে যেমন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তেমনি এর বাস্তব ভূমিকা সম্পর্কে বাংলাদেশের সচেতন নাগরিকদেরও জানার প্রয়োজন আছে বলে আমি মনে করি। নানা প্রতিকূলতার মধ্যে গবেষণা কাজটি সমাপ্ত করতে হয়েছে বলে ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকা স্বাভাবিক, এজন্য প্রথমেই সবার কাছে ক্ষমাপ্রার্থী। তবে এ কথা সত্য যে, গবেষক হিসেবে আমার ধৈর্য্য ও আন্তরিকতার কোনো অভাব ছিলো না।

আমার এই গবেষণা কাজে অনেকের অবদান রয়েছে। সন্দর্ভটি সমাপ্ত করার প্রাক্কালে আমি প্রথমেই আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি আমার পরম শ্রদ্ধেয় শিক্ষক, তত্ত্বাবধায়ক অধ্যাপক এম, সাইফুল্লাহ ভূঁইয়া, যাঁর সক্রিয় সহযোগিতা ও তত্ত্বাবধারন ছাড়া আমার পক্ষে গবেষণা কাজটি বাস্তবায়ন করা সম্ভব হতো না। তিনি এই গবেষণা কাজের প্রতিটি পর্যায়ে ধৈর্য্য সহকারে আমার বক্তব্য শুনেছেন, পাণ্ডুলিপিটি সম্পূর্ণ পড়েছেন এবং মূল্যবান পরামর্শ দিয়ে এর উৎকর্ষ সাধন করেছেন। তিনি এই কাজে যেভাবে তাঁর মূল্যবান সময় ব্যয় করেছেন এজন্য তাঁর কাছে আমি চিরঋণী। এছাড়া, আমি সার্বিকভাবে সহযোগিতা পেয়েছি আমার পরম শ্রদ্ধেয় শিক্ষক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ফেরদৌস হোসেন, অধ্যাপক ডঃ ডালেম চন্দ্র বর্মন। যাঁরা আমার কাজের নেপথ্যে বিভিন্ন সময়ে সাহায্য-সহযোগিতা ও উৎসাহ দিয়ে প্রেরণা যুগিয়েছেন। সেজন্য আমি তাঁদের নিকট কৃতজ্ঞ। কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করছি সহপাঠি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রভাষক মনিরুল ইসলাম মনিকে। সে আমাকে বিভিন্নভাবে সাহায্য ও উৎসাহ দিয়েছে।

384756

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার, বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ গ্রন্থাগার, ঢাকা পাবলিক গ্রন্থাগার, বাংলা একাডেমী গ্রন্থাগার ও পত্রিকা অফিস প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান থেকে আমার গবেষণা তথ্য ও উপকরণ সংগ্রহ করেছি। এসব প্রতিষ্ঠানে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দের নিকট হতে আমার গবেষণা কাজে

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

অনেক সহায়তা পেয়েছি। আমি তাঁদেরকে শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করছি। স্মরণ করছি রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্যেক শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের এবং রেজিষ্ট্রার ব্রিডিংয়ে এম.ফিল বিভাগের সাথে জড়িত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের। এই গবেষণা কাজটিতে সহায়তা করার জন্য তাঁদের অবদান কম নয়। তাঁদের নিকট রইলো আমার অশেষ কৃতজ্ঞতা। এছাড়াও কম্পিউটারস কম্পোজের ক্ষেত্রে যাঁরা মূল্যবান উপদেশ ও শ্রম দিয়েছেন তাঁরা হলেন এ.এইচ. কম্পিউটার সেন্টারের কর্মকর্তা আনোয়ার হোসেন এবং তুহিন আলম। তাঁরা খুব যত্নসহকারে আমার থিসিস পেপারটি মুদ্রন করেছেন। আমি তাঁদেরকে ধন্যবাদ জানাই। ধন্যবাদ জানাই আমার রুমমেট সন্ধ্যাদি, বীণা ও নাদিরাকে। যারা সর্বদা গবেষণা পেপারটি লিখার সময় ভাষাগত শ্রুতিমধুর ও শুদ্ধ বানানে সাহায্য করেছে। এছাড়াও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি তাঁদের প্রতি যে সব সাক্ষাৎ প্রার্থীরা তাঁদের মূল্যবান সময় ব্যয় করে ধৈর্য্যসহকারে সাক্ষাৎ দিয়ে গবেষণা কর্মকে সমৃদ্ধ করেছেন।

আমি কৃতজ্ঞতা জানাই আমার পরম শ্রদ্ধেয় বাবা-মা, বড় ভাই হাফিজুল ইসলাম, বোন খালেদা খানম ও দুলালীকে। যাঁদের প্রেরণায় আজ আমি এতোদূর আসতে সক্ষম হয়েছি। আমি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি ছোট ভাই আসাদের প্রতি। যে আমার গবেষণা কাজটি সমাপ্ত করার ক্ষেত্রে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সাহায্য-সহযোগিতা করেছে। জীবনের চরম হতাশার মুহূর্তে সহানুভূতি ও সহমর্মিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছে।

সবশেষে আমার গবেষণা কাজটি বাংলাদেশের চলমান আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক উপলব্ধির ক্ষেত্রে যদি এতোটুকু অবদান রাখে তাহলেই আমার পরিশ্রম সার্থক হয়েছে বলে মনে করবো।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
জানুয়ারী-২০০১

মোসাম্মৎ মরিয়ম খানম

Dhaka University Institutional Repository

সূচীপত্র

		প্রত্যয়নপত্র	এক
		কৃতজ্ঞতা স্বীকার	দুই-তিন
		সারণী তালিকা	পাঁচ-ছয়
প্রথম অধ্যায়	ঃ	ভূমিকা	১-১২
দ্বিতীয় অধ্যায়	ঃ	বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস	১৩-৩৯
তৃতীয় অধ্যায়	ঃ	জাতীয় সংসদের সাংবিধানিক কাঠামো, কার্যপ্রণালী, ক্ষমতা, কাজ ও মর্যাদা	৪০-৬৬
চতুর্থ অধ্যায়	ঃ	জাতীয় সংসদ ও সাংসদদের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক পটভূমি	৬৭-৮৯
পঞ্চম অধ্যায়	ঃ	পঞ্চম সংসদের কার্যকলাপ	৯০-১৪০
ষষ্ঠ অধ্যায়	ঃ	সংসদীয় গণতন্ত্র ও কার্যক্রমের মূল্যায়ন (১৯৯১-১৯৯৫)	১৪১-১৭৩
সপ্তম অধ্যায়	ঃ	উপসংহার	১৭৪-১৯০
		পরিশিষ্ট , উত্তরদাতাদের জন্য নির্বাচিত প্রশ্নমালা	১৯১-১৯২
		গ্রন্থপঞ্জী	১৯৩-২০০

Dhaka University Institutional Repository

সারণী তালিকা

সারণী নং		পৃষ্ঠা নং
২.১ ঃ	১৯০৮ সালে ভারতীয় বৃটিশ সরকার সুপারিশকৃত আইনসভার কাঠামো	২০
৪.১ ঃ	অস্থায়ী রাষ্ট্রপতির উপদেষ্টা পরিষদ	৭৩
৪.২ ঃ	১৯৭৩, ১৯৭৯, ১৯৮৬, ১৯৮৮ ও ১৯৯১ এর নির্বাচনে অংশগ্রহণকৃত ভোটার, প্রার্থী ও রাজনৈতিক দলের তুলনামূলক চিত্র	৭৫
৪.৩ ঃ	১৯৯১ সালের সংসদ নির্বাচনের ফলাফলঃ দলীয় অবস্থান (বিজয়ী আসনের)	৭৬
৪.৪ ঃ	প্রথম ('৭৩) ও পঞ্চম ('৯১) পার্লামেন্টে নির্বাচিত সাংসদদের বয়সের তুলনামূলক অবস্থান	৭৮
৪.৫ ঃ	প্রথম ('৭৩) ও পঞ্চম ('৯১) সংসদে নির্বাচিত সাংসদদের শিক্ষাগত মানের তুলনামূলক চিত্র	৮০
৪.৬ ঃ	১৯৯১ সালে জাতীয় সংসদে নির্বাচিত সদস্যদের পেশাগত অবস্থান	৮১
৪.৭ ঃ	১৯৫৪, ১৯৭৩, এবং ১৯৯১ এ আইনসভায় নির্বাচিত সাংসদদের তুলানামূলক পেশাগত অবস্থান	৮২
৪.৮ ঃ	পঞ্চম পার্লামেন্টে নির্বাচিত সাংসদদের রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা	৮৪
৪.৯ ঃ	প্রথম ও পঞ্চম পার্লামেন্টে নির্বাচিত সাংসদদের সংসদীয় অভিজ্ঞতার অবস্থান	৮৫
৪.১০ ঃ	পঞ্চম পার্লামেন্টে নির্বাচিত সাংসদদের রাজনৈতিক অতীত	৮৭
৫.১ ঃ	পঞ্চম সংসদে উত্থাপিত ও গৃহীত সরকারী সাধারণ বিলের অধিবেশন-ওয়ারী সংখ্যা	৯২
৫.২ ঃ	পঞ্চম সংসদে আইন প্রণয়নমূলক কাজের খতিয়ান	৯৬
৫.৩ ঃ	পঞ্চম সংসদে আইনসভা কর্তৃক শাসন বিভাগ নিয়ন্ত্রণমূলক কার্যকলাপের খতিয়ান	১৩৪
৬.১ ঃ	কমিটি সমূহের রিপোর্ট এবং সুপারিশ কদাচিৎ বাস্তবায়নে সরকারের স্বচ্ছতা বা জবাবদিহিতার ওপর মতামত	১৫৩
৬.২ ঃ	পঞ্চম সংসদে প্রায় এক-তৃতীয়াংশ অধ্যাদেশ সংক্রান্ত আইন পাশ কি গণতান্ত্রিক? এর ওপর মতামত	১৫৪

Dhaka University Institutional Repository

সারণী নং		পৃষ্ঠা নং
৬.৩ ঃ	পঞ্চম সংসদে উপনির্বাচনগুলোর অবাধ, নিরপেক্ষ এবং সুষ্ঠভাবে সম্পন্ন সংক্রান্ত মতামত	১৫৯
৬.৪ ঃ	সংসদ থেকে বিরোধী দলগুলোর পদত্যাগই ছিলো একমাত্র পথ-এর ওপর মতামত	১৬০
৬.৫ ঃ	সরকারী দলের সংসদ ভেঙ্গে দেয়া সর্ম্পকে মতামত	১৬১
৬.৬ ঃ	ষষ্ঠ পার্লামেন্ট নির্বাচন কি অবাধ ও নিরপেক্ষ ছিলো? এর ওপর মতামত	১৬২
৬.৭ ঃ	বিরোধী দলগুলোর তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলন কি গণতান্ত্রিক? এর ওপর মতামত	১৬৩
৬.৮ ঃ	বিরোধী দলগুলো কেবলমাত্র বিরোধিতার জন্য বিরোধিতা করে- এর ওপর মতামত	১৬৫
৬.৯ ঃ	পঞ্চম পার্লামেন্টের কার্যবাহ সংসদীয় পদ্ধতিতে সম্পন্ন সংক্রান্ত মতামত	১৬৮
৭.১ ঃ	প্রথম ও পঞ্চম সংসদীয় পার্লামেন্টের আইন প্রণয়নমূলক কাজের তুলনামূলক চিত্র	১৮২
৭.২ ঃ	প্রথম ও পঞ্চম সংসদীয় সংসদে শাসন বিভাগের ওপর আইনসভা কর্তৃক নিয়ন্ত্রণমূলক কার্যকলাপের তুলনামূলক চিত্র	১৮৬

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়
ভূমিকা

সরকারের তিনটি বিভাগের মধ্যে আইন বিভাগকে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হয়। কারণ আইন পরিষদ আইন প্রণয়ন না করলে অন্য দুটি বিভাগ স্বাভাবিকভাবে অপ্রয়োজনীয় হয়ে পড়বে। আইন পরিষদ কর্তৃক প্রণীত আইনকে শাসন বিভাগ কার্যকর করে এবং বিচার বিভাগ আইন ভঙ্গকারীকে শাস্তি প্রদান করে।[১] বিশ্বের প্রায় সব দেশেই আইনসভা রয়েছে। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে আইনসভা জনগণের দ্বারা নির্বাচিত সংস্থা হিসেবে সর্বোচ্চ মর্যাদার অধিকারী এবং সরকারের তহবিল নিয়ন্ত্রণ ও সাধারণ নীতি-নির্ধারণ করে থাকে। এমনকি একনায়কতান্ত্রিক কিংবা একদলীয় শাসন ব্যবস্থাতেও আইনসভা তাত্ত্বিকভাবে জনগণের প্রতিনিধি হিসেবে সর্বোচ্চ সংস্থা বলে আখ্যায়িত।

বর্তমানে বিলুপ্ত সোভিয়েত ইউনিয়নের শাসনতন্ত্রে সুপ্রীম সোভিয়েত ছিলো "রাষ্ট্রক্ষমতার সর্বোচ্চ সংস্থা"। সংবিধান অনুযায়ী সুপ্রীম সোভিয়েতকে আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত ক্ষমতা, গণভোটে বিল পাস করার সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা, অর্থসংক্রান্ত ক্ষমতা, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক নীতি-নির্ধারণ সংক্রান্ত ক্ষমতা, নতুন প্রজাতন্ত্রের অন্তর্ভুক্তি করা, শাসন বিভাগকে নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা অর্থাৎ মন্ত্রীপরিষদকে তাঁদের সম্পর্কিত কার্যাবলীর জন্য আইনসভার নিকট জবাবদিহি করতে হতো। সর্বোপরি, সুপ্রীম সোভিয়েত কর্তৃক নির্বাচিত সভাপতি মন্ডলী বা প্রেসিডিয়ামরাও আইনসভার নিকট দায়িত্বশীল ছিলেন। সংবিধানে সোভিয়েত ইউনিয়নের আইনসভার সর্বোচ্চ মর্যাদা থাকা সত্ত্বেও একদলীয় শাসনব্যবস্থা ও প্রেসিডিয়ামদের কারণে সে দেশে আইনসভা কোনো কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারেনি। জুলিয়ান টাউস্টারের মতে, তত্ত্বগতভাবে সুপ্রীম সোভিয়েত সর্বোচ্চ আইন প্রণয়নকারী সংস্থা হলেও বাস্তবে তা প্রধানতঃ অনুমোদনকারী সংস্থা ছাড়া আর কিছুই নয়।[২] পৃথিবীর অন্যান্য একদলীয় শাসন ব্যবস্থাতেও আইনসভা একটি অক্ষম প্রতিষ্ঠান হিসাবেই পরিচিত। বাংলাদেশে একদলীয় শাসনামলও অনুরূপ ছিলো।

উল্লেখ্য যে, একনায়কতান্ত্রিক কিংবা একদলীয় শাসন ব্যবস্থাতে আইনসভার তেমন ভূমিকা না থাকলেও বস্তুতঃ সকল রাষ্ট্র ব্যবস্থায় আইনসভাকে এমন একটি বিভাগ বলে মনে করা হয় যা নির্বাচকমন্ডলীর প্রত্যক্ষ প্রতিনিধি।

আইনসভার কাজ

আইনসভার কাজ সম্পর্কে কোনো সর্বজন স্বীকৃত সুনির্দিষ্ট তালিকা নেই। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলোতে সরকার পদ্ধতি ভিন্ন ভিন্ন রকম হওয়ার কারনে আইনসভার কাজ ও ক্ষমতার তারতম্য

Dhaka University Institutional Repository

হয়ে থাকে। রাষ্ট্রপতি পদ্ধতি (Presidential system) ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত। এখানে শাসন বিভাগ ও আইনসভা সম-মর্যাদার অধিকারী। কিন্তু সংসদীয় পদ্ধতির (Parliamentary system) সরকারের শাসন বিভাগ আইনসভার নিকট দায়ী। তবে সরকার পদ্ধতি যে ধরনেরই হোক না কেন বিশ্বের সকল গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের আইনসভা কতগুলো অভিন্ন কাজ সম্পাদন করে থাকে।

ডব্লিউ, এফ, উইলোবি (W.F. Willoughby) সাধারণভাবে আইনসভার কাজগুলোকে নিম্নোক্ত কয়েকটি শ্রেণীতে ভাগ করে আলোচনা করেছেনঃ আইন প্রণয়ন, বাজেট অনুমোদন, সংবিধান সংশোধন, নির্বাচন, জনমত গঠন, অনুসন্ধান এবং শাসন সংক্রান্ত।[৩] ফ্রেড আর, হ্যারিস (Fred R. Harris) মার্কিন কংগ্রেসের ক্ষমতা ও কার্যাবলীর আলোকে আইনসভার কাজকে দশটি ভাগে বিভক্ত করেছেন, যথাঃ আইন প্রণয়ন, শাসন বিভাগের ওপর নিয়ন্ত্রণ, রাজনৈতিক শিক্ষাদান, প্রতিনিধিত্বকরণ, তহবিল নিয়ন্ত্রণ, বৈদেশিক নীতি নির্ধারণ, অভিশংসন, অনুসন্ধান পরিচালনা, সংবিধান সংশোধন এবং নির্বাচন।[৪] সত্যসাধন চক্রবর্তী এবং নিমাই প্রামাণিক তাঁদের গ্রন্থে কংগ্রেসের ক্ষমতা ও কার্যাবলীকে প্রধানতঃ সাতটি ভাগে বিভক্ত করে আলোচনা করেছেন, যথা- আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত ক্ষমতা, শাসনতন্ত্র সম্পর্কিত ক্ষমতা, নির্বাচন সংক্রান্ত ক্ষমতা, শাসন সংক্রান্ত ক্ষমতা ও বিচার সংক্রান্ত ক্ষমতা, নির্দেশমূলক ও তত্ত্বাবধান সংক্রান্ত ক্ষমতা এবং তদন্ত করার ক্ষমতা।[৫] মাইকেল স্টুয়ার্ট (Michael Stewart) -এর মতে বৃটিশ পার্লামেন্ট প্রধানতঃ চারটি কাজ সম্পাদন করে থাকে। এগুলো হচ্ছেঃ আইন প্রণয়ন, শাসন বিভাগের ওপর সতর্ক দৃষ্টি রাখা ও সমালোচনা করা, বিতর্ক অনুষ্ঠান করা এবং আর্থিক বিষয়াদি নিয়ন্ত্রণ করা।[৬] সত্যসাধন চক্রবর্তী ও নিমাই প্রামাণিকের মতে কমনসভার ক্ষমতা ও কার্যাবলীকে সাধারণভাবে ছয়শ্রেণীতে বিভক্ত করে আলোচনা করা যেতে পারে, যথা-আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত ক্ষমতা, অর্থ সংক্রান্ত ক্ষমতা, সরকার গঠনের ক্ষমতা, সরকারকে নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা, অভিযোগের প্রতিকার করার ক্ষমতা এবং জনমত গঠন সংক্রান্ত কার্য।[৭] ডি, সি, গুপ্ত (D.C. Gupta) ভারতের পার্লামেন্টের কার্যাবালীর বর্ণনা দিতে গিয়ে আইনসভার কাজকে ছয়টি শ্রেণীতে ভাগ করেছেন। যথাঃ আইন প্রণয়ন, সরকারী আয়-ব্যয় নিয়ন্ত্রণ, সংবিধান সংশোধন, শাসন বিভাগের ওপর নিয়ন্ত্রণ, অভিশংসন এবং জনগণের অভাব-অভিযোগ জ্ঞাপন।[৮]

উপরোল্লিখিত বিভিন্ন রাজনৈতিক ব্যবস্থায় এবং বিভিন্ন আঞ্চলিক আইনসভার ক্ষমতা ও কার্যাবলী সম্পর্কে বিভিন্ন লেখক ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানী যে বর্ণনা দিয়েছেন তা থেকে বলা যায় যে, আইনসভা সাধারণতঃ নিম্নে বর্ণিত অভিন্ন কাজগুলো সম্পাদন করে থাকে।

ক) আইন প্রণয়নমূলক কাজ (Legislative function)

Dhaka University Institutional Repository

খ) আর্থিক ক্ষমতা (Financial power)

গ) সংবিধান সংক্রান্ত ক্ষমতা (Constituent power)

ঘ) শাসন বিভাগকে নিয়ন্ত্রণ (Control over the executive) ঃ সংসদীয় শাসন ব্যবস্থায় আইনসভা নিম্নোক্ত কয়েকটি পদ্ধতির মাধ্যমে শাসন বিভাগকে নিয়ন্ত্রণ করে থাকে।

ক) অনাস্থা ও নিন্দাসূচক প্রস্তাব (Vote of no-confidence and censure)

খ) প্রশ্নোত্তর (Question and answer)

গ) মুলতবী প্রস্তাব (Adjournment motion)

ঘ) মনোযোগ আকর্ষণী প্রস্তাব (Call attention motion)

ঙ) সংক্ষিপ্ত আলোচনা (Discussion for short duration)

চ) সিদ্ধান্ত - প্রস্তাব (Resolution)

রাষ্ট্রপতি শাসিত শাসন ব্যবস্থায় মন্ত্রীপরিষদের সদস্যরা সাধারণতঃ আইনসভায় উপস্থিত থাকতে পারেন না। তাই এখানে শাসন বিভাগকে নিয়ন্ত্রণের জন্য উপরোল্লিখিত পদ্ধতিগুলো কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারেনা। তবে রাষ্ট্রপতি শাসিত শাসন ব্যবস্থায় আইনসভা নিম্নোক্ত উপায়ে শাসন বিভাগের ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রয়োগ করে থাকে।

ক) তহবিল নিয়ন্ত্রণ (Power of the purse)

খ) নির্বাচন সংক্রান্ত ক্ষমতা (Electoral power)

গ) অনুসমর্থন (Ratification)

ঘ) অভিশংসন করার ক্ষমতা (Impeachment)

ঙ) তদন্ত করার ক্ষমতা (Investigation)

অনেক গণতান্ত্রিক দেশে আইনসভা জনমত গঠনেও সহায়তা করে। পার্লামেন্টে যে সব তর্কবিতর্ক ও আলোচনা অনুষ্ঠিত হয় তার ফলে রাষ্ট্রের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সঠিক তথ্য বের হয়ে আসে। দেশের প্রচার মাধ্যমগুলো আইনসভার কর্মকান্ড সঠিকভাবে তুলে ধরতে পারলে জনগণ শিক্ষিত ও সচেতন হলে রাষ্ট্রের বিভিন্ন বিষয়ে তথ্য সম্বলিত ও নির্ভরযোগ্য জ্ঞান লাভ করে তারা সঠিক মতামত প্রদান করতে পারে।

Dhaka University Institutional Repository

সাধারণতঃ পার্লামেন্ট উন্নত রাজনৈতিক ব্যবস্থাসমূহে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। তাই পার্লামেন্টকে রাজনৈতিক ব্যবস্থার একটি উপ-ব্যবস্থা (Sub system) হিসেবে আখ্যায়িত করা যায়। কিন্তু উন্নয়নশীল দেশ সমূহের রাজনীতি অধ্যয়নে সামরিক বাহিনী, স্বার্থগোষ্ঠী (Interest group), আমলাতন্ত্র, রাজনৈতিক দল প্রভৃতি রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের তুলনায় আইনসভা বা পার্লামেন্টের ওপর খুব কম গুরুত্ব দেয়া হয়ে থাকে। যে সব পণ্ডিত ব্যক্তি উন্নয়নশীল দেশের আইনসভা সম্পর্কে অধ্যয়ন করেছেন তাঁদের অনেকেই এসব আইনসভাকে শাসন বিভাগের সিদ্ধান্ত অনুমোদনকারী "রাবার ষ্ট্যাম্প" হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। তাঁরা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, কানাডা প্রভৃতি উন্নত রাজনৈতিক ব্যবস্থার আইনসভার ভূমিকার সঙ্গে তুলনা করে এরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন।

উন্নয়নশীল দেশসমূহে শাসন বিভাগ কিংবা অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের তুলনায় আইনসভার ভূমিকা নগণ্য হলেও সমগ্র রাজনৈতিক ব্যবস্থায় এর কোনো গুরুত্ব বা প্রভাব নেই একথা সম্ভবত বলা ঠিক হবে না। পিটার পাইন (Peter Pyne) ইকুয়েডরের কংগ্রেসের কার্যাবালী আলোচনা করে দেখিয়েছেন যে, উন্নয়নশীল দেশসমূহেও পার্লামেন্ট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। তাঁর মতে উন্নয়নশীল দেশসমূহে পার্লামেন্ট প্রধানতঃ দুই ধরনের কাজ করে থাকে, যেমন - সিদ্ধান্তমূলক (Decisional) ও বৈধকরণমূলক (Legitimation)[৯] পিটার পাইন আরো বলেন, আইন প্রণয়ন অর্থাৎ বিল উত্থাপন, সংশোধন বা নাকচকরণ এবং শাসন বিভাগের ওপর নিয়ন্ত্রণ (Administrative surveillance) সংক্রান্ত কাজগুলো সিদ্ধান্তমূলক কাজের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। সাধারণ আইন ও অর্থসংক্রান্ত আইন (বাজেট) প্রণয়নের মাধ্যমে আইনসভা সরকারের সাধারণ নীতি ও আর্থিক ব্যবস্থা নির্ধারণ করে থাকে। এছাড়া পূর্বে বর্ণিত বিভিন্ন পদ্ধতিতে শাসন বিভাগকে নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে পার্লামেন্ট উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন এবং সরকারের নীতি বা কর্মসূচীকে প্রভাবিত করতে পারে।

পার্লামেন্টের বৈধকরণমূলক কাজ বলতে পিটার পাইন বুঝিয়েছেন সরকারের শাসন করার অধিকার প্রতিষ্ঠা বা জোরদার করার ক্ষেত্রে অবদান যোগানো। তিনি বলেন, পার্লামেন্ট একটি জনপ্রতিনিধিত্বমূলক সংস্থা হিসেবে নিয়মিতভাবে অধিবেশনে মিলিত হয়ে সরকারী কার্যক্রম সম্পর্কে বিতর্ক ও আলোচনার মাধ্যমে দেশের চাহিদা অনুসারে আইন প্রণয়ন ও বাজেট পাস করে সরকারকে একটা গণতান্ত্রিক রূপ ও রাজনৈতিক বৈধতা প্রদান করতে পারে। অপরপক্ষে, পার্লামেন্ট যদি সরকারের চাহিদা অনুসারে আইন ও বাজেট প্রণয়নে অসম্মত হয়; কিংবা সরকারের কর্মসূচী বার বার প্রত্যাখান করে তবে সরকারের বিনষ্ট হতে পারে।[১০]

Dhaka University Institutional Repository

তাছাড়া, একটা উপ-ব্যবস্থা হিসেবে পার্লামেন্টের ওপর তার নিজস্ব বৈধতা নির্ভর করে এবং তা গোটা রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে প্রভাবিত করতে পারে। পার্লামেন্টের বৈধতা অনেকাংশ নির্ভর করবে তার সিদ্ধান্তমূলক কাজের সাফল্য বা ব্যর্থতার ওপর।[১১] সেজন্য নির্বাচিত প্রতিনিধি হিসেবে পার্লামেন্ট সদস্যগণ, বিশেষ করে বিরোধী দলীয় সদস্যগণ আইন প্রণয়নমূলক কার্যকলাপে অংশগ্রহণের পর্যাপ্ত সুযোগ পাচ্ছেন কিনা, শাসন বিভাগকে নিয়ন্ত্রণের জন্য সংসদীয় পদ্ধতিসমূহ যথাযথভাবে প্রয়োগ করা যাচ্ছে কিনা এবং সর্বোপরি পার্লামেন্ট সদস্যগণ সরকারের নীতি বা কার্যকলাপকে প্রভাবিত করতে পারছেন কিনা এগুলো বিশেষভাবে বিবেচনার বিষয়।

যদি পার্লামেন্ট কেবল "রাবার ষ্ট্যাম্প" হিসেবে কাজ করে এবং বিরোধী দলসমূহ পার্লামেন্টের মাধ্যমে সরকারের সিদ্ধান্ত বা নীতিসমূহ প্রভাবিত বা সংশোধন করতে ব্যর্থ হয় তবে তারা পার্লামেন্টের প্রতি আস্থা হারিয়ে ফেলবে এবং দাবি-দাওয়া প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যে পার্লামেন্টের বাইরে সহিংস আন্দোলনমূলক কার্যকলাপে লিপ্ত হবে, যার ফলে গোটা রাজনৈতিক ব্যবস্থার স্থিতিশীলতা নষ্ট হতে পারে। তাছাড়া দেশে এমন কিছু রাজনৈতিক দল থাকতে পারে যারা সংসদীয় গণতন্ত্রের প্রতি আস্থাশীল নয় বরং বিপ্লবের মাধ্যমে তাদের আদর্শ (যেমন সমাজতন্ত্র) প্রতিষ্ঠার জন্য পার্লামেন্টের বাইরে সহিংস কার্যকলাপে আত্মনিয়োগ করে। ফলে সরকারও দমনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে। সেক্ষেত্রে শাসক দল ও বিরোধী দলসমূহ পার্লামেন্টকে বিরোধ মীমাংসার ফোরাম হিসেবে ব্যবহার না করে পার্লামেন্টের বাইরে সংঘর্ষে লিপ্ত হতে পারে। ফলে পার্লামেন্ট তার কার্যকারিতা হারায় এবং গোটা রাজনৈতিক ব্যবস্থার বৈধতা ক্ষুণ্ন হতে পারে।

বাংলাদেশের আইনসভা

সংসদই হচ্ছে রাজনৈতিক দলের আদর্শ বাস্তবায়নের অন্যতম প্রধান গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান। কিন্তু এটা দুঃখজনক হলেও সত্য, জনগণের প্রতিনিধিরা জনগণের স্বার্থ রক্ষা না করে বিভিন্ন সময় ক্ষমতাবানদের স্বার্থ রক্ষা করেছেন। তাদের একটি অংশ জনগণ কর্তৃক অর্পিত বৈধ শক্তির অপব্যবহার করে অবৈধ ক্ষমতাকে বৈধতা দিয়েছেন। তারা সংবিধানের মূল কাঠামো ধ্বংস করেছেন। সংসদ অচল করে দিয়েছেন। বাংলাদেশের প্রতিটি সংসদে জনগণের পরম অভিপ্রায়ের যে অভিব্যক্তি ঘটেছে তাকে রাজনৈতিকভাবে নিশ্চল করার প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হয়েছে।[১২] বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের ইতিহাস অসম্ভব আত্মত্যাগময় সংগ্রামের ইতিহাস। দুর্ভাগ্যই বলতে হয় উপনিবেশ উত্তর স্বাধীন বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের উদ্দেশ্য দু'দশকেও বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর মঙ্গল বয়ে আনেনি।

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশ নামক ভূখন্ডটি ১৭৫৭ থেকে ১৯৪৭ সন পর্যন্ত প্রায় দু'শ বছর ব্রিটিশ উপনিবেশিক শাসন এবং ১৯৪৭ থেকে ১৯৭১ পর্যন্ত প্রায় ২৪ বছর পাকিস্তানী "অভ্যন্তরীণ উপনিবেশবাদের" অধীন ছিলো। এক সশস্ত্র সংগ্রামের মধ্য দিয়ে ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে স্বাধীন বাংলাদেশের জন্ম হয় এবং স্বাধীনতার এক বছরের মধ্যে দেশে একটি পূর্ণাঙ্গ সংবিধান প্রবর্তিত হয়। বিশ্বের অন্যান্য দেশের ন্যায় বাংলাদেশের সংবিধানেও জনপ্রতিনিধিত্বকারী সংস্থা হিসেবে "জাতীয় সংসদ" নামে একটি আইনসভার ব্যবস্থা রয়েছে, যা "পার্লামেন্ট" নামেও পরিচিত। মওদুদ আহমেদ এ প্রসংগে লিখেছেন, সম্প্রতি দুই দশকের জনগণের উচ্চাকাঙ্ক্ষা থেকে শিক্ষা নিয়েই বাংলাদেশের সংবিধান পাশ্চাত্যধারায় পার্লামেন্টারি পদ্ধতি বাস্তবায়নের বিবেচনা করেছে। আওয়ামীলীগ শুরুতেই একটি "সত্যিকার গণতন্ত্র" প্রতিষ্ঠার প্রতিজ্ঞা করেছিলো যখন তারা সংগ্রাম করেছিলো এবং বহু বছর ত্যাগের এখনই পরিপূর্ণতার সময় কারণ সরকারের ক্ষমতা অবাধ।"[১৩]

রক্তাক্ত স্বাধীন বাংলাদেশে যা আশা করা হয়েছিলো তাই হলো। নতুন রাষ্ট্রের সূচনা লগ্নেই জনগণ লাভ করে গণতান্ত্রিক সংবিধান। ১৯৭২ এর সাময়িক সংবিধান আদেশ (Provisional Constitution Order 1972) বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠিত হয় সংসদীয় গণতন্ত্র। সংসদের নিকট দায়ী মন্ত্রীপরিষদ হলো রাজনৈতিক ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দু। ১৯৭২ -এর সংবিধানে সে ধারা অব্যাহত রইলো। ১৯৭২-এর সংবিধানের মূলসুর সংসদীয় গণতন্ত্র। প্রাপ্ত বয়স্কদের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত জাতীয় সংসদ এবং জাতীয় সংসদের নিকট দায়ী মন্ত্রীপরিষদ এ সংবিধানের মৌল বক্তব্য। মনে হয়েছে, এ জাতির এতোদিনের প্রত্যাশা পূর্ণ হলো। কিন্তু এ অবস্থা বেশী দিন টিকেনি। মাত্র ক'বছরের মধ্যে সে কাঙ্খিত ব্যবস্থা এক পা দু'পা করে কর্তৃত্ববাদী ব্যবস্থায় রূপান্তরিত হলো।[১৪] ১৯৭৫ -এর ২৫ জানুয়ারী চতুর্থ সংশোধনীর দ্বারা সংসদীয় ব্যবস্থার পরিবর্তে রাষ্ট্রপতি ব্যবস্থা প্রবর্তনের মাধ্যমে জাতীয় সংসদকে একটি অধীনস্থ সংস্থায় পরিণত করা হয়। এ সংশোধনীর ফলে শুধু শাসন বিভাগের ওপর পার্লামেন্টের নিয়ন্ত্রণ ক্ষুণ্ন হয়নি, রাষ্ট্রপতির হাতে ভেটো ক্ষমতা দেয়ার ফলে এর আইন প্রণয়ন ক্ষমতাও হ্রাস পায়। বাংলাদেশে সংসদীয় গণতন্ত্রের প্রথম অধ্যায়টির সমাপ্তি এভাবে ঘটে। তবে এই ব্যবস্থা বেশী দিন স্থায়ী হয়নি। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগষ্টের সামরিক অভ্যুত্থানের ফলে সংবিধান স্থগিত রাখা হয় এবং নভেম্বর মাসে সামরিক সরকার সংসদ ভেঙ্গে দেয়।

সামরিক সরকার প্রধান জেনারেল জিয়াউর রহমান তাঁর বেসামরিকীকরণ প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে ১৯৭৯ সালের ১৮ ফেব্রুয়ারি দ্বিতীয় পার্লামেন্টের নির্বাচন অনুষ্ঠান করেন। নির্বাচনে ২৯টি রাজনৈতিক দল ও উপদল অংশ নেয়। তিনি সংবিধানের পঞ্চম সংশোধনীর মাধ্যমে একদলীয়

Dhaka University Institutional Repository

ব্যবস্থার বিলোপ সাধন করেন, কিন্তু রাষ্ট্রপতি পদ্ধতি বহাল থাকে। রাষ্ট্রপতির ভেটো ক্ষমতা বিলোপ করা হলেও জাতীয় সংসদকে শাসন বিভাগের ওপর নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা ফিরিয়ে দেয়া হয়নি। রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান যখন তাঁর সামরিক শাসনামলকে বৈধ করার প্রক্রিয়া সমাপ্ত করে জাতিগঠন মূলক কাজে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে নিয়োজিত করেন এবং বাংলাদেশের রাজনীতিকে এক নতুন খাতে প্রবাহিত করতে সচেষ্ট হন ঠিক তখনই ১৯৮১ সালের ৩০ মে চট্টগ্রামে এক সেনাবিদ্রোহে তিনি নিহত হন। সে মুহূর্তে উপরাষ্ট্রপতি বিচারপতি আবদুস সাত্তার রাষ্ট্রপতির পূর্ণ ক্ষমতা ও দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং পরে নির্বাচিত রাষ্ট্রপতি হন। কিন্তু নির্বাচনের মাত্র ক'মাস পরে জেনারেল এরশাদ রক্তপাতহীন এক সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে ১৯৮২ সালের ২৪ মার্চ রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল করে নেয় এবং দ্বিতীয় পার্লামেন্টের সমাপ্তি ঘটে।

জেনারেল এরশাদের বেসামরিকীকরণ প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে ১৯৮৬ সালের ৭মে তৃতীয় পার্লামেন্ট নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু প্রধান বিরোধী দলসমূহের একটি বড় অংশ এই নির্বাচনে অংশগ্রহণ না করায় এবং ব্যাপক "ভোট ডাকাতি" এর কারণে তৃতীয় জাতীয় সংসদ বৈধতা অর্জনে ব্যর্থ হয়। ১৯৮৭ সালের ৬ ডিসেম্বর মাসে এরশাদ এ সংসদ ভেঙ্গে দিয়ে ১৯৮৮ সালের ৩ মার্চ তারিখে চতুর্থ পার্লামেন্টের নির্বাচন সম্পন্ন করেন। নির্বাচনে সর্বমোট ৮টি রাজনৈতিক দল অংশ নেয়। প্রধান বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলো অংশ না নেয়ায় চতুর্থ জাতীয় সংসদও বৈধতা পায়নি।

১৯৮৮ সালের নির্বাচনের পর থেকে প্রধান বিরোধী দলগুলোর এরশাদ বিরোধী আন্দোলন বেগবান হতে থাকে। ১৯৯০ সালের মাঝামাঝি সময়ে যখন এরশাদ ঘোষণা করলেন যে, আগামী রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে তিনি প্রার্থী হবেন এবং কার্যতঃ তিনি নির্বাচনী প্রচারণায় অবতীর্ণ হওয়ার প্রেক্ষাপটে, বিরোধী দলগুলোর মাঝে ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ৮, ৭ ও ৫ দলীয় জোট আন্দোলনের লক্ষ্য ও ক্ষমতা হস্তান্তরের রূপরেখা সম্পর্কে ১৯ নভেম্বর, ১৯৯০ ঘোষণা দেয় এই সরকারকে পদত্যাগে বাধ্য করতে হবে এবং তারা কেবল একটি নিরপেক্ষ নির্দলীয় সরকারের অধীনে "সার্বভৌম সংসদ" নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করবে। এই প্রেক্ষাপটে, ৪ ডিসেম্বর, ১৯৯০ তারিখে এক গণঅভ্যুত্থানের মাধ্যমে এরশাদ সরকারের পতন ঘটে এবং চতুর্থ সংসদ ভেঙ্গে দেয়া হয়। ২৭ ফেব্রুয়ারী ১৯৯১ তারিখে প্রধান বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমেদের নেতৃত্বে একটি নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে পঞ্চম জাতীয় সংসদ নির্বাচিত হয়। এই সংসদে ৬ আগষ্ট '৯১ তারিখে গৃহীত দ্বাদশ সংশোধনীর মাধ্যমে বাংলাদেশে সংসদীয় পদ্ধতির সরকার পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা হয়। কিন্তু তিন বছরের মধ্যেই পার্লামেন্ট বস্তুতঃ অকার্যকর হয়ে পড়ে। কয়েকটি উপ-নির্বাচনে অনিয়ম, কারচুপি ও সন্ত্রাসের অভিযোগে বিরোধী দলসমূহ ১৯৯৪ সালের মার্চ মাস থেকে সংসদ অধিবেশন

Dhaka University Institutional Repository

বর্জন করে এবং একটি নির্দলীয় নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে ভবিষ্যত পার্লামেন্ট নির্বাচনের সাংবিধানিক ব্যবস্থা গ্রহণের দাবিতে আন্দোলন শুরু করে। কিন্তু সরকার এ দাবি না মানায় ১৯৯৪ সালের ২৮ ডিসেম্বর ১৪৭ জন বিরোধী দলীয় সদস্য সংসদ থেকে পদত্যাগ করেন। ফলে সংসদ একদলীয় সংসদে পরিণত হয় এবং শেষ পর্যন্ত মেয়াদ শেষ হবার ১০১ দিন পূর্বে ১৯৯৪ সালের ২৪ নভেম্বর তারিখে পঞ্চম পার্লামেন্ট ভেঙ্গে দেয়া হয়। ১৯৯৬ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি ষষ্ঠ পার্লামেন্টের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু বিরোধী দলসমূহের বর্জন ও প্রতিরোধের কারণে এ নির্বাচনে প্রদত্ত ভোটের হার ছিলো খুবই কম এবং নির্বাচিত সদস্যদের মধ্যে মাত্র একজন ছিলেন বিরোধী দলীয় সদস্য। তাই বিরোধী দলসমূহ এই পার্লামেন্টের বৈধতা মেনে নেয়নি এবং ৩০ মার্চ ১৯৯৬ তারিখে তা ভেঙ্গে দেয়া হয়। বিরোধী দলের আন্দোলনের মুখে সরকার শেষ পর্যন্ত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবি মেনে নেয় এবং ষষ্ঠ সংসদে সংবিধানের ত্রয়োদশ সংশোধনী পাস করে। এই সংশোধনী অনুযায়ী ৩০ মার্চ '৯৬ সাবেক প্রধান বিচারপতি মোহাম্মদ হাবিবুর রহমান এর নেতৃত্বে নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠিত হয়। এই সরকারের অধীনে ১২ জুন, '৯৬ সপ্তম জাতীয় সংসদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।

গবেষণার উদ্দেশ্য

গবেষণা এক ধরনের জ্ঞান অন্বেষা যা বিশেষ যুক্তিপূর্ণ নীতিমালার দ্বারা পরিচালিত হয়ে থাকে। যথাযথ পদ্ধতি প্রয়োগের মাধ্যমে কিছু প্রাসঙ্গিক বিষয়ে অনুসন্ধানই এর উদ্দেশ্য। প্রত্যেকটি গবেষণার নিজস্ব উদ্দেশ্য থাকে। কোনো কাজ সুন্দর ও সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য তা অপরিহার্য। উপস্থাপিত গবেষণা কর্মটি বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ (১৯৯১-১৯৯৫) সময়ের এক সার্বিক রূপ চিত্রায়নের প্রয়াস হিসেবে সম্পন্ন করা হয়েছে।

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের কার্যকলাপ বিশ্লেষণ এবং রাজনৈতিক ব্যবস্থায় এর প্রভাব বা গুরুত্ব নির্ধারণ করাই এই গবেষণার মূল লক্ষ্য। বাংলাদেশের রাজনীতির বিভিন্ন দিক নিয়ে যথেষ্ট গবেষণা করা হলেও আইনসভার ওপর তেমন গবেষণামূলক কাজ হয়নি। অথচ আইনসভা বাংলাদেশের অর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে সমাজের আপামর জনসাধারণের কাছে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তাই এর বাস্তব ভূমিকা বা কার্যকারিতা সম্পর্কে এদেশের সচেতন নাগরিকদেরও জানার প্রয়োজন আছে বলে মনে করি। একজন সচেতন নাগরিক হিসাবে ১৯৯১-৯৫ এর বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের বাস্তব চিত্র জনসম্মুখে তুলে ধরাই গবেষকের গবেষণার মূল উদ্দেশ্য।

Dhaka University Institutional Repository

বর্তমান সন্দর্ভে বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের সাংবিধানিক পটভূমি এবং পঞ্চম পার্লামেন্টে বাংলাদেশের সংসদীয় রাজনীতির স্বরূপ সম্পর্কে আলোচনা রয়েছে এবং এর সামগ্রিক ভূমিকা মূল্যায়নের চেষ্টা করা হয়েছে। এখানে পাঁচটি প্রশ্ন বিশেষ গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করা হবে ঃ (১) পার্লামেন্ট তার সিদ্ধান্তমূলক কার্যাবলী সম্পাদনে কতটুকু সফল বা ব্যর্থ হয়েছে? (২) ইহা শাসনবিভাগকে নিয়ন্ত্রণ তথা সরকারের নীতি বা কর্মসূচীকে প্রভাবিত করতে কার্যকর ভূমিকা পালনে সক্ষম হয়েছে কিনা? (৩) এসব দায়িত্ব সম্পাদনের ক্ষেত্রে জাতীয় সংসদের সফলতা বা ব্যর্থতার প্রধান কারণগুলো কি? (৪) পার্লামেন্টের কার্যকলাপ অর্থাৎ এর সফলতা বা ব্যর্থতা গোটা রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে কিভাবে প্রভাবিত করেছে? (৫) সংসদ-সদস্যদের আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক অবস্থান ক্রমশঃ কতটুকু পরিবর্তিত হয়েছে এবং এই পরিবর্তিত হওয়ার পশ্চাতের কারণগুলো কি?

গবেষক যখন এই গবেষণা কাজ শুরু করেন তখন বাংলাদেশে সাতটি সংসদ নির্বাচন সম্পন্ন হয়। এই সাতটি সংসদ নির্বাচনের ক্ষেত্রে দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ সংসদকে জনপ্রতিনিধিত্বশীল সংস্থা হিসেবে গণ্য করা যায় না। কারণ সংসদগুলোর নির্বাচন ছিলো মূলতঃ সামরিক সরকারের অবৈধ ক্ষমতা বৈধকরণের লক্ষ্যে। ষষ্ঠ সংসদ ছিলো মাত্র পনের দিনের একটি প্রহসনমূলক সংসদ, যেখানে মাত্র একজন বিরোধী দলীয় সদস্য ছিলো। সংসদীয় ব্যবস্থায় সরকারের দায়িত্বশীলতা বহুলাংশে এবং প্রধানতঃ নির্ভর করে পার্লামেন্টে শক্তিশালী বিরোধী দলের উপস্থিতি এবং তাদের কার্যকর ও গঠনমূলক ভূমিকার ওপর। প্রথম সংসদে বিরোধী দলের ভূমিকা নাই বললেই চলে; এই পার্লামেন্টে তিনশত আসনের মধ্যে বিরোধী দলের আসন ছিলো মাত্র আটটি। প্রথম চারটি সংসদ নির্বাচনে সরকারী দল থেকে নির্বাচনে অংশ নিয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠ আসনে সংসদ-সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলো। পঞ্চম সংসদেই সদ্য পদত্যাগ প্রাপ্ত সরকারী দল ছাড়া অপর একটি দল বি.এন.পি জামাতের সমর্থন নিয়ে নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠ আসন লাভ করতে সক্ষম হয়। পঞ্চম সংসদে অপর সংসদগুলো হতে প্রথমবারের মতো কতগুলো ভিন্নধর্মী বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান ছিলো, যার ফলে গবেষক এই সংসদকেই গবেষণার জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বলে বেছে নিয়েছেন। বৈশিষ্ট্যগুলো হলোঃ (১) এ সংসদে সদ্য পদত্যাগ প্রাপ্ত সরকারী দল ক্ষমতায় না থেকে সংসদ নির্বাচনে অংশ নেয় এবং পরাজিত হয়। (২) একটি নির্দলীয় নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে "সার্বভৌম সংসদ" প্রতিষ্ঠা হয়। (৩) একটি শক্তিশালী প্রধান বিরোধী দল হিসেবে আওয়ামীলীগের আর্বিভাব ঘটে। এছাড়া বিরোধী দল হিসাবে জাতীয় পার্টিও যথেষ্ট শক্তিশালী ছিলো। (৪) এ সংসদ ছিলো সবচেয়ে বেশী দিনের। (৫) সকল মন্ত্রীই সরকার দলীয় সদস্য হওয়া সত্ত্বেও ১৯ মার্চ, '৯১ থেকে ১৮ সেপ্টেম্বর, '৯১ পর্যন্ত তিন জোটের রূপরেখা অনুযায়ী সকল নির্বাহী ক্ষমতা ছিলো রাষ্ট্রপতির হাতে। আইনতঃ প্রধানমন্ত্রীসহ সকল মন্ত্রী ছিলেন রাষ্ট্রপতির উপদেষ্টা মাত্র, অর্থাৎ যাকে বলা যায় রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার ইত্যাদি।

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম পার্লামেন্টের কার্যকলাপ আলোচনায় গবেষণার সুবিধার্থে অনেক ক্ষেত্রে অন্যান্য পার্লামেন্টের সাথে তুলনামূলক বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এই তুলনামূলক আলোচনার মাধ্যমে কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের উত্তর পাওয়া সম্ভব হবে। (১) সরকার পদ্ধতি তথা পার্লামেন্টের সাংবিধানিক মর্যাদার সংগে বাস্তব ভূমিকার কি কোনো কার্যকারণ সম্পর্ক রয়েছে? (২) পার্লামেন্টের গঠন অর্থাৎ প্রধান রাজনৈতিক দলসমূহের প্রতিনিধিত্ব, সদস্যদের শিক্ষাগত মান, পেশাগত অবস্থান, রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা কি কোনো ভাবে পার্লামেন্টের ভূমিকাকে প্রভাবিত করে? (৩) পার্লামেন্টের সিদ্ধান্তমূলক কার্যাবলী তার নিজের এবং সমগ্র রাজনৈতিক ব্যবস্থার বৈধতার ওপর কিরূপ প্রভাব ফেলে?

বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ (১৯৯১-৯৫) সময়ের ওপর আলোকপাত করে গবেষকের জানা মতে তেমন গবেষণামূলক কাজ হয়নি। অধ্যাপক আবুল ফজল হক তাঁর বাংলাদেশের শাসন-ব্যবস্থা ও রাজনীতি প্রবন্ধে বাংলাদেশ পার্লামেন্টের কেবল আইন প্রণয়ন ও শাসন বিভাগের ওপর নিয়ন্ত্রণমূলক কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়েছেন প্রধানতঃ এ বইটির ওপর ভিত্তি করে সংসদের কার্যকারিতা সম্পর্কে কিছু মন্তব্য করা হয়েছে। বিভিন্ন পেপার, পত্রিকা, জার্নালে কিছু তথ্য রয়েছে। প্রধানতঃ মূল তথ্য পাওয়া যাবে সরকারী দলিলপত্র, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান, গণপরিষদও পার্লামেন্টের বিতর্ক, নির্বাচন কমিশনের রিপোর্ট, পার্লামেন্টের কার্যবাহের সারাংশ, জাতীয় সংসদের বুলেটিন, কার্যপ্রণালী-বিধি, সংসদ-সদস্যদের জীবন-বৃত্তান্ত ইত্যাদি।

১৯৯১ থেকে ১৯৯৫ পর্যন্ত জাতীয় সংসদের কার্যকলাপ ছিলো বহুদলীয় ও একদলীয় সংসদীয় ব্যবস্থার অধীনে। অনেক ক্ষেত্রে বিশ্লেষণের সুবিধার্থে এবং বিষয়টি স্পষ্ট করে আলোচনা করার জন্য উভয় প্রকার সংসদীয় ব্যবস্থার অধীনে সংসদে কতটুকু কাজ হয়েছে তা পৃথকভাবে তুলে ধরা হয়েছে।

গবেষণা পদ্ধতি

বর্তমান সন্দর্ভটি প্রধানতঃ একটি পর্যবেক্ষণমূলক কাজ (Empirical Study)। প্রস্তাবিত গবেষণাকর্মে তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে প্রাথমিক তথ্য সংগ্রহ পদ্ধতি ও মাধ্যমিক তথ্য সংগ্রহের পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়েছে। প্রাথমিক তথ্য সংগ্রহের জন্য সুনির্দিষ্ট প্রশ্নমালা তৈরী করে সংসদ-সদস্য, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজ শিক্ষক এবং এম,ফিল ছাত্র এই তিন ধরনের পেশাজীবীদের কাছ থেকে সাক্ষাৎকার নেয়া হয়েছে। প্রতিটি নমুনায় ২৫ জন করে উত্তরদাতা ছিলেন। উত্তরদাতাদের মধ্যে উত্তর প্রদানের হার শিক্ষক ও ছাত্রদের ছিলো ১০০% এবং সংসদ-সদস্যের ৮৫%। সাক্ষাৎপ্রার্থীদের অনেকে দলীয় দৃষ্টিকোণ থেকে উত্তর দেয়াতে গবেষক অনেক ক্ষেত্রে বস্তুনিষ্ঠ বিশ্লেষণ করতে অসমর্থ হয়েছেন। এছাড়া আর্থিক স্বল্পতার কারণে গবেষকের গবেষণার ক্ষেত্রে কিছু কিছু সীমাবদ্ধতা রয়েছে। অন্যদিকে গবেষণা কার্যের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত উল্লেখযোগ্য দলিল পত্রগুলোর মধ্যে রয়েছে সরকারী দলিলপত্র (Public documents)। যেমন, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান, গণপরিষদ

Dhaka University Institutional Repository

(Constituent Assembly) ও পার্লামেন্টের বিতর্ক (Debates) পার্লামেন্টের কার্যবাহের সারাংশ (Summary of the Proceedings), বুলেটিন, নির্বাচন কমিশনের রিপোর্ট, সংসদ-সদস্যদের জীবন-বৃত্তান্ত (Bio-data of the Members of Parliament) নির্বাচনী ইস্তেহার (Election Manifesto) পুস্তিকা, প্রচারপত্র, সংবাদপত্র ও বিভিন্ন বই-পুস্তক ও প্রবন্ধ।

প্রস্তাবিত গবেষণা প্রকল্পটি সাতটি স্বতন্ত্র কিন্তু পরস্পর সম্পর্কযুক্ত অধ্যায়ে বিভক্ত করে আলোচনা করা হয়েছে।

প্রথম অধ্যায়টি প্রস্তাবিত গবেষণা প্রকল্পটির ভিত্তি নির্মাণ করেছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে বৃটিশ ভারত ও পাকিস্তানে যেসব কেন্দ্রীয় আইনসভা এবং বাংলায় প্রাদেশিক আইন পরিষদ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলো সেগুলোর প্রতিনিধিত্বমূলক চরিত্র, ক্ষমতা ও কার্যাবলীর সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেয়া হয়েছে। কারণ বাংলাদেশের জনগণ সংসদীয় ব্যবস্থার সঙ্গে কখন থেকে কিভাবে সম্পৃক্ত ছিলো এবং তা এদেশের জনগণের আশা-আকাঙ্খার সঙ্গে কতটুকু সংগতিপূর্ণ ছিলো তা পর্যালোচনা করা প্রয়োজন।

তৃতীয় অধ্যায়ে পঞ্চম পার্লামেন্টের সাংবিধানিক কাঠামো, কার্যপ্রণালী, ক্ষমতা ও মর্যাদা আলোচনা করা হয়েছে এবং তা আলোচনা করতে গিয়ে প্রথম পার্লামেন্ট হতে পঞ্চম পার্লামেন্ট পর্যন্ত উপর্যুক্ত বৈশিষ্ট্যগুলোর পরিবর্তিত ধারা সংক্ষিপ্ত ভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। এর মাধ্যমে বাংলাদেশে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন সরকারের মানসিকতা কেমন ছিলো তার একটা আপেক্ষিক ধারনা পাওয়া যাবে।

চতুর্থ অধ্যায়ে সাংসদদের আর্থ-সামাজিক অবস্থান এবং রাজনৈতিক পরিমন্ডল সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, এঁরা যে শুধু সংসদের প্রতিনিধিত্ব করবেন তা নয়, আপন ব্যক্তি মানসের প্রতিনিধিত্বের ব্যাপারটিও স্মতর্ব। পরিবেশ, বয়স, শিক্ষা, আর্থ-সামাজিক অবস্থান, রাজনৈতিক মতাদর্শ ইত্যাদি সব মিলিয়ে যে ব্যক্তিত্বের বিকাশ, তারও প্রতিফলন হয় তাঁদের ভূমিকায়।

পঞ্চম অধ্যায়ে পঞ্চম পার্লামেন্টের কার্যকলাপ বিশ্লেষণ করা হয়েছে। কারণ কোনো রাজনৈতিক ব্যবস্থায় পার্লামেন্ট কতটুকু কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারে তা মূল্যায়নের জন্য এর কার্যকলাপকে কতগুলো মাপকাঠিতে বিশ্লেষণের প্রয়োজন।

ষষ্ঠ অধ্যায়ে সংসদীয় গণতন্ত্র ও কার্যক্রমের মূল্যায়নের মাধ্যমে দেখানো হয়েছে বাংগালী জনগণের বহু দিনের আশার প্রতিফলন পঞ্চম সংসদ কতটুক গণতান্ত্রিক কিংবা অগণতান্ত্রিক ছিলো তার বাস্তব প্রতিফলন।

সপ্তম অধ্যায়ে বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের ভূমিকার একটি সাধারণ মূল্যায়ন ও ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্যনির্দেশ ও টীকা

১. মোঃ আবদুল হালিম, সংবিধান, সাংবিধানিক আইন ও রাজনীতিঃ বাংলাদেশ প্রসঙ্গ, প্রকাশকঃ মোঃ ইউসুফ আলী খান, গুলশান, ঢাকা, জুন, ১৯৯৭, পৃষ্ঠাঃ ১৮১।

২. সত্যসাধন চক্রবর্তী, নিমাই প্রামাণিক, নির্বাচিত আধুনিক শাসনব্যবস্থা, শ্রীভূমি পাবলিশিং কোম্পানি, কলকাতা, জুলাই ১৯৮০, পৃষ্ঠাঃ ১৪০-১৫১।

৩. W.F. Willoughby, Government of Modern States, New York, 1936, pp. 312-320.

৪. Fred R. Harris, American's Democracy, New Mexico, 1983, pp. 382-390.

৫. সত্যসাধন চক্রবর্তী ও নিমাই প্রামাণিক, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠাঃ ৯৪।

৬. Michael Stewart, The British Approach to Politics, London, 1967, pp. 119-125.

৭. সত্যসাধন চক্রবর্তী ও নিমাই প্রামাণিক, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠাঃ ১২২।

৮. D.C. Gupta, Indian National Movement and Constitutional Development, Delhi, 1973, pp. 485-490.

৯. Peter Pyne, "Legislatures and Development : The case of Eduader, 1960-61", Comparative Political Studies, Vol. 9. No. 1, April, 1976. p. 70.

১০. ঐ, পৃষ্ঠা ঃ ৭৩।

১১. ঐ, পৃষ্ঠাঃ ৮০-৮১।

১২. মাহমুদ শফিক, জনগণ সংবিধান নির্বাচন, প্রকাশকঃ এম.নূরুল আমিন, আমাদের বাঙলা প্রেস লিঃ, ঢাকা, নভেম্বর, ১৯৯৬, পৃষ্ঠাঃ ৪৪।

১৩. "Bangladesh : Era of Sheikh Mujibur Rahman", অধ্যায়ঃ ২, পৃষ্ঠা ঃ ১০৪, উদ্ধৃত হয়েছে ঃ ডঃ মোহাম্মদ আবদুল ওদুদ ভূঁইয়া সম্পাদিত, বাংলাদেশের রাজনৈতিক উন্নয়ন, রয়েল লাইব্রেরী, বাংলা বাজার, ঢাকা, ১৭ এপ্রিল, ১৯৮৯, তৃতীয় খন্ড, পৃষ্ঠাঃ ৪৮।

১৪. অধ্যাপক এমাজউদ্দীন আহমদ (সম্পাদিত), বাংলাদেশে সংসদীয় গণতন্ত্র প্রাসঙ্গিক চিন্তা-ভাবনা, করিম বুক করপোরেশন, ঢাকা, মে ১৯৯২, পৃষ্ঠাঃ ২।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায়
বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

ব্রিটিশ আমলে ভারতের কেন্দ্রীয় আইনসভা ও বঙ্গীয় আইনসভার বিকাশ

একটি শাসনতন্ত্রের অধীনে প্রতিনিধিত্বমূলক আইনসভার মাধ্যমে সরকার পরিচালনার ব্যবস্থা বৃটিশ শাসনের একটি অন্যতম ইতিবাচক অবদান। ভারতবর্ষে ব্রিটিশ শাসন প্রতিষ্ঠার পর উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধ থেকে ভারতীয়রা শাসনকার্যে তাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার জন্য দাবি উত্থাপন করতে থাকে। বিভিন্ন পরিস্থিতির চাপের মুখে বৃটিশ পার্লামেন্ট ভারতের জন্য বহু আইন প্রণয়ন করলেও ভারতীয়দের জন্য কোনো প্রতিনিধিত্বমূলক সংস্থা গড়ে তোলার সুযোগ দিতে রাজী ছিলো না। ১৯৭২ সালে রেগুলেটিং এ্যাক্ট এর আওতাধীনে প্রবর্তিত চার সদস্য বিশিষ্ট 'গভর্ণর জেনারেল এন্ড কাউন্সিল' কে ধরা যেতে পারে পরবর্তীকালের আইনসভার প্রাথমিক রূপ। আলোচনা এবং সংখ্যা গরিষ্ঠ ভোটের ভিত্তিতে কাউন্সিল পাশ করতো রেগুলেশন।[১] ১৮৫১ সালের অক্টোবর মাসে কলকাতায় রাজা রাধাকান্ত দেব ও দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নেতৃত্বে গঠিত হয় 'বৃটিশ ইন্ডিয়ান এসোসিয়েশন'। এই সংগঠনটিই সর্বপ্রথম দেশ শাসনে দেশবাসীর অংশীদারিত্ব দাবি করে। ১৮৫৩ সালে ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির চার্টার নবায়নের প্রাক্কালে এই সমিতি ৪,৯০০ জনের স্বাক্ষর সম্বলিত একটি দাবিনামা বৃটিশ পার্লামেন্টের বিবেচনার জন্য প্রেরণ করে। ঐ দাবিনামার মধ্যে অন্যতম ছিলো বাংলায় একটি প্রতিনিধিত্বমূলক আইনসভা স্থাপন।[২] কিন্তু এই দাবির বিপক্ষে কোম্পানি মহল এমন তদবির চালায় যে পার্লামেন্ট মনে করে প্রতিনিধিত্বমূলক আইনসভা স্থাপনের উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি হতে আরো অনেকপথ অতিক্রম করতে হবে।[৩] ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহ ভারতের কেন্দ্রীয় আইনসভা ও বঙ্গীয় আইনসভা স্থাপনের প্রক্রিয়া যথেষ্ট ত্বরান্বিত করে। ১৮৬১ সালের মার্চ মাসে ১৪০৩ জন ভদ্রলোকের স্বাক্ষরযুক্ত একটি স্মারকলিপি পার্লামেন্টে উপস্থাপিত হয়। স্মারকলিপির শিরোনাম ছিলো, 'Petition from inhabitants and Tax Payers of Calcutta and Bengal Proper.'[৪] এরই জের হিসেবে সেক্রেটারি অব ষ্টেট ভারত সরকারকে নির্দেশ দেন বাংলায় প্রতিনিধিত্বমূলক আইনসভা স্থাপনের জন্য।[৫] এর ফলে ১৮৬১ সালের ১ আগষ্ট ভারতীয় কাউন্সিল আইন ঘোষিত হয়। এমনি প্রশাসনিক রূপান্তরণের ইতিহাসে ভারত ও পাকিস্তান রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা, সর্বশেষে ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের আর্বিভাব হয়। সেই কারণেই (১৯৯১-১৯৯৫)-এর বাংলাদেশ সংসদের কার্যকারিতা আলোচনা প্রসঙ্গে ১৮৬১ সাল থেকে সংসদীয় ব্যবস্থার ঐতিহাসিক পটভূমি বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন। এ অধ্যায়ে বাংলায় বৃটিশ শাসনামলকে কেন্দ্রীয় ও বঙ্গীয় আইনসভার বিকাশ এই দু' অধ্যায়ে বিভক্ত করে আলোচনা করা হবে। আবার পাকিস্তান শাসনামলকে ও কেন্দ্রীয় ও পূর্ব বাংলার আইনসভা এ দু'ভাগে বিভক্ত করে আলোচনা করা হবে।

Dhaka University Institutional Repository

কেন্দ্রীয় আইন পরিষদ (১৮৬১-১৯৪৭)

১৮৬১ সালের ভারতীয় পরিষদ আইন ও কেন্দ্রীয় আইন পরিষদ

১৮৬১ সালের 'ইন্ডিয়ান কাউন্সিল্স এ্যাক্ট' বাস্তবায়নের সময় থেকে ঔপনিবেশিক প্রশাসনের নীতি-নির্ধারণী প্রক্রিয়ায় ভারতীয়দের অংশ গ্রহণ শুরু হয়। একই সঙ্গে এই আইনের অধীনে বাংলায় একটি সংসদ প্রতিষ্ঠার জন্য বড়লাট আদিষ্ট হন।[৬] এই আইন অনুযায়ী কেন্দ্রীয় আইন পরিষদে আইন প্রণয়নের জন্য অন্ততঃ ছয় জন এবং অনধিক বারো জন অতিরিক্ত সদস্য অন্তর্ভুক্ত করে গভর্ণর জেনারেলের শাসন পরিষদকে সম্প্রসারিত করা হয়।[৭] অতিরিক্ত সদস্যদের মধ্যে কমপক্ষে অর্ধেক বেসরকারী সদস্য ছিলো। ভারতীয় সদস্যগণ বেসরকারী সদস্য বলে বিবেচিত হতেন। এবং তাঁরা গভর্ণর জেনারেল কর্তৃক দু'বছরের জন্য মনোনীত হতেন। অতিরিক্ত সদস্যসহ গভর্ণর জেনারেল, শাসন পরিষদ ভারতের আইনসভা হিসেবে কাজ করতো। কিন্তু আইন প্রণয়নের ব্যাপারে এর ক্ষমতা ছিলো সীমিত। গভর্ণর জেনারেলের পূর্ব অনুমতি ছাড়া সরকারী ঋণ, সেনাবাহিনী, মুদ্রা, বৈদেশিক ও রাজনৈতিক সম্পর্ক, ডাক ও তার ইত্যাদি বিষয়ে বিল উত্থাপন করা যেত না। তিনি পরিষদে গৃহীত যে কোনো বিলে ভেটো প্রয়োগ করতে পারতেন। তাঁর অধ্যাদেশ জারি করার অবাধ ক্ষমতা ছিলো।[৮]

১৮৯২ সালের ভারতীয় কাউন্সিল আইন ও কেন্দ্রীয় আইন পরিষদ

আধুনিক শিক্ষা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে বাঙালীর রাজনৈতিক চিন্তা চেতনায় পরিবর্তন শুরু হয়েছিলো। উনিশ শতকে মধ্যবিত্ত বাঙালীর একমাত্র রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান জাতীয় কংগ্রেস রাজনৈতিক সুবিধা আদায় করার জন্যে গোড়া থেকেই পদক্ষেপ নিতে শুরু করেছিলো; এবং যার প্রধান লক্ষ্য ছিলো কাউন্সিলে অধিক সংখ্যক নির্বাচিত বাঙালীর সদস্যের প্রবেশ নিশ্চিত করা।[৯] যার প্রেক্ষাপটে, ভারতের ভাইসরয় স্বরাষ্ট সচিব এ্যান্টনি ম্যাকডোনালকে বাংলার সম্ভাব্য আইনসভার একটি রূপরেখা প্রণয়নের নির্দেশ দেন। অবশেষে ঐ রূপরেখার ভিত্তিতেই পাশ হয় ১৮৯২ সালের সংস্কার আইন।[১০] এই আইনের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় আইনপরিষদের অতিরিক্ত সদস্য সংখ্যা কমপক্ষে দশ এবং সর্বোচ্চ ষোল জন করা হয়। এর পূর্বে এ সংখ্যা ছিলো ছয় হতে বারো।[১১] এর মাধ্যমে নির্বাচন নীতি সম্পূর্ণভাবে গৃহীত না হলেও এর মাধ্যমেই সর্বপ্রথম নির্বাচন পদ্ধতির সূচনা ঘটে। অতিরিক্ত সদস্যদের মধ্যে চারজন চারটি প্রাদেশিক আইনসভার বেসরকারী সদস্যদের দ্বারা অপর একজন কলকাতা বর্ণিক সভার দ্বারা নির্বাচিত হতেন।[১২] কিন্তু প্রকৃতপক্ষে গভর্ণর জেনারেলই তাঁদের মনোনীত করতেন। অপর পাঁচটি সদস্যপদ পৌরসভা, বিশ্ববিদ্যালয়, সিনেট এবং অন্যান্য বাণিজ্যিক সংস্থার সুপারিশক্রমে গভর্ণর জেনারেল কর্তৃক মনোনীত হতেন।[১৩] আইনসভাকে আইন প্রণয়ন ছাড়াও সরকারের আয়-ব্যয় সম্পর্কিত বাৎসরিক হিসাব সম্পর্কে আলোচনা করার এবং শাসন কর্তৃপক্ষকে প্রশ্ন করার অধিকার দান করে।[১৪]

Dhaka University Institutional Repository

১৮৯২ সালের আইনে বেসরকারী সদস্য প্রেরণের বিধান ছিলো পরোক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে। জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিরা সরাসরি আইন পরিষদে অংশগ্রহণ করতে পারত না। এছাড়া বেসরকারী সদস্যরা পূর্বের মতই সংখ্যালঘিষ্ঠ ছিলেন। আইনসভার ক্ষমতাও সর্বক্ষেত্রে সীমিত ছিলো। সরকার কর্তৃক উত্থাপিত বিল সংশোধনের কোনো সুযোগ ছিলোনা। সরকারের বার্ষিক অর্থ বিষয়ক বিবৃতি বা বাজেট নিয়ে আলোচনা করার অধিকার থাকলেও কাউন্সিলে এ বিষয়ে কোনো প্রকার ভোট নেয়া বা প্রস্তাব গ্রহণ করা যেত না। প্রশ্ন করার ওপর এমন অনেক শর্ত জুড়ে দেয়া হয়েছিলো যে, যার ফলে প্রশ্ন করার মূল উদ্দেশ্যই ব্যাহতো হতো। তাছাড়া সম্পূরক প্রশ্ন করা যেত না। শাসনবিভাগকে নিয়ন্ত্রণ করার কিঞ্চিত ক্ষমতাও আইন পরিষদকে দেয়া হয়নি।[১৫]

১৯০৯ সালের ভারত শাসন আইন ও কেন্দ্রীয় আইন পরিষদ

১৯০৯ সালের ভারত শাসন আইনকে মর্লি-মিন্টো সংস্কার আইন বলা হয়।[১৬] ১৯০৯ সালের আইনদ্বারা ভারতীয় আইন পরিষদের সদস্যসংখ্যা বৃদ্ধি করে ৬৮ জন করা হয়।[১৭] গভর্ণর জেনারেল এবং ৭ জন সদস্য নির্বাহী পরিষদের অন্তর্ভুক্ত ছিলো। অতিরিক্ত ৬০ জন সদস্যের মধ্যে ২৮ জনের বেশী সরকারী সদস্য ছিলো না। ২৭ জন ছিলো বেসরকারী সদস্য। এঁরা নির্বাচিত সদস্য ছিলেন। নির্বাচিত আসনগুলোর ১৩ জন সদস্য প্রাদেশিক আইন পরিষদের বেসরকারী সদস্যদের দ্বারা নির্বাচিত হয়ে আসতেন। ২টি আসন কলকাতা এবং বোম্বাইয়ের বর্ণিক সভার জন্য। ৬টি আসন প্রদেশের ভূ-স্বামীর জন্য এবং ৬টি মুসলিম সম্প্রদায়ের আসন।[১৮] ১৯০৯ সালের আইনে প্রথম বারের মত পরোক্ষ নির্বাচন নীতি স্বীকৃত হয় এবং মুসলমানদের জন্য একটি পৃথক নির্বাচকমন্ডলীও গঠন করা হয়।

১৯০৯ সালের আইনের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় আইন পরিষদের ক্ষমতা পূর্বাপেক্ষা বৃদ্ধি করা হয়েছিলো। তবে সরকারী সদস্যদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা বজায় রাখা হয় এমনভাবে যাতে কোনো সরকারী বিল পাস করে নিতে সরকারকে কোনো প্রকার বাঁধা বিপত্তির সম্মুখীন হতে না হয়।[১৯] ১৯০৯ সালের আইনে ফাইনাল বাজেট উত্থাপনের পূর্বে যে কোনো সদস্যকে কর, নতুন লোন অথবা স্থানীয় সরকারের যে কোনো বিল বিষয়ে আলোচনা করার প্রস্তাব পেশ ও ভোটাভুটির অধিকার সদস্যদের দেয়া হয়েছিলো। এর পূর্বে তা ছিলোনা, তবে এ আইনেও কতিপয় বিষয়ে যেমন সামরিক, রাজনৈতিক, পররাষ্ট্র সম্পর্কিত বিষয়, প্রদেশগুলো থেকে প্রাপ্ত অর্থ আমদানী ও রপ্তানীর ওপর ধার্য শুল্ক, রাজস্ব ষ্ট্যাম্প, নতুন কর, আদালত, গির্জা সংক্রান্ত ব্যয়, ঋণের ওপর সুদ, রেলওয়ে প্রভৃতি খাত সম্পর্কে কোনোরূপ আলোচনা করার অধিকার দেয়া হয়নি।[২০] শাসন পরিষদের সদস্যরা আইনসভার নিকট দায়ী ছিলেন না।

Dhaka University Institutional Repository

১৯১৯ সালের ভারত শাসন আইন ও কেন্দ্রীয় আইন পরিষদ

ভারতের ভাইসরয় চেমসফোর্ড এবং সেক্রেটারি অব স্টেট মন্টেগুর যৌথ প্রচেষ্টায় ১৯১৯ সালের ২৩ ডিসেম্বর ১৯১৯ সালের ভারত শাসন আইন পাস হয়।[২১] এই আইনের মাধ্যমে কেন্দ্রে দ্বি-কক্ষ বিশিষ্ট আইনসভা প্রবর্তন করা হয়। কেন্দ্রীয় আইন পরিষদের গভর্ণর জেনারেল এবং দু'টি কক্ষ রাষ্ট্রীয় পরিষদ ও ব্যবস্থাপক পরিষদ নিয়ে গঠিত হয়। ব্যবস্থাপক পরিষদে ১৪৫ জন সদস্য ছিলো। তন্মধ্যে ১০৫ জন নির্বাচিত, ২৬ জন সরকারী এবং ১৪ জন বেসরকারী মনোনীত সদস্য ছিলেন। ১০৫ জন নির্বাচিত সদস্যদের মধ্যে ৫২ জন অ-মুসলিম, ৩০ জন মুসলমান, ২ জন শিখ, ৯ জন ইউরোপিয়ান, ৭ জন ভূ-স্বামী এবং ৪ জন ভারতীয় বর্ণিক।[২২] এই কক্ষকে নিম্নকক্ষ বলা হয়। আইনসভার উচ্চ কক্ষ তথা রাষ্ট্রীয় পরিষদের সদস্য সংখ্যা ছিলো ৬০। তন্মধ্যে ৩৩ জন পরোক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে নির্বাচিত হতেন।[২৩] আইনসভার উভয় কক্ষেই নির্বাচিত সদস্যরা ছিলেন সংখ্যাগরিষ্ঠ তবে ভোটাধিকার সীমিত ছিলো।

১৯১৯ সালের আইনের মাধ্যমে আইন পরিষদের ক্ষমতা পূর্বাপেক্ষা বৃদ্ধি করা হয়। তাত্ত্বিকভাবে কেন্দ্রীয় আইনসভা কেন্দ্রীয় তালিকাভুক্ত সব বিষয়ে আইন প্রণয়ন করতে পারত। তবে ঋণ, রাজস্ব, প্রতিরক্ষা, পররাষ্ট্র, ধর্মীয় প্রভৃতি কতিপয় বিষয়ে গভর্ণর জেনারেলের পূর্ব অনুমতি ব্যতীত পরিষদে কোনো বিল উত্থাপন করতে পারত না। কোনো বিল বা এর অংশ বিশেষের বিবেচনা বন্ধ করে দেবার ক্ষমতা গভর্ণর জেনারেলের ছিলো। তিনি যে কোনো বিলে সম্মতি দান বন্ধ করতে পারতেন। তাঁর নিজস্ব আইন প্রণয়ণের ক্ষমতাও ছিলো। গভর্ণর জেনারেল অবাধে অর্ডিন্যান্স জারি করার ক্ষমতা ভোগ করতেন।[২৪]

কেন্দ্রীয় আইনসভা আইন সংক্রান্ত ক্ষমতা ছাড়াও আবার কতিপয় অর্থ সংক্রান্ত ক্ষমতাও কার্যাবলী সম্পাদন করতো। তবে অর্থ সংক্রান্ত ক্ষমতা ছিলো সীমিত। বাজেট বরাদ্দ ভোটযোগ্য (Votable Items) এবং ভোটের অযোগ্য (Non votable Items) এ দু'ভাগে বিভক্ত ছিলো। পরিষদ উভয় ভাগ সম্পর্কে আলোচনা করতে পারত। তবে অভোটযোগ্য বিষয়ে পরিষদে ভোটাভুটি করার ক্ষমতা ছিলো না।[২৫] বাকি ৪০ শতাংশের ক্ষেত্রে আইনসভার ক্ষমতা ছিলো নিতান্তই অস্পষ্ট। এছাড়া আইনসভা কোনো ব্যয় বরাদ্দ নাকচ বা হ্রাস করলে গভর্ণর জেনারেল তা পুনর্বহাল করতে পারতেন।

এ আইনের মাধ্যমে আইনসভায় প্রশ্ন ও সম্পূরক প্রশ্ন করা যেত। এছাড়া জনস্বার্থ বিষয়ক কোনো বিষয়ে কাউন্সিল মুলতবী প্রস্তাব উত্থাপন করতে পারত। এর আগে আইন পরিষদের এ ধরণের ক্ষমতা ছিলো না। তবে এই অনুযায়ী আইন পরিষদ নির্বাহী বিভাগের বিরুদ্ধে কোনো নিন্দা

Dhaka University Institutional Repository

প্রস্তাব উথাপন করতে পারত না। আইন পরিষদ কর্তৃক পাসকৃত কোনো প্রস্তাব সরকার মেনে চলতে বাধ্য ছিলো না। প্রকৃত শাসন ক্ষমতা ছিলো গভর্ণর জেনারেল ও তাঁর শাসন পরিষদের হাতে। মোটকথা আইনসভার দায়িত্বশীল সার্বভৌম ক্ষমতা একেবারে ছিলো না। ইহা ছিলো নামে মাত্র দায়িত্বশীল সরকার।

১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন ও কেন্দ্রীয় আইন পরিষদ

১৯৩৫ সালের ২ আগষ্ট ব্রিটিশ নৃপতির অনুমোদনক্রমে ১৯৩৫ সালের সুপ্রসিদ্ধ ভারত শাসন আইন প্রণীত হয়। এ আইন ছিলো সুবৃহৎ; এতে সর্বমোট ৩২১টি ধারা ছিলো।[২৬] ১৯৩৫ সালের আইনে যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার গঠন এবং কেন্দ্রে ১৯১৯ সালের প্রবর্তিত দ্বি-কক্ষ বিশিষ্ট আইনসভা প্রবর্তন করা হয়। কেন্দ্রীয় আইনসভার উচ্চ কক্ষের নাম ছিলো রাজ্য পরিষদ এবং নিম্ন কক্ষের নাম যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিষদ। রাজ্য পরিষদ মোট ২৬০ জন সদস্য নিয়ে গঠিত হতো। তাঁদের মধ্যে ১৫০ জন ব্রিটিশ ভারতের প্রতিনিধি ও ১০৪ জন দেশীয় রাজ্যগুলোর প্রতিনিধি ছিলেন এবং বাকী ছ'জন গভর্ণর জেনারেল কর্তৃক মনোনীত হতেন। ব্রিটিশ ভারতের প্রতিনিধিরা বিভিন্ন প্রদেশ হতে প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হতেন এবং দেশীয় রাজ্যের প্রতিনিধিগণ স্ব স্ব রাজ্যের শাসনকর্তা কর্তৃক মনোনীত হতেন। যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিষদ মোট ৩৭৫ জন সদস্য নিয়ে গঠিত হতো। তার মধ্যে ২৫০ জন সদস্য ব্রিটিশ ভারতের প্রদেশগুলো হতে পরোক্ষভাবে নির্বাচিত হতেন এবং অবশিষ্ট ১২৫ জন সদস্য দেশীয় রাজ্যের রাজন্যবর্গ কর্তৃক মনোনীত হতেন।[২৭] এই আইনসভার উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য এই যে, প্রদেশ ও দেশীয় রাজ্যগুলি মোটামুটিভাবে জনসংখ্যার ভিত্তিতে আইনসভার উভয় কক্ষে তাদের প্রতিনিধি প্রেরণ করতো এবং উভয় কক্ষেই বিভিন্ন সম্প্রদায়ের জন্য পৃথক নির্বাচনের ব্যবস্থা ছিলো।[২৮]

১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনে কেন্দ্রীয় আইনসভা যুক্তরাষ্ট্রীয় তালিকা ও যুগ্ম তালিকাভুক্ত সকল বিষয়ে আইন প্রণয়ন করতে পারত। কিন্তু আইনসভা এক্ষেত্রে সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী ছিলো না। ইহা বৃটিশ পার্লামেন্ট কর্তৃক প্রণীত কোনো আইনের রদবদল করতে পারত না। গভর্ণর জেনারেলের পূর্ব অনুমতি ব্যতীত আইনসভায় অনেক বিষয়ে কোনো বিল বা সংশোধনী উথাপন করতে পারত না।[২৯] ভারতের শান্তি বজায় রাখার জন্য প্রয়োজন মনে করলে গভর্ণর জেনারেল আইনসভার বিবেচনাধীন যে কোনো আইন বন্ধ করে দিতে পারতেন। আইনসভা কর্তৃক গৃহীত যে কোনো বিলে অবাধে ভেটো প্রয়োগ করতে পারতেন। তাছাড়া গভর্ণর জেনারেলের অধ্যাদেশ জারি করার অবাধ ক্ষমতা ছিলো এবং তিনি আইনসভার ইচ্ছার বিরুদ্ধে গভর্ণর জেনারেলের আইন নামে বিশেষ আইন প্রণয়ন করতে পারতেন। জরুরী অবস্থা ঘোষণা করে তিনি আইনসভার সকল ক্ষমতা নিজ হাতে তুলে নিতে পারতেন।[৩০]

Dhaka University Institutional Repository

১৯৩৫ সালের আইনে ভারতবর্ষে পার্লামেন্টারি পদ্ধতির সরকার প্রবর্তন করে অধিবেশনকালে সরকারের গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নে আইনসভাকে প্রস্তাব উত্থাপন, প্রশ্ন জিজ্ঞাসা এবং সরাসরি অনাস্থা প্রস্তাব করে মন্ত্রীদের নাজেহাল করার ক্ষমতা দেয়া হয়েছিলো। কিন্তু এতদ্সত্ত্বেও শাসন বিভাগের ওপর আইনসভার পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা স্বীকৃত ছিলো না। কেন্দ্রে প্রবর্তিত দ্বৈত শাসনের ফলে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো গভর্ণর জেনারেলের হাতে সংরক্ষিত ছিলো। যেমন- দেশরক্ষা, বৈদেশিক সম্পর্ক, মুদ্রা ব্যবস্থা, ধর্মীয় বিষয়, যোগাযোগ ও উপজাতীয় অধ্যুষিত অঞ্চলের শাসন। অপরদিকে হস্তান্তরিত বিষয় মন্ত্রীপরিষদের হাতে ছিলো, যেমন- আইন শৃংখলা, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ইত্যাদি। প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রীসভা যৌথভাবে আইনসভা ছাড়াও গভর্ণর জেনারেলের কাছেও দায়ী ছিলেন। তিনি যে কোনো সময় মন্ত্রীসভাকে পদচ্যুত করতে পারতেন। মন্ত্রীসভার ক্ষমতা ছিলো অত্যন্ত সীমাবদ্ধ। কার্যতঃ প্রকৃত শাসন ক্ষমতা ছিলো গভর্ণর জেনারেলের হাতে।[৩১] ১৯৩৫ সালের আইনে অর্থসংক্রান্ত ক্ষেত্রেও বাজেটের ৮০ শতাংশ নির্ভরশীল ছিলো গভর্ণর জেনারেলের অনুমোদনের ওপর। বাকী ২০ শতাংশেও আইনসভার পূর্ণ ক্ষমতা ছিলো না।[৩২] ফলে জনগণের আন্দোলনের মুখে ব্যর্থ হয় ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন এবং প্রবর্তিত হয় ১৯৪৭ সালের ভারত স্বাধীনতা আইন।

বঙ্গীয় আইনসভা ১৮৬১-১৯৪৭

১৮৬১ সালের ভারত শাসন আইন ও বঙ্গীয় আইনসভা

১৮৬২ সালের ১ ফেব্রুয়ারি, শনিবার বঙ্গীয় আইনসভার উদ্বোধনী অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত আইনসভার লেফটেন্যান্ট গভর্ণর স্যার জন পিটার গ্রান্ট পদাধিকার বলে সভাপতি এবং বারো জন মনোনীত সদস্য ছিলেন। বারো জন সদস্যের মধ্যে চার জন সরকারী ও চার জন বেসরকারী বিদেশী এবং চার জন বাঙালী ছিলেন।[৩৩] রাজ অনুগত ব্যক্তি হিসাবে বাঙালী সদস্যবৃন্দ সরকারের ধামা ধরার ভূমিকা পালন করেন এবং আইন প্রণয়নে এরা সবসময়ই সরকারকে সমর্থন জানান।[৩৪] ১৯৬২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে ১৮৫৯ সালের আইনের দশম ধারার সংশোধনী প্রস্তাব বিল আকারে পেশ করা হয়। ঐ বিলের শিরোনাম ছিলো "Fines on villages for outrages and Trespasses committed" মৌলবী আব্দুল লতিফ ছাড়া সকলেই ঐ বিলে সম্মতি দেন। মৌলবী আবদুল লতিফ তাঁর ভাষণে উল্লেখ করেনঃ এভাবে সকলকে জরিমানা করার অর্থই হলো পুলিশ অলস এবং অদক্ষ। এটা জমিদারদের দুর্নীতি করার সুযোগ দেয়া ছাড়া আর কিছুই নয়। উক্ত বিলে ম্যাজিস্ট্রেটকে চরম ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে। কোনো জমিদার যদি তার অনুরক্ত তিন-চার জন লোকদ্বারা ঘোষণা করায় যে, কোনো বিশেষ গ্রামের বাসিন্দারা জমিদারদের ফসল নষ্ট করেছে এবং কোনো সাক্ষ্য প্রমাণ ছাড়াই ম্যাজিস্ট্রেট যদি সন্তুষ্ট হন, তবে তিনি সেই গ্রামে ১ লক্ষ টাকা জরিমানা ও করতে পারেন। ঐ গ্রামের বাসিন্দারা কখনও সেই পরিমাণ টাকা দিতে পারবে না। ম্যাজিস্ট্রেট তখন ইচ্ছা করলে উক্ত গ্রাম সেই জমিদারদের কাছে বিক্রি করে দিতে পারেন। এর প্রকৃত অর্থ এই দাঁড়ায় যে, সকল গ্রাম শেষ পর্যন্ত জমিদারদের কবলে চলে যাবে।[৩৫]

Dhaka University Institutional Repository

১৮৯২ সালের ভারত শাসন আইন ও বঙ্গীয় আইন পরিষদ

১৮৯২ সালের সংস্কার আইনে তেরো জন সদস্যের পরিবর্তে বঙ্গীয় আইনসভায় একুশ জন সদস্য রাখার বিধান করা হয়। এর মধ্যে দশ জন ছিলেন মনোনীত সদস্য। যে সকল সংস্থা মনোনয়ন করার অধিকার পেলো তাহলো কলকাতা কর্পোরেশন, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, মিউনিসিপলিটি সমূহ, জেলাবোর্ডসমূহ এবং বেঙ্গল চেম্বার অব কমার্স।[৩৬] ১৮৯৩ সাল থেকে ১৮৯৯ সাল পর্যন্ত বঙ্গীয় আইনসভার সদস্যবৃন্দ বিভিন্ন নীতি প্রশ্নে সমালোচনা মুখর ছিলেন না। তবে কোনো বৃটিশ ম্যাজিস্ট্রেট বা সৈনিক কোনো বাঙালীর প্রতি দুর্ব্যবহার করলে অনেকেই বঙ্গীয় আইনসভায় এ ব্যাপারে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।[৩৭]

১৮৯২ সালের আইনে বঙ্গীয় আইনসভার সদস্য-সংখ্যা বৃদ্ধি পেলেও ঐ আইনে জনপ্রতিনিধি নির্বাচনের কোনো বিধান ছিলো না। তাই ভারতীয় কংগ্রেস ঐ সংস্থাকে নির্বাচিত সংস্থায় পরিণত করার জন্য আন্দোলন শুরু করে। তারা দায়িত্বশীল শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তনের জন্য দাবি উত্থাপন করেন। এদাবির প্রেক্ষিতে বৃটিশ সরকার ১৯০৯ সালে আর একটি আইন পাশ করে। তার পূর্বে বঙ্গভঙ্গ ছিলো বৃটিশ শাসনামলে বঙ্গীয় প্রদেশে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা।

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভা, ১৯০৫

৭,৮৯,৯৩০০০ জনসমষ্টির অবিভক্ত বাংলা গঠিত হয়েছিলো বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা, আসাম এবং ছোট নাগপুর নিয়ে। এই বিশাল এলাকার প্রশাসন এক সমস্যা সৃষ্টি করেছিলো।[৩৮] তাই বৃটিশ সরকার শাসনতান্ত্রিক সুবিধার কথা উল্লেখ করে ১৯০৫ সালে বাংলাকে পূর্ব ও পশ্চিম বাংলায় বিভক্ত করেন। বাংলার হিন্দুদের মধ্যে এটা মারাত্মক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে।[৩৯] যার প্রেক্ষাপটে, ১৯০৫ সালে প্রবর্তিত বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভা ১৯১২ সালে রদ হয়। ১৯০৫-১৯৯২-এর মধ্যে কাউন্সিলের অধিবেশন হয়েছিলো মাত্র একুশ দিন; এবং যে সময়ে মাত্র দশটি আইন পাস করা সম্ভব হয়েছিলো।[৪০]

১৯০৯ সালের ভারত শাসন আইন ও বঙ্গীয় আইন পরিষদ

১৯০৮ সালে লর্ড মিন্টো কর্তৃক সুপারিশের ফলে বঙ্গীয় আইনসভার সদস্য-সংখ্যা বৃদ্ধি করা হয় (দেখুন সারণী- ২.১)।

Dhaka University Institutional Repository

সারণী ২.১

১৯০৮ সালে ভারতীয় বৃটিশ সরকার সুপারিশকৃত বঙ্গীয় আইনসভার কাঠামো

মনোনীত সদস্য	নির্বাচিত সদস্য	সর্বমোট সদস্য
২৬ জন	২০ জন	৪৭ জন
২৩ জন	১ জন কলকাতা কর্পোরেশন	৪৬ জন মনোনীত ও নির্বাচিত +
৩ জন সরকারী অফিসার	৪ জন মিউনিসিপ্যালিটি সমূহ	লেফটেন্যান্ট গভর্ণর
৩ জন সরকারী অফিসার	৪ জন জেলা বোর্ডসমূহ	
৩ জন বিশেষ স্বার্থগোষ্ঠী ও	৪ জন ভূস্বামী শ্রেণী	
তফসিলী প্রতিনিধি	১ জন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়	
	১ জন চেম্বার অব-কর্মাস	
	১ জন কলকাতা ব্যবসায়ী সমিতি	
	১ জন ভারতীয় ব্যবসায়ী সমিতি	
	২ জন মুসলিম সদস্য	

উৎস ঃ Government of India, Papers Relating to The Constitutional Reform in India, Vol. 11,, 1908, P. 557.

উপরোক্ত সংস্কার আইনের ধারা অনুযায়ী ভারতীয় বৃটিশ সরকার ১৯০৯ সালের ১৫ ডিসেম্বর বঙ্গীয় আইন সভার নতুন কাঠামো ঘোষণা করে। উক্ত কাঠামোতে সতেরো জন সরকারী অফিসার ও একত্রিশ জন বেসরকারী সদস্যের বিধান করা হয়।[৪১] ১৯০৯ সালের আইনের মাধ্যমে পূর্বের মনোনয়ন প্রথা বাতিল করে পরোক্ষ নির্বাচন ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়। ফলে বেসরকারী সদস্যরা বিভিন্ন শ্রেণী, স্বার্থ ও সম্প্রদায় কর্তৃক নির্বাচিত হতেন।[৪২] পরিষদে বেসরকারী সদস্যদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকলেও সরকার পরিষদকে ইচ্ছানুযায়ী ব্যবহার করতে পারতেন। এ আইনেও ভারতে প্রতিনিধিত্বমূলক দায়িত্বশীল সরকার প্রতিষ্ঠিত না হওয়ায় রাজনৈতিক দল কংগ্রেস ও মুসলিমলীগের আন্দোলনের মুখে ইহা ব্যর্থ হয়। ফলে ব্রিটিশ পার্লামেন্টে পাস হয় ১৯১৯ সালের ভারত শাসন আইন।

১৯১৯ সালের ভারত শাসন আইন ও বঙ্গীয় আইন পরিষদ

১৯১৯ সালের আইনে ভারতের প্রত্যেক প্রদেশে দ্বৈত-শাসনব্যবস্থা (Dyarcy) চালু করা হয় এবং ঐ ব্যবস্থা অনুযায়ী প্রাদেশিক বিষয়গুলোকে 'রক্ষিত' ও 'হস্তান্তরিত' এ দু'ভাগে ভাগ করা হয়। রক্ষিত বিষয়গুলোর দায়িত্ব ঐ সকল মন্ত্রীকে দেয়া হয় যাঁরা প্রাদেশিক গভর্ণরের কাছে দায়ী থাকবেন। আর হস্তান্তরিত বিষয়গুলো, যেমন ঃ শিক্ষা, স্বাস্থ্য, স্থানীয় সরকার ঐ সকল মন্ত্রীর হাতে

Dhaka University Institutional Repository

দেয়া হয় যাঁরা আইনসভার কাছে দায়ী থাকবেন। বঙ্গীয় আইনসভায় জনগণের সাধারণ ভোটে নির্বাচিত প্রতিনিধির সংখ্যা ১১৪ জন করা হয়। আইনসভার ক্ষমতাও বর্ধিত করা হয়, তবে কর নির্ধারণ ও সরকারী ঋন প্রভৃতি বিষয়ে গভর্ণরের পূর্ব সম্মতি প্রয়োজন হবে বলে উল্লেখ করা হয়। প্রাদেশিক গভর্ণরকে যে কোনো বিলে ভেটো প্রদানের ক্ষমতা দেয়া হয়।তাই এ আইনে সর্বতোভাবে দায়িত্বশীল ও প্রতিনিধিত্বশীল সরকারের বিধান করা হয়নি। বিভিন্ন দাবি-দাওয়া পূরণ হওয়া সত্ত্বেও ১৯১৯ সালের আইন বাস্তবায়িত করা কঠিন হলো, কারণ ঐ সময় মহাত্মা গান্ধীর আহবানে সারা ভারতে অসহযোগ আন্দোলন ও মুসলিম লীগের নেতৃত্বে খেলাফত আন্দোলন শুরু হয়।

১৯২০ সালে নির্বাচন ঠিকই অনুষ্ঠিত হয়, তবে তাতে প্রায় শতকরা ৮০ জন ভোটার ভোটদান থেকে বিরত থাকেন। নির্বাচনের পর বঙ্গীয় আইনসভার অধিবেশন বসে এবং অধিবেশনে বিভিন্ন প্রস্তাবও উত্থাপন করা হয়। ১৯২১ সালে ৮ ফেব্রুয়ারি আইনসভায় একটি প্রস্তাব উত্থাপিত হয় যে, "আগামী বছর থেকে দার্জিলিংয়ে সরকার স্থানান্তরের বাৎসরিক যে প্রক্রিয়া চলে, তা বন্ধ করতে হবে।" প্রস্তাবটির পক্ষে ৫৩টি ভোট পড়ে। প্রথম নির্বাচনে ৮০% জনগণ ভোটদানে বিরত থাকলেও ১৯২৩ সালের নির্বাচনে স্বরাজ পার্টি নিরংকুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। আইনসভায় স্বরাজ পার্টি বিভিন্ন সময়ে তাদের দাবি-দাওয়া তথা বিল উত্থাপন করলেও তা বাতিল হয়ে যায়। যেমনঃ জমিদারি প্রথা উচ্ছেদ কল্পে কৃষক আন্দোলনের দাবির স্বপক্ষে Tenwncy Amendment Bill-এর প্রস্তাব।[৪৩] কিন্তু তা কার্যকরী হয়না। এমনি পরিস্থিতিতে ১৯১৯ সালের আইনে ভারতীয়দের কোনো দাবি-দাওয়া বাস্তবায়িত না হওয়ায় মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে 'আইন অমান্য আন্দোলন' দুর্বার গতিতে চলতে থাকে। ১৯৩৪ সালের এপ্রিল মাসে মহাত্মাগান্ধী কর্তৃক উক্ত আন্দোলন স্থগিত ঘোষণার পরপরই ভারতে অধিকতর দায়িত্বশীল সরকার প্রবর্তনের লক্ষ্যে বৃটিশ সরকার ১৯৩৫ সালের ভারতীয় আইন ঘোষণা করে।

১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন ও বঙ্গীয় আইনসভা

১৯৩৫ সালের আইনে বাংলা প্রদেশে প্রথমবারের মত দ্বি-কক্ষ বিশিষ্ট আইনসভা প্রবর্তন করা হয়।উচ্চ কক্ষের নাম বিধান পরিষদ (Legislative Council) এবং নিম্ন কক্ষকে বলা হতো বিধান সভা (Legislative Assembly)। উচ্চ কক্ষ অনধিক ৬৫ জন নির্বাচিত ও মনোনীত সদস্য নিয়ে গঠিত হতো। অপরদিকে নিম্নকক্ষ মোট ২৫০ জন সদস্য নিয়ে গঠিত হতো।[৪৪] এখানে সদস্যরা বিভিন্ন সম্প্রদায়, শ্রেণী ও স্বার্থের প্রতিনিধিত্বের ভিত্তিতে নির্বাচিত হতেন। এ আইনের অধীনে সাম্প্রদায়িক নির্বাচন এবং সীমিত ভোটাধিকার অপরিবর্তিত ছিলো। ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনে প্রদেশে আইনসভার আইন, শাসন ও অর্থ সংক্রান্ত ক্ষমতা কেন্দ্রীয় আইনসভারই অনুরূপ ছিলো। কেন্দ্রীয় আইনসভার ন্যায় প্রদেশের আইনসভাকে ও গভর্ণরের স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতার

Dhaka University Institutional Repository

ওপরই নির্ভর করতে হতো। এছাড়া গভর্ণর জেনারেল যে কোনো বিল তাঁর বিবেচনার জন্য স্থগিত রাখতে পারতেন।[৪৫] প্রাদেশিক স্বায়ত্বশাসন বলতে যা বুঝায় বাংলা প্রদেশসহ অন্যান্য প্রদেশে তা বাস্তবায়িত হয়নি। যদিও ১৯৩৫-এর ভারত শাসন আইনে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের কথা উল্লেখ ছিলো। তবে ১৯৩৭, ১৯৪৬ সালের নির্বাচন ও মন্ত্রীসভা গঠন ছিলো এ আইনের অধীনে দায়িত্বশীল সরকার প্রতিষ্ঠার একটা মৌলিক দিক। মন্ত্রীসভা কর্তৃক বাংলায় জমিদারি প্রথার উচ্ছেদ, Money Lenders Act করে অর্থঋণ প্রদানকারীর ক্ষমতা খর্ব করা ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ কার্য সাধিত হয়েছিলো।

উপরোক্ত কৃতিত্ব সত্ত্বেও মন্ত্রীসভা শান্তিপূর্ণভাবে শাসন পরিচালনা করতে পারেনি। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ঘনঘটাই ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের অবসানসহ ঔপনিবেশিক শাসনাবসানের সঙ্গে সঙ্গে বঙ্গীয় আইনসভারও যবনিকাপাত ঘটে।

বঙ্গীয় আইনসভার কার্যপ্রণালী

বিশ্বের অন্য যে কোনো আইনসভার মতো বঙ্গীয় আইনসভার প্রধান কাজ ছিলো আইন প্রণয়ন করা। প্রথম থেকেই এলক্ষ্যে বিধিমালা অনুসরণ করা হয়। অবশ্য বিভিন্ন সময়ে প্রাথমিক বিধিমালায় সংশোধন আনা হয়। ১৮৮৯ সালে বিধিমালায় সংশোধনী আনার লক্ষ্যে একটি কমিটি গঠন করা হয়। ১৮৯০ সালের ১৮ জানুয়ারি এ কমিটি রিপোর্ট জমা দেয়। সর্বসম্মতি না থাকলেও ঐ রিপোর্ট বঙ্গীয় আইনসভায় অনুমোদিত হয়। ঐ বিধিমালা সংসদীয় গণতন্ত্রের বিধি অনুযায়ী নির্দেশিত হয়েছিলো।

বঙ্গীয় আইনসভার বিধি অনুযায়ী ১৯২০ সাল পর্যন্ত লেফটেন্যান্ট গভর্ণর (পরে গভর্ণর) বঙ্গীয় আইনসভার অধিবেশন আহবান ও সভাপতিত্ব করতেন। তাঁর অনুপস্থিতিতে এ্যাডভোকেট জেনারেল বা নির্বাহী পরিষদের একজন উচ্চপদস্থ সদস্য সভাপতিত্ব করতেন। ১৯২০ সালে মন্টেগু চেমসফোর্ড সংস্কারের পর ঐ নীতিমালাতে কিছু পরিবর্তন সাধন করা হয়। এরপর থেকে বঙ্গীয় আইনসভায় সভাপতিত্ব করার জন্য একজন পৃথক সভাপতি বা স্পীকারের বিধান করা হয়। অবশ্য বিধি অনুযায়ী গভর্ণর যখনই প্রয়োজন মনে করতেন তখনই অধিবেশন আহবান করতে পারতেন। তবে বছরে অন্ততঃ একটি অধিবেশন অবশ্যই বসতে হতো। প্রথমদিকে সাধারণতঃ শনিবার ১১টায় অধিবেশন বসতো; তবে ১৯১২ সালে বিধান করা হয় যে, একদিনের জন্য হলে বুধবার, দুই দিনের জন্য হলে মঙ্গলবার এবং দীর্ঘদিনের জন্য হলে সোমবার বঙ্গীয় আইনসভার অধিবেশন বসবে।[৪৬] বঙ্গীয় আইনসভার অধিবেশন প্রথমদিকে খুব ঘন ঘন বসতো, তবে ক্রমাগতভাবে তা কমে আসে। যেমনঃ প্রথম বছর বঙ্গীয় আইনসভার ১৯টি অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়, অথচ ১৯৪৭ এ বসে একটি বা দুটি অধিবেশন।[৪৭]

Dhaka University Institutional Repository

আইনসভার অনুমতিক্রমে বিল উত্থাপন করা হতো। যে সদস্য বিল উত্থাপন করতেন তাঁকে প্রথমে বিলের উদ্দেশ্য ও বিষয় বস্তু সম্পর্কে আলোচনা করতে হতো। কোনো সদস্য একটি বিলে একবারই বক্তব্য পেশ করতে পারতেন। কেবল কোনো সদস্য সংশোধনী প্রস্তাব আনলে বিতর্কের সময় জবাব দেবার সুযোগ পেতেন। প্রথমদিকে আইনসভায় নিজ মতামত প্রকাশ করতে সদস্যের জন্য কোনো সময়সীমা নির্দিষ্ট করা ছিলো না। পরে প্রত্যেক সদস্যের জন্য সময়সীমা পনেরো মিনিট ধার্য করা হয়। সময়সীমা অতিক্রান্ত হলেই ঘন্টা বেজে উঠতো। অবশ্য সরকারী অফিসারের ক্ষেত্রে সময়সীমা নির্ধারিত ছিলো না। বিলের উত্থাপক সদস্যকে আধঘন্টা সময় দেয়া হতো। প্রথম বেসরকারী সদস্য বক্তব্য পেশ করতেন, পরে সরকারী সদস্য বক্তব্য পেশ করতেন।[৪৮]

প্রত্যেকটি বিল বিস্তারিতভাবে আলোচিত হতো। আইনে পরিণত হওয়ার জন্য প্রত্যেকটি বিলকে কয়েকটি স্তর অতিক্রম করতে হতো। যে কোনো বিল উত্থাপনের পর বিলের দায়িত্বে নিয়োজিত সদস্য নিচের যে কোনো একটি পদক্ষেপ গ্রহণ করার প্রস্তাব পেশ করতেন, (১) বিলটি সিলেক্ট কমিটিতে পাঠানো উচিত বা (২) পরবর্তী কোনোদিন বিলটি আলোচিত হওয়া উচিত বা (৩) সকল সদস্যের মতামত যাচাইয়ের জন্য বিলটি সবার মধ্যে বিতরণ করা উচিত। সাধারণতঃ সকল বিলই সিলেক্ট কমিটিতে পাঠানো হতো। এই কমিটি প্রধানতঃ সমান সংখ্যক সরকারী ও বেসরকারী সদস্য নিয়ে গঠিত হতো।[৪৯] এছাড়াও প্রদেশের আয়-ব্যয়ের বাৎসরিক হিসাব তৈরীর জন্য রাজস্ব কমিটি ও কলকাতা মিউনিসিপ্যাল বিল পাশের ক্ষেত্রে 'স্ট্যান্ডিং কমিটি' নামেও বঙ্গীয় আইনসভার দু'টি কমিটি ছিলো।

আইনসভায় যে কোনো বিল সংখ্যাগরিষ্ঠের ভোটে পাস হতো। প্রয়োজন হলো ভোট গ্রহণ করা হতো। বিল আইনসভায় পাস হলে গভর্ণরের কাছে অনুমোদনের জন্য পাঠানো হতো। গভর্ণর বিলে ইচ্ছানুযায়ী সম্মতি বা অসম্মতি জ্ঞাপন করতে পারতেন। গভর্ণরের সম্মতি পেলে বিলটি আইনে পরিণত হতো।[৫০]

মোটকথা, ১৮৬১-১৯৩৫ সাল পর্যন্ত ভারত শাসন আইনগুলো পর্যায়ক্রমে বিশ্লেষণ করে প্রতীয়মান হচ্ছে যে, কোনো আইনই ভারতীয় জনগণের দাবী-দাওয়ার প্রেক্ষাপটে বাস্তবায়নের অনুকূলে ছিলো না। ১৯০৯ সাল পর্যন্ত সংস্কার আইনগুলোতে 'আইন পরিষদ' গভর্ণর জেনারেল ও গভর্ণরের উপদেষ্টা পরিষদ হিসাবে কাজ করতো। ১৯১৯ ও ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনে যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার প্রবর্তন ও প্রণীত আইন পরিষদগুলোতে ভারতীয়দেরকে ব্যাপক প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা দিলেও আইন প্রনয়ণ ও সরকারকে নিয়ন্ত্রণ করার কার্যকর ক্ষমতা আইনসভাগুলোকে দেয়া

Dhaka University Institutional Repository

হয়নি। উহা ছিলো ক্ষমতাহীন রাবার ষ্ট্যাম্প যেখানে গভর্ণর জেনারেল ও গভর্ণরই ছিলেন একনায়কতান্ত্রিক ক্ষমতার অধিকারী। ফলে কোনো আইনই মেনে নেয়নি কংগ্রেস ও মুসলিমলীগ, শুরু করে স্বাধীনতার আন্দোলন। যার ফলশ্রুতিতে, লর্ডমাউন্টব্যাটেনের ৩ জুন পরিকল্পানুসারে ১৯৪৭ সালের স্বাধীনতা আইনের মাধ্যমে ভারতবর্ষে বৃটিশ শাসনের অবসান ঘটে এবং ভারত ও পাকিস্তান নামে দু'টি স্বাধীন রাষ্ট্রের আবির্ভাব ঘটে। তবে যতই সমালোচনা করা হোক একথা সত্য বঙ্গীয় আইনসভাই ভারতে সংসদীয় গণতন্ত্রের সূচনা করে। আইনসভায় তর্ক-বিতর্ক, প্রশ্নোত্তর এবং অন্যান্য সংসদীয় ব্যবস্থার প্রথাসমূহ ভারতের সাংবিধানিক ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায়ের সংযোজন করেছিলো। ভারতীয় শাসনতান্ত্রিক ইতিহাসে বঙ্গীয় আইনসভার অবদান অনস্বীকার্য, কারণ এই প্রতিষ্ঠান কেবল ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামে বলিষ্ঠ ভূমিকা রেখেছিলো তাই নয়, বরং বর্তমানে ভারতীয় উপমহাদেশে সংসদীয় গণতন্ত্রের যে সমস্ত বিধিমালা অনুসরণ করা হয় সেগুলোরও অগ্রদূত ছিলো বঙ্গীয় আইনসভা।

পাকিস্তান আমলে কেন্দ্রীয় ও পূর্ব-বাংলার আইনসভা

১৯৪৭ সালের ভারত স্বাধীনতা আইনের ৮ ধারা মতে স্বাধীনতা পরবর্তীকালে পাকিস্তানের শাসনকার্য পরিচালিত হয় ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনানুযায়ী। ১৯৪৭ সালের ভারতীয় স্বাধীনতা আইন এবং পরিবর্তিত ও সংশোধিত ১৯৩৫ সালের আইন-ই ছিলো পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় এবং প্রাদেশিক সরকারের সাংবিধানিক ও আইনগত কার্যকলাপের মৌল দলিল।

প্রথম গণপরিষদ

১৯৪৭ সালের ভারত স্বাধীনতা আইন অনুসারে পাকিস্তানের জন্য সংবিধান প্রণয়নের উদ্দেশ্যে একটি গণপরিষদ গঠন করা হয়। এই গণপরিষদের প্রথমে সদস্য ছিলো ৬৯ জন এবং পরে বৃদ্ধি পেয়ে ৭৯ জনে উন্নীত হয়। তন্মধ্যে পূর্ব পাকিস্তানে ৪৪ জন প্রতিনিধি এবং পশ্চিম পাকিস্তানে ৩৫ জন প্রতিনিধি ছিলেন।[৫১]

১৯৪৭ সালের ভারত স্বাধীনতা আইনের মাধ্যমে পাকিস্তানে সংসদীয় সরকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে আইন পরিষদের প্রাধান্য স্বীকৃত হয়। এই আইনের মাধ্যমে গভর্ণর জেনারেল বৃটিশ রাজ কর্তৃক পাকিস্তানের আইন পরিষদের পরামর্শক্রমে নিযুক্ত হবেন।[৫২] তিনি আইনসভার নিকট দায়িত্বশীল মন্ত্রীসভার পরামর্শ অনুযায়ী কাজ করবেন এবং তাঁর 'ব্যক্তি বিচারবুদ্ধি' ও 'স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা' বিলুপ্ত হবে।[৫৩] আইন পরিষদকে যে কোনো আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে গভর্ণর জেনারেলের মর্যাদা ব্রিটেনের রাজা-রানীর মর্যাদার অনুরূপ।[৫৪]

Dhaka University Institutional Repository

১৯৪৭ সালের আইনের মাধ্যমে পাকিস্তানে দায়িত্বশীল শাসনব্যবস্থা প্রবর্তন করা হলেও উহা ত্রুটির উর্ধ্বে ছিলো না। গভর্ণর জেনারেলের পূর্ব অনুমতি ছাড়া কিছু বিষয়ে পরিষদে বিল উত্থাপন করা যেত না। পূর্বের ন্যায় গভর্ণর জেনারেল অধ্যাদেশ জারি করতে পারতেন। তাছাড়া ১৯৩৫ সালের মূল আইনে প্রদত্ত গভর্ণর জেনারেলের জরুরী ক্ষমতাও বহাল রাখা হয়। ১৯৪৭ সালের ভারত স্বাধীনতা আইনের মাধ্যমে গভর্ণর জেনারেলের স্বেচ্ছাচারমূলক ক্ষমতাগুলো বিলুপ্ত করা হয়, একই অনুচ্ছেদে কতিপয় প্রয়োজন মেটাবার জন্য তাঁকে আদেশ জারি করার ক্ষমতা দেয়া হয়।[৫৫] গভর্ণর জেনারেলের এসব ক্ষমতার কারণে আইনসভার ক্ষমতা ও মর্যাদা সংকুচিত হয়। মন্ত্রীসভা গভর্ণর জেনারেলকে পরামর্শ দিতেন। কিন্তু তিনি সর্বদা মন্ত্রীসভার পরামর্শ অনুযায়ী কাজ করতে বাধ্য থাকবেন এমন কোনো সুনির্দিষ্ট নীতিমালা ছিলো না।[৫৬] কিন্তু ব্রিটেন, কানাডা এবং অষ্ট্রেলিয়ার মত যে সব দেশে সংসদীয় সরকার ব্যবস্থা চালু রয়েছে সে সব দেশের রাষ্ট্র প্রধানগণ মন্ত্রীসভার পরামর্শক্রমে কাজ করেন।

গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় সংসদে বিরোধীদলের বিকল্প নেই। স্যার আইভর জেনিংস বলেন, তাৎক্ষণিকভাবে বিরোধীদল সরকারের বিকল্প এবং গণঅসন্তোষের কেন্দ্রবিন্দু হিসাবে কাজ করে থাকে। এর কার্যক্রম অনেকাংশে সরকারের ন্যায়ই গুরুত্বপূর্ণ। বিরোধী দল না থাকলে গণতন্ত্র থাকে না[৫৭] পাকিস্তানের প্রথম আইন পরিষদে কার্যকর বিরোধী দল ছিলো না। আইনসভার সদস্যের মধ্যে ১৯৪৭ ও ১৯৫৩ সালে মুসলিম লীগ ৪৯ ও ৬০ কংগ্রেস ১৬ ও ১১, অন্যান্য পার্টির ৪ ও ৩ জন সদস্য ছিলো। পরিষদে মুসলিম লীগের সংখ্যাগরিষ্ঠতা ও তাদের স্বেচ্ছাচারী মনোভাবের ফলে বিরোধী দলের কোনো ভূমিকাই ছিলো না।

পাকিস্তানের প্রথম সংবিধান-সভা এর দীর্ঘ ৭ বছরের জীবনে ১১৬ দিন মিলিত হয়েছিলো। সর্বমোট উনাশি জন সদস্যের মধ্যে গড়ে পঁয়ত্রিশ থেকে পঞ্চান্ন জন সদস্য উপস্থিত থাকলেও অধিকন্তু এর ৫০% সদস্য মন্ত্রীত্ব এবং গর্ভর্ণর পদে বহাল ছিলো।[৫৮] ফলে সংবিধান প্রণয়নের কাজে তাঁরা সময় দিতে পারেননি। শেষ পর্যন্ত গণপরিষদ সংবিধান রচনায় ব্যর্থ হয়। প্রেক্ষাপটে, গভর্ণর-জেনারেল গোলাম মোহাম্মদ ১৯৫৪ সালের ২৪ অক্টোবর প্রথম গণপরিষদ বাতিল বলে ঘোষণা দেন এবং এর পরিসমাপ্তি ঘটে।

দ্বিতীয় গণপরিষদ

প্রথম গণপরিষদ ভেঙ্গে দেয়ার ফলে পাকিস্তানে চরম সাংবিধানিক সংকট দেখা দেয়। এই সংকট দূরীভূত করার জন্য গভর্ণর জেনারেল ১৯৫৫ সালের ২৮ মে এক অর্ডিন্যান্সের মাধ্যমে দ্বিতীয় গণপরিষদ গঠন করেন। এর সদস্য সংখ্যা ছিলো ৮০ জন। পরোক্ষভাবে নির্বাচিত মোট ৮০ জন সদস্যের মধ্যে সমান দু'ভাগে পূর্ব বাংলা ও পশ্চিম পাকিস্তান কর্তৃক সদস্য নির্বাচিত হয়।[৫৯]

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় গণপরিষদ কোনো রকম সময় নষ্ট না করে অতি দ্রুততার সাথে সংবিধান তৈরীর কাজে অগ্রসর হয়। ৮ সেপ্টেম্বর ১৯৫৫ সালে গণপরিষদে পশ্চিম পাকিস্তানের 'এক ইউনিট বিলটি' গৃহীত হয়। এর ফলে পশ্চিম পাকিস্তানের বিভিন্ন প্রদেশগুলোকে একটি প্রদেশে পরিণত করা হয়।[৬০] ফলে পূর্ব বাংলা পূর্ব পাকিস্তান নামে অভিহিত হয়। তদানীন্তন আইন মন্ত্রী আই, আই, চুন্দ্রীগর ১৯৫৬ সালের ৯ জানুয়ারী গণপরিষদে সংবিধানের একটি খসরা বিল উত্থাপন করেন এবং ২৯ ফেব্রুয়ারি ইহা গৃহীত হয়; যা ২৩ মার্চ ১৯৫৬ সাল হতে পাকিস্তানের প্রথম সংবিধান হিসাবে কার্যকর হয়। এই সংবিধানের মাধ্যমে পাকিস্তানে পার্লামেন্টারি ও যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার প্রবর্তন করা হয়।

১৯৫৬ সালের সংবিধান ও পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় আইনপরিষদ

১৯৫৬ সালের সংবিধানের অধীনে পাকিস্তানের পার্লামেন্ট প্রেসিডেন্ট এবং এক কক্ষ বিশিষ্ট আইনসভা নিয়ে গঠন করা হয়। এর নাম জাতীয় পরিষদ।[৬১] জাতীয় পরিষদে ৩০০ জন সদস্য ছিলো। তন্মধ্যে সম-প্রতিনিধিত্বের ভিত্তিতে ১৫০ জন করে পূর্ব পাকিস্তান এবং পশ্চিম পাকিস্তান হতে নির্বাচিত হতেন।[৬২] দু'টি প্রদেশে সম প্রতিনিধিত্বের ভিত্তিতে ১০ বছরের জন্যে অতিরিক্ত ১০টি আসন মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত ছিলো। যাঁরা পরোক্ষভাবে নির্বাচিত হতেন। পাকিস্তানে ১৯৫৬ সালের সংবিধানের অধীনে সর্বপ্রথম সংসদীয় তথা মন্ত্রীপরিষদ শাসিত শাসনব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়। ব্রিটিশ সংবিধানের ন্যায় এ সংবিধানেও আইন পরিষদের প্রাধান্য স্বীকৃত হয়। এ সংবিধানের অধীনে প্রেসিডেন্ট ছিলেন একজন নিয়মতান্ত্রিক প্রধান। প্রেসিডেন্ট জাতীয় পরিষদের অধিবেশন আহবান, স্থগিত এমনকি ভেঙ্গে দিতে পারতেন। বছরে অন্ততঃ দু'বার জাতীয় পরিষদের অধিবেশন বসতো। যে কোনো বিল পাস করতে হলে প্রেসিডেন্টের অনুমতির প্রয়োজন হতো। অবশ্য তাঁর কোনো ভেটো ক্ষমতা ছিলো না।

সংবিধানে জাতীয় পরিষদের আইন প্রণয়ন, অর্থ সংক্রান্ত এবং শাসন বিভাগের ওপর ব্যাপক নিয়ন্ত্রণ ছিলো। জাতীয় পরিষদের আইন ব্যতীত কোনো কর ধার্য বা নতুন ব্যয় বরাদ্দ করা যেত না, কেন্দ্রীয় তহবিলের তত্ত্বাবধান, এর কোনো আর্থিক লেনদেন এবং সরকারী অর্থ ও হিসেবের সাথে জড়িত সববিষয়ে পার্লামেন্টের আইন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হতো। শাসন সংক্রান্ত ক্ষেত্রে মন্ত্রীসভা তার নীতি ও কাজের জন্য জাতীয় পরিষদের নিকট যৌথভাবে দায়ী ছিলো। পার্লামেন্টে সরকারের বিরুদ্ধে অনাস্থা ভোট পাস হলে সরকারকে পদত্যাগ করতে হতো। তাছাড়া পরিষদে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা, মূলতবী প্রস্তাব, নিন্দাসূচক প্রস্তাব, মনযোগ আকর্ষণ প্রস্তাব ইত্যাদি উত্থাপনের মাধ্যমে মন্ত্রীসভাকে নিয়ন্ত্রণ করা হতো।

Dhaka University Institutional Repository

১৯৫৬ সালের সংবিধান ও পূর্ব বাংলার আইনসভা

১৯৫৬ সালের সংবিধানে প্রদেশেও মন্ত্রীপরিষদ শাসিত সরকার প্রবর্তন করা হয়। প্রাদেশিক গভর্ণরও এক কক্ষ বিশিষ্ট আইন পরিষদ নিয়ে প্রাদেশিক আইনসভা গঠিত হতো। বাংলা প্রদেশের সদস্য সংখ্যা ছিলো ৩০০ জন। আইন প্রণয়ন, অর্থপ্রণয়ন এবং মন্ত্রী সভার ওপর নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা কার্যকর করতো প্রাদেশিক আইনসভা।[৬৩] মহিলাদের জন্যও ১০টি আসন ১০ বছরের জন্য সংরক্ষিত ছিলো। প্রাদেশিক আইনসভা আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত ক্ষমতা, অর্থ সংক্রান্ত ক্ষমতা এবং মন্ত্রী সভার ওপর নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা কার্যকর করার ক্ষমতা কেন্দ্রীয় আইনসভারই অনুরূপ ছিলো।

১৯৫৬ সালের সংবিধানে মন্ত্রীপরিষদ শাসিত সরকার প্রতিষ্ঠার অঙ্গীকার থাকলেও কিছু অস্পষ্ট ও ত্রুটিপূর্ণ বিধানের জন্য শাসন বিভাগের ওপর আইনসভার প্রভাব বিস্তার করা সম্ভব ছিলো না। কারণ, প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ করার ক্ষেত্রে প্রেসিডেন্টকে সংবিধানে স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা দেয়া হয়েছিলো। আর প্রেসিডেন্ট ক্ষমতার সুযোগটি সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করেন। ঐ সময় পাকিস্তানের রাজনীতিতে দলীয় অবস্থান ছিলো খুবই অস্থিতিশীল। রাজনৈতিক দলের সদস্যদের দলীয় আনুগত্য খুবই দুর্বল ও ক্ষণস্থায়ী। প্রেসিডেন্ট মন্ত্রীসভা গঠনের জন্য যাকেই ক্ষমতা প্রদান করতেন, আইনসভার সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যরা নিজ নিজ দল ত্যাগ করে তাঁকেই সমর্থন দিতেন। অর্থাৎ প্রেসিডেন্ট সংসদীয় রীতি-নীতি উপেক্ষা করে স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা বলে প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ ও বরখাস্ত করতেন। ফলে সরকার প্রতিষ্ঠা কিংবা অপসারণের ক্ষেত্রে আইনসভার কার্যকর ভূমিকা ছিলো না।[৬৪]

উপরোক্ত আলোচনা হতে দেখা যাচ্ছে যে, ১৯৫৬ সালের সংবিধানে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠা, কেন্দ্র ও প্রদেশের বিষয়গুলো সুস্পষ্টভাবে নির্ধারণ এবং কেন্দ্রীয় সরকার প্রাদেশিক বিষয়গুলোর ওপর হস্তক্ষেপ করতে পারবে না তার বিধান ছিলো। অবশ্য বাস্তবে সংবিধান অনুসারে কেন্দ্রীয় সরকারকে এমন কতিপয় ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছিলো, যার ফলে সামান্যতম ছল-ছুতোয় কেন্দ্রীয় সরকার জরুরী অবস্থা ঘোষণা করে প্রাদেশিক ক্ষমতা নিজ হাতে তুলে নিতেন।

১৯৫৬ সালের সংবিধানের অধীনে সংসদীয় শাসন ব্যবস্থা ব্যর্থতার জন্য সংবিধান কমিশনের মতে, তিনটি কারণ দায়ী। (১) সুষ্ঠু নির্বাচনের অভাব (২) রাজনৈতিক দলগুলোর কাজে ও প্রাদেশিক সরকারের কাজে কেন্দ্রীয় সরকারের অযথা হস্তক্ষেপ; এবং (৩) যোগ্য নেতৃত্বের অভাবে সুসংগঠিত ও সুশৃঙ্খল রাজনৈতিক দলের অভাব, রাজনীতিবিদদের চারিত্রিক অধঃপতন এবং প্রশাসন কাজে অযথা হস্তক্ষেপ।[৬৫] অবশ্য এ সমস্ত কারণ ছাড়াও কায়েমী স্বার্থবাদী মহল এবং তার প্রতিভূ সামরিকও বেসামরিক আমলাগণ প্রকৃত গণপ্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা ছেড়ে দিতে একেবারেই রাজী

Dhaka University Institutional Repository

ছিলেন না। ফলে রাষ্ট্রপতি ইস্কান্দার মীর্জা ১৯৫৮ সালের ৭ অক্টোবর সারাদেশে সামরিক আইন জারি করেন; সংবিধান বাতিল করেদেন; কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক আইনসভা ও মন্ত্রীসভা ভেঙ্গে দেন। কিন্তু ২৭ অক্টোবর ১৯৫৮ সালে প্রধান সেনাপতি আইয়ুব খান ইস্কান্দার মীর্জাকে বিতাড়িত করে রাষ্ট্রপতির পদ দখল করেন।

১৯৬২ সালের সংবিধান ও কেন্দ্রীয় আইনসভা

প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান প্রবর্তিত ১মার্চ, ১৯৬২ সালের সংবিধানে রাষ্ট্রপতি শাসিত শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়। এই সংবিধানে বারোটি ভাগ, ১৫০টি অনুচ্ছেদ এবং তিনটি তফসিল অন্তর্ভুক্ত ছিলো। এতে মৌলিক গণতন্ত্রী নামে এক অভিনব পরোক্ষ নির্বাচন পদ্ধতিও উদ্ভাবন করা হয়।

১৯৬২ সালের সংবিধান অনুসারে পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় আইনসভার নাম ছিলো জাতীয় পরিষদ এবং তা ছিলো এক-কক্ষ বিশিষ্ট আইনসভা। জাতীয় পরিষদের ২৫৬ সদস্যের মধ্যে সমান সংখ্যক প্রতিনিধি পূর্ব পাকিস্তান এবং পশ্চিম পাকিস্তান থেকে নির্বাচিত হতেন। প্রতিটি প্রদেশে আবার ৩ জন করে ৬ জন মহিলা সদস্য নির্বাচিত করার ব্যবস্থাও ছিলো।[৬৬]

১৯৬২ সালের সংবিধানের দ্বারা জাতীয় পরিষদের আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত ক্ষমতা সংকুচিত করা হয়। রাষ্ট্রপতির পূর্ব অনুমতি ব্যতীত জাতীয় পরিষদে কোনো বিতর্কমূলক আইনসংক্ত বিল উথাপন করা যেত না। প্রয়োজনবোধে রাষ্ট্রপতি জাতীয় পরিষদের অধিবেশনের অনুপস্থিতে আইনের ন্যায় অর্ডিন্যান্স জারি করতে পারতেন। তবে এভাবে জারিকৃত অর্ডিন্যান্সকে যথাশীঘ্র জাতীয় পরিষদের সামনে পেশ করতে হতো। জাতীয় পরিষদ কর্তৃক অনুমোদিত প্রতিটি বিলে রাষ্ট্রপতির সম্মতির প্রয়োজন হতো। তাঁর সম্মতি ছাড়া কোনো বিল আইনে পরিণত হতো না। জাতীয় পরিষদ কর্তৃক রাষ্ট্রপতির কাছে আইন সংক্রান্ত বিল পাঠান হলে রাষ্ট্রপতি ৩০ দিনের মধ্যে বিলটিতে সম্মতি দিতেন কিংবা সম্মতি দানে বিরত থাকতে পারতেন। কিংবা পুনর্বিবেচনার জন্য জাতীয় পরিষদের কাছে ফেরত পাঠাতে পারতেন। যদি প্রেসিডেন্ট উক্ত সময়ের মধ্যে বিলে সম্মতি দান হতে বিরত থাকতেন তাহলে বিলটি পুনরায় তিন-চতুর্থাংশ সদস্যের ভোটের মাধ্যমে রাষ্ট্রপতির কাছে পাঠান হতো। এমতাবস্থায় রাষ্ট্রপতিকে ১০ দিনের মধ্যে বিলে সম্মতি দিতে হতো। অথবা নির্বাচকমন্ডলীর মতামতের জন্যে প্রেরিত হতো। যদি প্রেসিডেন্ট উক্ত সময়ের মধ্যে সম্মতি দিতে ব্যর্থ হতেন তাহলে বিলটি আইনে পরিণত হয়েছে বলে ধরে নেয়া হতো।[৬৭]

Dhaka University Institutional Repository

১৯৬২ সালের সংবিধানের অধীনে কেন্দ্রীয় আইন পরিষদের অর্থ সংক্রান্ত ক্ষমতা খর্ব করে রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা বৃদ্ধি করা হয়। রাষ্ট্রপতি জাতীয় পরিষদে বার্ষিক বাজেট পেশ করতেন। কেন্দ্রীয় সরকারের আয়-ব্যয় মঞ্জুর করা জাতীয় পরিষদের হাতে ন্যস্ত ছিলো, অথচ রাষ্ট্রপতির সম্মতি ব্যতীত কোনো অর্থ বিল পাস হতো না। রাষ্ট্রপতি একটি অতিরিক্ত বাজেটও পেশ করতে পারতেন। সমগ্র বাজেটের কিঞ্চিৎ অংশ ছিলো নতুন ব্যয়। যার ওপর শুধু জাতীয় পরিষদের নিয়ন্ত্রণ ছিলো।

এই সংবিধানে শাসন সংক্রান্ত সকল ক্ষমতা প্রেসিডেন্টের হাতে ন্যস্ত ছিলো। তিনি কিংবা তাঁর মন্ত্রীগণ আইনসভার নিকট দায়ী ছিলেন না, মন্ত্রীগণ ছিলেন প্রেসিডেন্টের আজ্ঞা বাহী মাত্র।[৬৮] তবে জাতীয় পরিষদ পরোক্ষভাবে শাসন বিভাগকে কিছুটা নিয়ন্ত্রণ করতে পারত। সাধারণতঃ বিভিন্ন প্রকার নিন্দাসূচক প্রস্তাব আনায়নের মাধ্যমে বাজেট আলোচনার মাধ্যমে পরিষদ শাসন বিভাগকে নিয়ন্ত্রণ করতো। এছাড়া গুরুতর অসদাচরণ ও সংবিধান লংঘনের অভিযোগে পরিষদ রাষ্ট্রপতিকে অভিযুক্ত করতে পারত।[৬৯]

১৯৬২ সালের সংবিধান ও পূর্ব বাংলার আইনসভা

প্রাদেশিক পরিষদ নামে পরিচিত পূর্ব বাংলার আইন পরিষদ একটি কক্ষ ও গভর্ণরকে নিয়ে গঠিত হয়। এই আইনসভায় মোট ১৫৫ জন সদস্য ছিলো। তন্মধ্যে পাঁচটি আসন মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত ছিলো।

১৯৬২ সালের সংবিধানের দ্বারা আইন প্রণয়ণের ক্ষেত্রে প্রাদেশিক আইনসভার ক্ষমতা সীমিত করা হয়। আইনসভা কর্তৃক গৃহীত বিল সম্মতির জন্য গভর্ণরের কাছে প্রেরণ করা হতো। গভর্ণর কোনো বিলে ভেটো প্রয়োগ করলে তা যদি আইনসভায় পুনরায় মোট সদস্য সংখ্যার দুই-তৃতীয়াংশ ভোটে পাস হয়ে গভর্ণরের নিকট প্রেরিত হতো তাহলে তাতে তিনি ৯০ দিনের মধ্যে সম্মতি দিতেন কিংবা বিলটি জাতীয় পরিষদে (কেন্দ্রীয় আইন পরিষদে) পাঠাবার জন্য রাষ্ট্রপতিকে অনুরোধ করতে পারতেন।[৭০] গভর্ণরের ইচ্ছার বিরূদ্ধে কোনো আইন পাস হতো না। জাতীয় পরিষদের আর্থিক ক্ষমতাও অনুরূপ ছিলো। সাংবিধানিক নিয়মানুসারে পাকিস্তানের গভর্ণরদ্বয় রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হতেন এবং তাঁর খুশীমত স্বীয় পদে বহাল থাকতেন। গভর্ণরও তাঁর মন্ত্রীগণ আইনসভার পরিবর্তে রাষ্ট্রপতির কাছেই দায়ী থাকতেন। কার্যতঃ আইনসভা ছিলো শাসন বিভাগের ওপর নিয়ন্ত্রণহীন। ফলে বাংলার জনগণ মেনে নেয়নি আইয়ুব সরকারকে। ১৯৬৯ এর গণঅভ্যুত্থানের মাধ্যমে পতন ঘটে তাঁর এবং ক্ষমতায় আসেন আর এক সামরিক জান্তা ইয়াহিয়া।

Dhaka University Institutional Repository

১৯৪৭-১৯৬২ সাল পর্যন্ত পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক আইনসভাগুলো বিশ্লেষণ করে দেখা যাচ্ছে যে, সংসদীয় সরকারের মূলনীতি দায়িত্বশীল সরকার প্রতিষ্ঠা করতে আইনসভাগুলো ব্যর্থ হয়েছে। দায়িত্বশীল সরকার প্রতিষ্ঠা করতে হলে আইনসভার সার্বভৌম ক্ষমতা থাকতে হবে। রাষ্ট্রপতি, গভর্ণর ও মন্ত্রীসভা তাঁদের কার্যের জন্য যৌথভাবে আইনসভার নিকট দায়বদ্ধ থাকবে। ১৯৪৭ সালের ভারত স্বাধীনতা আইনে অন্তবর্তীকালীন সরকারের অধীনে "আইনগত সার্বভৌমত্বের" বিধান থাকলেও বাস্তবে কেন্দ্র ও প্রদেশগুলোর পার্লামেন্টের ক্ষমতা ছিলো অসাড়। ১৯৫৬ সালের সংবিধানে সংসদীয় সরকার প্রতিষ্ঠা হলেও, বাস্তবায়িত হতে না হতেই ১৯৫৮ সালে সামরিক শাসন জারির মধ্য দিয়ে বিলুপ্ত ঘটে। ১৯৬২ সালের সংবিধানে আইনসভাগুলোর ক্ষমতাতো দূরের কথা রাষ্ট্রপতির একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

১৯৭০ এর সাধারণ নির্বাচন, পাকিস্তান জাতীয় পরিষদ ও পূর্ব বাংলার প্রাদেশিক পরিষদ

আইয়ুব খান ১৯৬২ সালের সংবিধানের মাধ্যমে দেশের সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী হয়ে পূর্ব পাকিস্তানের ওপর পাঞ্জাবীদের অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক শাসন-শোষণ কায়েম করে। আইয়ুবের স্বৈরাচারী শাসন আমলে বাঙালীদের ওপর চরম নির্যাতন নেমে আসে এবং পূর্ব বাংলার জনগণের মধ্যে বিক্ষোভ পুঞ্জিভূত হতে থাকে। এ সময় আওয়ামীলীগের নেতৃত্বে পূর্ব-বাংলার স্বায়ত্তশাসনের দাবিতে আন্দোলন তীব্রতর হয়ে ওঠে। ১৯৬৫ সনে পাক-ভারত যুদ্ধের ফলে স্বায়ত্তশাসনের দাবি তীব্রতা লাভ করে। এমনি পরিস্থিতিতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে আওয়ামীলীগ পূর্ব বাংলার পূর্ণ স্বায়ত্তশাসনের লক্ষ্যে ঐতিহাসিক ছয়-দফা কর্মসূচী উত্থাপন করেন।

স্বাধীন বাংলার সংগ্রামে ছয়-দফার ভূমিকা অনন্য অসাধারণ। বৃটিশ গণতন্ত্রের ইতিহাসে যেমন 'অধিকার বিল', ফরাসী বিপ্লবের ক্ষেত্রে যেমন 'মৌলিক অধিকার', বাংলাদেশের আন্দোলনের ভিত্তি ছিলো তেমনি 'ছয়-দফা দাবি'। ছয়-দফাতে পাকিস্তানকে ভাঙ্গতে চেয়েছিলো না, বরং গড়তে চেয়েছিলো বাংলাদেশ।[১১] কিন্তু স্বৈরাচারী আইয়ুব ছয়-দফাতো মেনে নিলেন না; বরং শেখ মুজিবুর রহমানকে তাঁর বিশ্বস্ত দলবল সহ কারাগারে নিক্ষেপ করেন এবং সাজানো নাটকের ন্যায় শেখ মুজিবকে 'আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায়' সংশ্লিষ্ট করা হয়। শুরু হয় প্রধানতঃ পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের লক্ষ্যে ১৯৬৬ সালের ১৩ ফেব্রুয়ারী ঐতিহাসিক ছয়-দফা এবং ১৯৬৯ সালের ৫ জানুয়ারী সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম-পরিষদের ১১ দফা দাবি সংবলিত এক গণআন্দোলন।[১২] এই গণ আন্দোলনই ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থান নামে পরিচিত। গণঅভ্যুত্থানের ফলে শেখ মুজিবের মুক্তি এবং শেষ পর্যন্ত আন্দোলন দমনে আইয়ুব তাঁর সমুদয় চেষ্টা ব্যর্থ করে ১৯৬৯ সালের ২৫ মার্চ ইয়াহিয়ার কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করে পদত্যাগ করেন। ক্ষমতায় আসেন আরেক সামরিক জান্তা। যিনি ক্ষমতায় এসেই দ্বিতীয় বারের মত সামরিক আইন জারি করেন। ভেঙ্গে দেন জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদ সমূহ এবং বাতিল করেন ১৯৬২ এর সংবিধান। ১৯৬৯ সালের ৩১ মার্চ নিজেকে ঘোষণা করেন পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট।

Dhaka University Institutional Repository

ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়ে ইয়াহিয়া খান আইনগত কাঠামো আদেশে পাকিস্তানের সংবিধান প্রণয়ণের জন্য একটি জাতীয় পরিষদ গঠনের ব্যবস্থা করেন। "এক ব্যক্তি, এক ভোট" এই নীতি অনুসারে পাকিস্তান জাতীয় পরিষদে প্রত্যেক প্রদেশকে জনসংখ্যার ভিত্তিতে প্রতিনিধিত্ব দেয়া হয়। ৩১৩ সদস্য বিশিষ্ট জাতীয় পরিষদে ৩০০টি সাধারণ আসন ও ১৩টি মহিলা আসনের ব্যবস্থা করা হয়।[৭৩] ইহা ব্যতীত প্রত্যেক প্রদেশে একটি করে প্রাদেশিক পরিষদের ব্যবস্থা করা হয়। বলা হয় যে, জাতীয় পরিষদ ও প্রাদেশিক পরিষদগুলোতে সাধারণ আসনে সদস্যগণ প্রত্যক্ষ ভোটে এবং মহিলা সদস্যগণ অন্য পরিষদ সদস্যদের ভোটে নির্বাচিত হবেন।[৭৪]

আইনগত কাঠামো আদেশের অধীনে ১৯৭০ সনের ৭ ডিসেম্বর পাকিস্তানের সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনে আওয়ামীলীগ পূর্ব-পাকিস্তানের জন্য নির্ধারিত জাতীয় পরিষদের ১৬৯টি আসনের মধ্যে ১৬৭টি আসন লাভ করে। পশ্চিম পাকিস্তানের জুলফিকার আলী ভুট্টোর নেতৃত্বাধীন পাকিস্তান পিপলস্ পার্টি জাতীয় পরিষদের ৮৮টি আসন লাভ করে এবং পূর্ব পাকিস্তানের প্রাদেশিক পরিষদে আওয়ামীলীগ ২৮৮টি আসন লাভ করে। জাতীয় পরিষদের ৩১৩টি আসনের মধ্যে আওয়ামীলীগ ১৬৭টি আসন লাভ করে নিরংকুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে।[৭৫] কিন্তু নির্বাচনের পর নানা টালবাহানার মুখে জাতীয় পরিষদের অধিবেশন আহবান না করে ১ মার্চ তারিখে ইয়াহিয়া জাতীয় পরিষদের অধিবেশন অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত ঘোষণা করেন।

সম্পূর্ণ অন্যায় ও অগণতান্ত্রিকভাবে অধিবেশন স্থগিত ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র বাংলাদেশ প্রচন্ড বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। ২ মার্চ ঢাকায় এবং ৩ মার্চ সারা বাংলাদেশে পূর্ণ হরতাল পালিত হয়। ৩ মার্চ পল্টন ময়দানে শেখ মুজিব অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দেন। প্রচন্ড গণবিস্ফোরণের মুখে ইয়াহিয়া খান তাঁর কৌশল পরিবর্তন করেন এবং ৬ মার্চ ঘোষণা করেন যে, ২৫ মার্চ জাতীয় পরিষদের অধিবেশন বসবে। ইয়াহিয়া ইতোপূর্বে ঢাকায় সংসদীয় দলগুলোর নেতৃত্বে এক সম্মেলন অনুষ্ঠানের প্রস্তাব দেন। কিন্তু শেখ মুজিব সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন এবং ৭ মার্চ ঢাকার রমনা রেসকোর্স ময়দানের ঐতিহাসিক জনসভায় আন্দোলনের কর্মসূচী ঘোষণা করেন। তিনি বজ্রকণ্ঠে ঘোষণা করেন, "এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।"[৭৬] নেতার আদেশ বাংলাদেশের আপামর জনগণ অক্ষরে অক্ষরে পালন করে। এভাবে সুশৃঙ্খল ও সফল অসহযোগ আন্দোলনের নজির পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল।

১৯৭১ সালের ১৫ মার্চ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের শাসনভার গ্রহণ করে ৩৫টি নির্দেশ জারি করেন। পূর্ব-পাকিস্তানের রাজনৈতিক পরিস্থিতি ইয়াহিয়া খানের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়, ইতোমধ্যে সংবিধান বিষয়ে আলোচনার জন্য ইয়াহিয়া খান এবং কতিপয় পশ্চিম

Dhaka University Institutional Repository

পাকিস্তানের নেতৃবৃন্দ পুনরায় ১৫ মার্চ ঢাকায় আসেন এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে বিভিন্নভাবে আলোচনা চালিয়ে যায়। এমন একটি ধারনা সৃষ্টি করা হয় যে, একটি সমঝোতা সম্পন্ন হচ্ছে যার আওতায় ইয়াহিয়া খান জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করবে। কিন্তু কার্যতঃ পর্দার অন্তরালে বাঙ্গালীদের নিশ্চিহ্ন করার ষড়যন্ত্র চলতে থাকে।[৭৭] তাই আলোচনার ফলাফল সম্পর্কে কোনোরূপ ঘোষণা ছাড়াই ইয়াহিয়া ২৫ মার্চ রাতের অন্ধকারে ঢাকা ত্যাগ করেন এবং তাঁর সেনাবাহিনী অতর্কিতভাবে প্রধানতঃ ঢাকা সহ দেশের অন্যান্য শহর-বন্দরেও নিরস্ত্র জনগণের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং হাজার হাজার বাঙ্গালী নর-নারীকে হত্যা করে। এই হত্যাকান্ড আরম্ভ করার অল্পক্ষণের মধ্যে শেখ মুজিবকে তাঁর বাসভবন হতে গ্রেপ্তার করা হয়। শেখ মুজিব গ্রেপ্তার হবার অব্যবহিত পূর্বে বাংলাদেশকে একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র বলে ঘোষণা করেন। তারই ফল স্বরূপ ১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিল তারিখে বাংলাদেশের "স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র" জারি করা হয়। এই ঘোষণা-পত্র "স্বাধীনতার ঘোষণার নির্দেশ" নামেও পরিচিত।[৭৮] ২৬ মার্চ ভোর বেলায় কালুরঘাট ট্রান্সমিশন হতে আওয়ামীলীগ নেতা আঃ হান্নান বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের পক্ষে স্বাধীনতার ঘোষণা পত্রটি পাঠ করে শোনান।[৭৯]

স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র

পাকিস্তানী সেনাবাহিনী অতর্কিত পিলখানায় ইপিআর ঘাঁটি ও রাজারবাগ পুলিশ লাইন আক্রমন করছে এবং শহরের লোকদের হত্যা করেছে। ঢাকা ও চট্টগ্রামের রাস্তায় যুদ্ধ চলছে। আমি বিশ্বের জাতিসমূহের কাছে সাহায্যের আবেদন করছি। আমাদের মুক্তি যোদ্ধারা বীরত্বের সঙ্গে মাতৃভূমি মুক্তি করার জন্য শেষ রক্তবিন্দু থাকা পর্যন্ত যুদ্ধ চালিয়ে যান। আপনাদের পাশে এসে যুদ্ধ করার জন্য পুলিশ, ইপিআর, বেঙ্গল রেজিমেন্ট ও আনসারদের সাহায্য চান। কোনো আপোষ নেই, জয় আমাদের হবেই। আমাদের পবিত্র মাতৃভূমি থেকে শেষ শত্রুকে বিতাড়িত করুন। সকল আওয়ামীলীগ নেতা, কর্মী এবং অন্যান্য দেশ প্রেমিক ও স্বাধীনতা প্রিয় লোকদের এ সংবাদ পৌঁছে দিন। আল্লাহ্ আপনাদের মঙ্গল করুন। জয় বাংলা।

শেখ মুজিবুর রহমান
২৬ মার্চ, রাত ১.৩০ মিঃ, ১৯৭১ সন[৮০]

পরদিন ২৭ মার্চ বিকাল বেলা ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের সেনা কর্মকর্তা মেজর জিয়াউর রহমান একই বেতার কেন্দ্র থেকে বঙ্গবন্ধুর পক্ষে স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রটি পাঠ করেন।[৮১] অতঃপর বাঙ্গালী জাতি পৃথিবীর ইতিহাসে অবিস্মরণীয় এক রক্তক্ষয়ী স্বাধীনতার সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ে। গড়ে ওঠে মুক্তিবাহিনী। ২৬৬ দিন মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে বাঙ্গালীরা লাভ করে স্বাধীনতার লাল গোলাপটি। ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর বিশ্বের মানচিত্রে জন্ম হয় স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ।

Dhaka University Institutional Repository

বিপ্লবী সরকার গঠন এবং স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র

১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিল বাংলাদেশের ইতিহাসে এক অবিস্মরণীয় দিন। ঐদিন শুধু বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব ঘোষণাকেই অনুমোদন করা হয়নি; বরং স্বাধীনতাকে পরিপূর্ণ ও সুসংহতো করার উদ্দেশ্যে পাক-হানাদার বাহিনীকে দেশ হতে উৎখাত করার জন্য বিপ্লবী সরকার প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।[৮২] স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রে বলা হয় ১৯৭০ এর নির্বাচিত প্রতিনিধিদের নিয়ে বিপ্লবী সরকার গঠন করা হবে।

১০ এপ্রিলের ঘোষণা অনুসারে স্বাধীন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশে বিপ্লবী সরকার গঠন করা হয়। তাজউদ্দীন আহমদ প্রধানমন্ত্রী, মনসুর আলি (অর্থ), খন্দকার মোসতাক আহমদ (পররাষ্ট্র) এবং এ,এইচ,এম, কামরুজ্জামান (স্বরাষ্ট্র ও পূণর্বাসন) মন্ত্রী নিযুক্ত হন। শেখ মুজিবুর রহমানের অবর্তমানে উপ-রাষ্ট্রপ্রধান সৈয়দ নজরুল ইসলাম রাষ্ট্রপ্রধানের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। জেনারেল (তখন কর্ণেল) মোহাম্মদ আতাউল গণি ওসমানী সশস্ত্র বাহিনীর অধিনায়ক নিযুক্ত হন।[৮৩] অধ্যাপক ইউসুফ আলি স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র আনুষ্ঠানিকভাবে পাঠ করে শোনান। পরবর্তীকালে একটি উপদেষ্টা পরিষদ গঠন করা হয়।[৮৪]

১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিল স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রটি হচ্ছেঃ বাংলাদেশের প্রথম সাংবিধানিক দলিল যা একটি রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার গঠন করে এবং যুদ্ধকালীন সময়ে রাষ্ট্রপতির ওপর সর্বময় ক্ষমতা ন্যস্ত ছিলো। এটি কেবল যুদ্ধকালীন সময়েই নয় বরং পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশ সরকারেরও কর্তৃত্বের উৎস ছিলো। ১৯৭২ সালের ১৬ডিসেম্বর পর্যন্ত এটি ছিলো বাংলাদেশের সংবিধান। এই ঘোষণায় রাষ্ট্রপতিকে সামরিক বাহিনীর সর্বাধিনায়ক ঘোষণা করা হয় এবং এ ঘোষণা অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি যে কোনো আইন প্রণয়ন করতে পারতেন। তিনি কর ধার্য ও অর্থ ব্যয় করতে পারতেন। রাষ্ট্রপতি গণপরিষদের অধিবেশন আহবান ও স্থগিত করতে পারতেন, বাংলাদেশে একটি আইনানুগ ও নিয়মতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠার সকল ক্ষমতা রাষ্ট্রপতিকে প্রদান করা হয়।[৮৫] বিপ্লবী সরকারের নেতৃত্বেই বাংলাদেশ স্বাধীনতা লাভ করে। স্বাধীনতার এই ঘোষণাপত্র ১৯৭২ সালের ১১ জানুয়ারী পর্যন্ত বহাল ছিলো।

১৯৭২ সালের অস্থায়ী সংবিধান

রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭২ সালের ১১ জানুয়ারী "বাংলাদেশের অস্থায়ী সংবিধান আদেশ" জারি করেন। এই আদেশ অনুসারে বাংলাদেশে "প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে একটি মন্ত্রীসভা থাকবে" (অনুচ্ছেদ-৫)। "রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ অনুযায়ী তাঁর কার্য সম্পাদন করবেন" (অনুচ্ছেদ-৬)। "রাষ্ট্রপতি গণপরিষদের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের আস্থাভাজন একজন পরিষদ সদস্যকে প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ করবেন। অন্যান্য মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী ও উপ-মন্ত্রীগণ প্রধান মন্ত্রীর পরামর্শ অনুসারে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হবেন" (অনুচ্ছেদঃ৭)। নতুন সংবিধান প্রবর্তিত না হওয়া পর্যন্ত "মন্ত্রীসভা

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশের একজন নাগরিককে রাষ্ট্রপতি মনোনীত করবেন" (অনুচ্ছেদঃ৮)।[৮৬] এই আদেশকে বাংলাদেশে সংসদীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পথে এক সুস্পষ্ট পদক্ষেপ বলা যেতে পারে। অস্থায়ী সংবিধান আদেশ ১৯৭২ সালের ১৫ ডিসেম্বর পর্যন্ত বহাল ছিলো।

গণপরিষদ গঠন ও বাংলাদেশের স্থায়ী সংবিধান প্রণয়ন

বাংলাদেশের জন্য একটি স্থায়ী সংবিধান রচনার প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে রাষ্ট্রপতি ১৯৭২ সালের ২৩ মার্চ "বাংলাদেশ গণপরিষদ আদেশ" (রাষ্ট্রপতির ২২ নম্বর আদেশ) নামে একটি আদেশ জারি করেন। এই আদেশ অনুসারে ১৯৭০ ও ১৯৭১ সালের নির্বাচনে বাংলাদেশ হতে যে সকল গণপ্রতিনিধি সাবেক পাকিস্তান জাতীয় পরিষদে ও পূর্ব-পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদে নির্বাচিত হয়েছিলেন তাঁদেরকে নিয়ে বাংলাদেশে গণপরিষদ গঠিত হয়। এই গণপরিষদের ওপর গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের জন্য সংবিধান রচনার দায়িত্ব অর্পণ করা হয়। রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ অনুযায়ী গণপরিষদের অধিবেশন আহবান ও স্থগিত করতে পারতেন এবং গণপরিষদ ভেঙ্গে দিতে পারতেন।[৮৭] ঐ একই দিনে রাষ্ট্রপতি আর একটি আদেশ (রাষ্ট্রপতির ২৩ নম্বর আদেশ) জারি করেন। ইহা "গণপরিষদ সদস্য আদেশ" নামে অভিহিত। আদেশে বলা হয়, কোনো গণপরিষদ সদস্য তাঁর দল হতে পদত্যাগ করলে অথবা উক্ত দল হতে বহিস্কৃত হলে তাঁর সদস্য পদ বাতিল হয়ে যাবে। এই আদেশের উদ্দেশ্যে ছিলো পরিষদে দলীয় শৃঙ্খলা বজায় রাখা।

১৯৭২ সালের ১০ এপ্রিল ৪৩০ জন সদস্য বিশিষ্ট [৮৮] গণপরিষদের প্রথম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। এই অধিবেশনে স্পীকার ও ডেপুটি স্পীকার নির্বাচন, গণপরিষদের কার্যপ্রণালী গৃহীত এবং ডঃ কামাল হোসেনকে সভাপতি করে ৩৪ সদস্য বিশিষ্ট "খসড়া সংবিধান প্রণয়ন কমিটি" গঠিত হয়। খসড়া সংবিধান প্রণয়ন কমিটি মোট ৭৪টি বৈঠকে মিলিত হয়ে প্রায় ৩০০ ঘন্টা সময় ব্যয় করে ১১ অক্টোবর সংবিধানের পূর্ণাঙ্গ খসড়া চূড়ান্তভাবে গৃহীত হয়। ১৯৭২ সালের ১২ অক্টোবর গণপরিষদের দ্বিতীয় অধিবেশনে আইন ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী ডঃ কামাল হোসেন খসড়া সংবিধানটি বিল আকারে পেশ করেন। বিলটির ওপর ৪৮ জন সদস্য ৮ দিনে মোট ১০টি বৈঠকে ৩২ ঘন্টা আলোচনা করেন। সংবিধানের ওপর বেসরকারী দলের ১টি সংশোধনীসহ ৮৪টি সংশোধনী গৃহীত হয়। ১৯৭২ সালের ৪ নভেম্বর ১.১০ মিনিটে সদস্যদের তুমুল হর্ষধ্বনি ও করতালির মধ্যে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান গণপরিষদ কর্তৃক গৃহীত হয়। এই ভাবে বাঙ্গালী জাতি স্বাধীনতা অর্জনের মাত্র ৩২৫ দিন পরে একটি পূর্ণাঙ্গ সংবিধান লাভ করে। এই সংবিধানে ১৫৩টি অনুচ্ছেদ, ১১টি ভাগ, ১টি প্রস্তাবনা ও ৪টি তফসীল ছিলো। উল্লেখ্য যে, পঞ্চম ভাগের ৬৫ অনুচ্ছেদে জাতীয় সংসদ নামে এক কক্ষ বিশিষ্ট একটি আইনসভা ছিলো। ১৯৭২ সালের ১৪ ও ১৫ ডিসেম্বর গণপরিষদের একটি আনুষ্ঠানিক অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। এই অধিবেশনে ন্যাপ সদস্য সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত ব্যতীত সবাই একটি হস্তলিখিত স্বাক্ষর করেন। ঐতিহাসিক বিজয় দিবস ১৬ ডিসেম্বর হতে বাংলাদেশের সংবিধান কার্যকরী হয় এবং সেই দিনই গণপরিষদ ভেঙ্গে যায়।[৮৯]

Dhaka University Institutional Repository

তথ্য নির্দেশ ও টীকা

১. ১৮৩৩ সালে বৃটিশ সার্বভৌমত্ব ঘোষণার পূর্ব পর্যন্ত কোম্পানি সরকারের আইনকে 'রেগুলেশন' বলা হতো।

২. Biman Bihari Majumdar, Indian Political Associations and Reforms of Legislature, Calcutta, 1965, 40; P.N. Sinha Roy (ed), Chronicle of the British Indian Association Calcutta, 1965, PP.: 9-19.

৩. William Taylor, Indian Reform-Suggeston For the Consideration of the British Parliament, London, 1871, P. 5.

৪. Hansard, Parliamentary, Debates, Vol. 162. Col. 1157.

৫. Parliamentary Papers, Vol. 43, 1861. NO. 307.

৬. The Indian Councils Act, 1861, Section : 44. আইন ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় (আইন বিভাগ), পাকিস্তান সরকার, Consitutional Documents (করাচী; ১৯৬৪) (এরপর থেকে The Indian Council Act উদ্ধৃত হবে)।

৭. ঐ, Section : 3.

৮. ঐ, Section : 12.

৯. অবিভক্ত বাংলায় এই উদ্দেশ্যে রাজনৈতিক উদ্যোগ গ্রহণ কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার অনেক আগেই শুরু হয়েছিলো। বিশেষ করে উল্লেখ করা যেতে পারে ১৮৬৭-তে সুরেন্দ্রনাথ জনমত গড়ে তোলার জন্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন 'কলকাতা ইন্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশন।'

১০. সৈয়দ সিরাজুল ইসলাম, বঙ্গীয় আইনসভা ও শাসনতান্ত্রিক বিকাশ, অধ্যায় ১১, পৃষ্ঠাঃ ৩০০, দ্রষ্টব্যঃ বাংলাদেশের ইতিহাস ১৭০৪-১৯৭১, রাজনৈতিক ইতিহাস ১ম খন্ড, সম্পাদক সৈয়দ সিরাজুল ইসলাম, ঢাকা, এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ, ডিসেম্বর ১৯৯৩।

১১. The Indian Council Act, 1892, Section : 2.

১২. চারটি প্রদেশ বাংলা, মাদ্রাজ, বোম্বাই ও উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ।

১৩. ডঃ এম,এ, ওদুদ ভূঁইয়া, বাংলাদেশের রাজনৈতিক উন্নয়ন, ঢাকা, রয়েল লাইব্রেরী, ১৯৮৯, পৃষ্ঠাঃ২৭।

১৪. The Indian Council Act, 1892, Section : 20

১৫. G.W. Choudhury, Democracy in Pakistan, Dhaka, 1963, P. 3-7.

Dhaka University Institutional Repository

১৬. ভারত সচিব লর্ড মর্লি ও গভর্ণর জেনারেল মিন্টোর নামানুসারে বৃটিশ পার্লামেন্ট এই আইন প্রণয়ন করে।

১৭. ডঃ এমাজউদ্দীন আহমদ, পৌরবিজ্ঞানের কথা, দ্বিতীয় খন্ড, ঢাকা, বাংলাদেশ বুক কর্পোরেশন লিঃ জুলাই, ১৯৯০, পৃষ্ঠা ঃ ৪৫।

১৮. Dr. M.A. Chaudhuri, Government and Politics in Pakistan, Dhaka, Puthighar Ltd., P. 102.

১৯. ডঃ এম, এ ওদুদ ভূঁইয়া, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ঃ ৬৭।

২০. Dr. M.A. Chaudhuri, প্রাগুক্ত, P. 103.

২১. ১৯১৯ সালের আইন মন্টেগু চেমসফোর্ড সংস্কার নামে পরিচিত।

২২. Report of the Indian Statutory Commission, Vol. 1, 1930, P. 168

২৩. ঐ,

২৪. Government of India Act, 1919, Section : 28.

২৫. ভোটের অযোগ্য বিষয়গুলোর মধ্যে (ক) সুদ ও প্রায় নিঃশেষিত তহবিলের খরচ, (খ) রাজা বা ভারত সচিব কর্তৃক নিযুক্ত কর্মকর্তাদের বেতন, ভাতা ও পেনশন; (গ) প্রতিরক্ষা, রাজনৈতিক বিভাগ ও ধর্ম প্রচারকদের ব্যয় সংক্রান্ত বিষয় (ঘ) প্রধান কমিশনারদের বেতন ও ভাতাদি উল্লেখযোগ্য।

২৬. ডঃ এম,এ, ওদুদ ভূঁইয়া, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ঃ ১৪৮।

২৭. Government of India Act, 1919, Section : 18.

২৮. আবুল ফজল হক, বাংলাদেশের শাসনব্যবস্থা ও রাজনীতি, বাংলা একাডেমী ঢাকা, অক্টোবর ১৯৭৪, পৃষ্ঠা ঃ ১৭।

২৯. গভর্ণর জেনারেলের আইন, অথবা গভর্ণরের আইন, অধ্যাদেশ, পুলিশ আইন, গভর্ণর জেনারেলের স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা, ভারতের রিজার্ভব্যাংক ইত্যাদি।

৩০. Government of India Act, 1919, Section : 42, 43, 44.

৩১. ঐ, Section : 12 (2)

৩২. ঐ, Section : 33, 44.

৩৩. বাঙালীরা হলেন মৌলবী আবদুল লতিফ, রাজা রামমোহন রায়ের কণিষ্ঠ ছেলে রাজা রামপ্রসাদ রায়, বর্ধমানের জমিদার রাজা প্রতাপচন্দ্র এবং দ্বারকানাথ ঠাকুরের চাচাতো ভাই প্রসন্ন কুমার।

৩৪. Procedings of Bengal Legislative Council, Vol. 1, 29, March, 1862, 33, PP. 101-102.

Dhaka University Institutional Repository

৩৫. ঐ, PP. 98-99.

৩৬. সৈয়দ সিরাজুল ইসলাম, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ঃ ৩০০।

৩৭. বর্ধমানের ম্যাজিস্ট্রেট ১৮৯৬ সালে মেমারীতে ভ্রমনে যান, যাওয়ার সময় পথে একটি গরুর গাড়ি সামনে পড়ে, ফলে তাঁকে কিছুক্ষণ রাস্তায় অপেক্ষা করতে হয়। তিনি সঙ্গে সঙ্গে গাড়ি থেকে নেমে ছড়ি দিয়ে ঐ গাড়োয়ানকে বেত্রাঘাত করে রক্তপাত ঘটালো। সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী বঙ্গীয় আইনসভায় ঐ ঘটনা তুলে ধরেন এবং গভর্ণরকে এ ব্যাপারে প্রশ্ন করেন। (উদ্ধৃত হয়েছে, সৈয়দ সিরাজুল ইসলাম, প্রাগুক্ত, (পৃষ্ঠা ঃ ৩০০)।

৩৮. বিস্তারিত আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য ঃ Syeed Anwar Husain, Administration of India 1858-1927, Delhi, Seema Publication, 1985, ch. 4 এবং মুনতাসীর মামুন (সম্পাদিত) "বঙ্গভঙ্গ", ঢাকা, সমাজ নিরীক্ষণ কেন্দ্র, ১৯৮০।

৩৯. সৈয়দ সিরাজুল ইসলাম, বঙ্গীয় আইনসভা ও শাসনতান্ত্রিক বিকাশ, প্রাগুক্ত; পৃষ্ঠা ঃ ৩০১।

৪০. শওকত আরা হোসেন, বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভা ১৯২১-১৯৩৬ অবিভক্ত বাংলার সমাজ ও রাজনীতি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি, ১৯৯০, পৃষ্ঠা ঃ ১৪।

৪১. Government of India, Papers Relating to the Constitutional Reform in India, Vol. 11, (1908) Page. 245.

৪২. ঐ, Page. 246.

৪৩. সৈয়দ সিরাজুল ইসলাম, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ঃ ৩০৪-৩০৭।

৪৪. Government of India Act, 1935, Section : 50

৪৫. ঐ, Section : 78, 79, 86 (2)

৪৬. ঐ সকল বিধিমালা ১৮৬২ সালের ২৫ জানুয়ারি গভর্ণর জেনারেল অব ইন্ডিয়া ইন কাউন্সিলের অনুমোদন পায়। Notification No. 1932 Dated, 25-12-1912, Published in the Calcutta Gazette, December 25, 1912, Part-V, P. 145.

৪৭. সৈয়দ সিরাজুল ইসলাম, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ঃ ৩১৩।

৪৮. S.N. Banerjee, A Nation in the Making, Calcutta 1925, P. 130.

৪৯. সৈয়দ সিরাজুল ইসলাম, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ঃ ৩১৪।

৫০. ঐ, পৃষ্ঠা ঃ ৩১৫।

৫১. The constituent Assembly of Pakistan (Increase and Redistribution of seats), Act, 1949.

৫২. The Indian Independence Act, 1947, Cluse : 1.

Dhaka University Institutional Repository

৫৩. ঐ, Cluse : 8, Section (c)

৫৪. ঐ, Clause 6, Section (3)

৫৫. ভারতীয় স্বাধীনতা আইনের ৯ নম্বর ধারায় প্রয়োজন মেটানোর জন্য গভর্ণর জেনারেলকে আদেশ জারি করার ক্ষমতা দেয়া হয় ঃ (ক) ১৯৪৭ সালের আইনের ধারাসমূহ কার্যকর করার জন্য; (খ) এ আইনের অধীনে গঠিত নতুন প্রদেশ সমূহের ক্ষমতা, অধিকার, সম্পত্তি এবং সরকারী দেনা-পাওয়া বন্টনের জন্য; (গ) ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন এবং অন্যান্য শাসনতান্ত্রিক নির্দেশ ও নিয়মাবলী সংশোধন বা পরিবর্তন করে তুলবার জন্য; (ঘ) ভারত স্বাধীনতা আইনের ধারা কার্যকর না হওয়া পর্যন্ত অবস্থান্তরে বা পরিবর্তনে যে অসুবিধা সৃষ্টি হয় তা দূর করবার জন্য; (ঙ) ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাংক সম্পর্কিত অর্থ ব্যবস্থা বা অন্যান্য বিষয় নিয়ন্ত্রণ করবার জন্য; (চ) নতুন ডোমিনিয়নের শাসনতন্ত্র, আইনসভা, আদালত বা অন্য কোনো কর্তৃপক্ষের ক্ষমতা কিংবা এখতিয়ার পরিবর্তন করার জন্য এবং নতুন আইনসভা, আদালত বা পূর্ববর্তি কোনো বিষয়ে প্রয়োজনীয় বা সুবিধাজনক মনে হলে তথায় অন্যান্য কর্তৃপক্ষ সৃষ্টি করবার জন্য। (উদ্ধৃত হয়েছে, Constitutional Documents, Volume III, Ibid, The Indian Independence Act, 1947 Section : 9)

৫৬. K.B. Sayeed, Pakistan : The Formative Phase, Oxford University Press, Dhaka, 1967, P. 237.

৫৭. Sir. Ivor Jennings, Cabinet Government, Cambridge, Cambridge University, 1961, P. 16.

৫৮. মোঃ শফিকুর রহমান, বাংলাদেশের আইন, বিচার ব্যবস্থা এবং সাংবিধানিক ক্রমবিকাশ, ঢাকা, বিশ্বসাহিত্য ভবন ২৫ মে, ১৯৯৮, পৃষ্ঠা ঃ ৪২৪।

৫৯. Ibid, Dr. M.A. Chaudhuri, P. 182

৬০. ডঃ এম,এ, ওদুদ ভূঁইয়া, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ঃ ২২১।

৬১. H.J. Laski, A Grammar of Politics, George Allen and Unwin Ltd., London, 1950.

৬২. আবুল ফজল হক, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ঃ ৫২।

৬৩. ডঃ এম,এ, ওদুদ ভূঁইয়া, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ঃ ২৪১।

৬৪. Keith Callard, Pakistan : A Political Study, London, 1968, P. 132.

৬৫. Report of the Constitution Commission, Pakistan, 1961, P. 1.

৬৬. ডঃ এম,এ, ওদুদ ভূঁইয়া, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ঃ ২৫২।

৬৭. ঐ পৃষ্ঠা ঃ ২৫১।

Dhaka University Institutional Repository

৬৮. আবুল ফজল হক, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ঃ ৫৫।

৬৯. ডঃ এম,এ, ওদুদ ভূঁইয়া, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ঃ ২৫৩।

৭০. M. Munir, The Constitution of the Islamic Republic of Pakistan, 1962, Section : 71 (2)

৭১. ডঃ এমাজউদ্দীন আহমদ, দ্বিতীয় খন্ড, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ঃ ১২৩-১২৪।

৭২. ছয়-দফা ও ১১ দফা বিস্তারিত আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য, আবুল ফজল হক, বাংলাদেশের শাসনব্যবস্থা ও রাজনীতি, পৃষ্ঠা ঃ ৬১-৬৯।

৭৩. আবুল ফজল হক, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ঃ ৭০।

৭৪. ঐ, পৃষ্ঠা ঃ ৭১।

৭৫. মোঃ শফিকুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ঃ ৪৩৪।

৭৬. "Holiday", ২২ অক্টোবর, ১৯৭২।

৭৭. মোঃ শফিকুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ঃ ৪৩৭।

৭৮. আবুল ফজল হক, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ঃ ৭৯-৮০।

৭৯. মোঃ শফিকুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ঃ ৪৩৮।

৮০. কামরুল হুদা, স্বাধীনতা সংগ্রাম ও শেখ মুজিবুর রহমান ঢাকা, ব্রিক্কুল ষ্টীট মার্চ, ১৯৯৫ পৃষ্ঠাঃ২৩৮।

৮১. মোঃ শফিকুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ঃ ৪৩৮।

৮২. আবুল ফজল হক, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ঃ ৮২।

৮৩. ঐ, পৃষ্ঠা ঃ ৮২।

৮৪. উপদেষ্টা পরিষদের সদস্যরা হলেন- মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী, অধ্যাপক মোজাফফর আহমদ, কমরেড মনি সিং ও শ্রী মনোরঞ্জন ধর এবং আওয়ামীলীগের পাঁচ জন প্রতিনিধি, দ্রষ্টব্য ঃ আবুল ফজল হক প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ঃ ৮২-৮৩।

৮৫. মোঃ শফিকুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৪৪০-৪৪১।

৮৬. আবুল ফজল হক, তৃতীয় অধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ঃ ৮৭-৮৮।

৮৭. ঐ, পৃষ্ঠা ঃ ৮৯।

৮৮. মূলতঃ গণপরিষদের সদস্য সংখ্যা ছিলো ৪৬৯ জন। তন্মধ্যে ১৬৯ জন সাবেক জাতীয় পরিষদ সদস্য এবং ৩০০ জন প্রাদেশিক পরিষদ সদস্য। তাঁদের মধ্যে ২ জন পাকিস্তানের প্রতি আনুগত্য স্বীকার করে সেখানে থেকে যান, ১০ জন সদস্য মৃত্যু বরণ করেন। (এই ১০ জনের মধ্যে ৫ জন পাক দখলদার বাহিনীর হাতে নিহত হন), ২৩ জন আওয়ামীলীগ হতে বহিস্কৃত হওয়ার ফলে সদস্যপদ হারান এবং অপর ৪ জন দালালীর দায়ে আটক হন।

৮৯. সংবিধান প্রণয়ন সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ ও বিশ্লেষণের জন্য দেখুন, আবুল ফজল হক, বাংলাদেশের শাসন-ব্যবস্থা ও রাজনীতি, তৃতীয় অধ্যায়, পৃষ্ঠা ঃ ৮৭-১০৯।

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায়

জাতীয় সংসদের সাংবিধানিক কাঠামো, কার্যপ্রণালী, ক্ষমতা, কাজ ও মর্যাদা

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের ইতিহাস সহজ-সরল নয়, কন্টকাকীর্ণ। ১৯৭১ সাল হতে ১৯৯৫ সাল পর্যন্ত বার বার সেনাবাহিনীর উপস্থিতি ঘটেছে, গণতন্ত্র মার খেয়েছে, প্রচলিত ছিলো পাঁচটি পার্লামেন্টে চার ধরনের সরকার ব্যবস্থা। তন্মধ্যে প্রথম পার্লামেন্টে বহুদলীয় সংসদীয় সরকার ও একদলীয় রাষ্ট্রপতি ব্যবস্থা বিদ্যমান ছিলো। দ্বিতীয়,তৃতীয় ও চতুর্থ পার্লামেন্টের সরকার ছিলো বহুদলীয় রাষ্ট্রপতি ব্যবস্থা। পঞ্চম পার্লামেন্ট বহুদলীয় সংসদীয় সরকারের মাধ্যমে যাত্রা শুরু করলেও সংসদ থেকে বিরোধী দলের পদত্যাগের মাধ্যমে একদলীয় সংসদীয় সরকারে পরিণত হয়। এ অধ্যায়ে জাতীয় সংসদের সাংবিধানিক কাঠামো, কার্যপদ্ধতি, ক্ষমতা, কাজ ও মর্যাদা আলোচনা করার সাথে বিভিন্ন সংশোধনীর মাধ্যমে জাতীয় সংসদের সাংবিধানিক পরিবর্তনগুলো তুলে ধরা হয়েছে।

সংসদের কাঠামো

১.সংসদ প্রতিষ্ঠা

পৃথিবীর সকল দেশে আইনসভা সমূহের গঠন প্রকৃতি একরকম নয়। তবে সাধারণতঃ আইনসভা সমূহকে এক কক্ষ বিশিষ্ট ও দ্বি-কক্ষ বিশিষ্ট আইনসভা এ দু'ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। নিউজিল্যান্ড, ফিনল্যান্ড, চেকোশ্লোভাকিয়া, তুরস্ক, নেপালসহ আরও অনেক দেশের আইনসভা এক কক্ষ বিশিষ্ট। অপরদিকে গ্রেট ব্রিটেন, যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স, জাপান, কানাডা, ভারত, পাকিস্তানসহ অনেক দেশে দ্বি-কক্ষ বিশিষ্ট আইনসভা চালু রয়েছে। ১৯৭২ সালে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সংবিধানের অধীনে বাংলাদেশের জন্য "জাতীয় সংসদ" নামে একটি এক কক্ষ বিশিষ্ট আইনসভা প্রবর্তন করা হয়। যার সদর দফতর ঢাকায়। জাতীয় সংসদ ৩১৫ জন সদস্যদের সমন্বয়ে গঠিত হয়। এর মধ্যে ৩০০টি আসনের সদস্যগণ সাধারণ নির্বাচনী এলাকা থেকে জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হবেন। অন্যূন ১৮ বছর বয়স্ক বাংলাদেশের নাগরিকগণ ধর্ম, বর্ণ, পেশা, বংশ এবং নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সবাই সংসদ-সদস্যদের নির্বাচনে ভোট দান করতে পারতেন (অনুচ্ছেদ-১২২)। ১৯৭২ সালের মূল সংবিধানে ১০ বছরের জন্য অতিরিক্ত ১৫টি আসন কেবল মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত ছিলো। তাঁরা প্রত্যক্ষভাবে নির্বাচিত সংসদ-সদস্যগণ কর্তৃক নির্বাচিত হবেন। তবে মহিলাগণ অন্যান্য নির্বাচনী এলাকা থেকেও প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারবেন।[১] ১৯৭৯ সালে সংবিধানের পঞ্চম সংশোধনীর দ্বারা ৬৫ (৩) অনুচ্ছেদে মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত আসনের সংখ্যা পনের জন থেকে বৃদ্ধি করে ত্রিশ জন করা হয়। পুনরায় ১৯৯০ সালে সংবিধানের দশম সংশোধনী আইন দ্বারা উক্ত অনুচ্ছেদ সংশোধন করে মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত ত্রিশটি আসনের সময়সীমা দশ বছরের জন্য বৃদ্ধি করা হয়।

Dhaka University Institutional Repository

২.সংসদ-সদস্যপদের যোগ্যতা ও অযোগ্যতা

কোনো ব্যক্তি বাংলাদেশের নাগরিক হলে এবং তাঁর বয়স পচিঁশ বছর পূর্ণ হলে তিনি জাতীয় সংসদে নির্বাচিত হতে পারতেন। কিন্তু কেউ যদি উপযুক্ত আদালত কর্তৃক অপ্রকৃতিস্থ বলে ঘোষিত হতেন বা দেউলিয়া ঘোষিত হবার পর দায় থেকে অব্যাহতি না পেতেন, বা কোনো বিদেশী রাষ্ট্রের নাগরিকত্ব অর্জন কিংবা নৈতিক স্খলনজনিত ফৌজদারী অপরাধে দু'বছর কারাদন্ডে দন্ডিত হতেন ও মুক্তি লাভের পর পাঁচ বছরকাল অতিবাহিত না হয়ে থাকে, বা প্রজাতন্ত্রের কোনো লাভজনক পদে অধিষ্ঠিত থাকতেন, অথবা আইনের দ্বারা নির্বাচনের অযোগ্য ঘোষিত হতেন, তাহলে সংসদ-সদস্য নির্বাচিত হবার এবং সংসদ-সদস্য থাকবার যোগ্য হবেন না (অনুচ্ছেদ ঃ ৬৬)[২]।

৩.সংসদের মেয়াদ

জাতীয় সংসদ পাঁচ বছরের জন্য নির্বাচিত হবে। তবে অনুরূপ মেয়াদ উত্তীর্ণ হবার পূর্বে রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শক্রমে যে কোনো সময় সংসদ ভেঙ্গে দিতে পারেন। রাষ্ট্রপতি পূর্বে সংসদ ভেঙ্গে না দিলে প্রথম বৈঠকের তারিখ হতে পাঁচ বছর অতিবাহিত হলে সংসদ ভেঙ্গে যাবে। তবে বাংলাদেশ যুদ্ধে লিপ্ত থাকবার কালে সংসদ এর মেয়াদ আইন দ্বারা এক সময় অনধিক এক বছর বর্ধিত করতে পারত। কিন্তু যুদ্ধ সমাপ্ত হলে বর্ধিত মেয়াদ কোনোক্রমে ছয় মাসের বেশী হবে না। সংসদ ভেঙ্গে যাবার পর এবং পরবর্তী সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবার পূর্বে রাষ্ট্রপতি যদি মনে করেন যে, প্রজাতন্ত্রী যে যুদ্ধে লিপ্ত রয়েছে, সেই যুদ্ধাবস্থার জন্য সংসদ পুনরায় আহবান করা প্রয়োজন, তা হলে যে সংসদ ভেঙ্গে দেয়া হয়েছিলো, রাষ্টপতি তা আহবান করবেন।[৩] ১৯৭৫ সালের জানুয়ারী মাসে রাষ্ট্রপতি ব্যবস্থা প্রবর্তনের পর সংবিধানের ৭২ অনুচ্ছেদ সংশোধন করায় প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ ছাড়াই রাষ্ট্রপতি সংসদ ভেঙ্গে দিতে পারতেন।

৪. স্পীকার ও ডেপুটি স্পীকার

প্রতিটি নতুন সংসদের প্রথম অধিবেশনে স্পীকার ও ডেপুটি স্পীকার নির্বাচিত হন। কিছু আইন পরিষদে অন্য পদবির ব্যক্তিরাও সভাপতিত্ব করেন। ব্রিটিশ লর্ড সভায় সভাপতিত্ব করেন লর্ড চ্যান্সেলর (Loard Chancellor)। মার্কিন সিনেটে পদাধিকার বলে সভাপতিত্ব করেন সে দেশের ভাইস প্রেসিডেন্ট।[৪] জাতীয় সংসদের সভাপতিকে স্পীকার বলে। প্রত্যেক সাধারণ নির্বাচনের পর সংসদের প্রথম বৈঠকে সদস্যগণ তাঁদের মধ্য হতে একজন স্পীকার ও একজন ডেপুটি স্পীকার নির্বাচিত করেন। সংসদের মোট সদস্যের সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে গৃহীত প্রস্তাবের দ্বারা স্পীকার ও ডেপুটি স্পীকারকে অপসারণ করা যায়। স্পীকার বা ডেপুটি স্পীকারের পদ শূন্য হবে, যদি তিনি (ক) সংসদ-সদস্য না থাকেন; (খ) মন্ত্রী পদ গ্রহণ করেন; কিংবা (গ) রাষ্ট্রপতির নিকট স্বাক্ষরযুক্ত

Dhaka University Institutional Repository

পত্রযোগে পদত্যাগ করেন; (ঘ) কোনো সাধারণ নির্বাচনের পর অন্য কোনো সদস্য তাঁর কার্যভার গ্রহণ করেন; অথবা (ঙ) ডেপুটি স্পীকারের ক্ষেত্রে, তিনি স্পীকারের পদে যোগদান করেন। স্পীকার বা ডেপুটি স্পীকারের পদ শূন্য হলে সাত দিনের মধ্যে কিংবা ঐ সময়ে সংসদ বৈঠকরত না থাকলে পরবর্তী প্রথম বৈঠকে তা পূর্ণ করবার জন্য সংসদ-সদস্যদের মধ্য হতে একজনকে নির্বাচিত করবেন।[৫]

স্পীকারের পদ শূন্য হলে বা তিনি রাষ্ট্রপতির দায়িত্বপালনে রত থাকলে, কিংবা অন্য কোনো কারণে তিনি স্বীয় দায়িত্বপালনে অসমর্থ হলে স্পীকারের সকল দায়িত্ব ডেপুটি স্পীকার পালন করবেন; কিংবা ডেপুটি স্পীকারের পদ শূন্য হলে; কিংবা উভয়ই সংসদের কোনো বৈঠকে অনুপস্থিত থাকলে সংসদের কার্য-প্রণালী বিধি অনুযায়ী কোনো সংসদ-সদস্য স্পীকারের দায়িত্ব পালন করবেন।[৬]

মূল সংবিধানে বিধান ছিলো যে, রাষ্ট্রপতির পদ শূন্য হলে কিংবা অনুপস্থিতি, অসুস্থতা বা অন্য কোনো কারণে তিনি দায়িত্ব পালনে অসমর্থ হলে ক্ষেত্রমত রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত না হওয়া পর্যন্ত কিংবা তিনি পনরায় স্বীয় দায়িত্বভার গ্রহণ না করা পর্যন্ত স্পীকার রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব পালন করবেন।[৭] ১৯৭৫ সালের ২৫ জানুয়ারী চতুর্থ সংশোধনীর দ্বারা একটি উপ-রাষ্ট্রপতির পদ সৃষ্টি করা হয়। এতে বিধান করা হয় যে, রাষ্ট্রপতি উপর্যুক্ত কারণে দায়িত্ব পালনে অসমর্থ হলে উপ-রাষ্ট্রপতি দায়িত্ব পালন করবেন, এবং উভয়েই দায়িত্ব পালনে অসমর্থ হলে রাষ্ট্রপতি বা উপ-রাষ্ট্রপতি স্বীয় কার্যভার গ্রহণ না করা পর্যন্ত স্পীকার রাষ্ট্রপতি রূপে কাজ করবেন।

পার্লামেন্ট পরিচালনায় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা স্পীকারের। আধুনিক ব্যবস্থায় স্পীকার একটা দল থেকে নির্বাচিত হন বটে, তবে নির্বাচিত হয়ে যাওয়ার পর স্পীকারকে নিরপেক্ষ হতে হয়। তাঁর নিরপেক্ষতা পার্লামেন্টের রক্ষাকবজ। পার্লামেন্টে স্পীকারের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব হলো সংখ্যালঘিষ্ঠ দলের সদস্যদের অধিকার সংরক্ষণ করা এবং পার্লামেন্ট বিধি অনুযায়ী পরিচালিত হচ্ছে কিনা তা নিশ্চিত করা। তাঁর সিদ্ধান্ত ও রুলিং অবশ্য পালনীয়। হাউসে শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য স্পীকার প্রয়োজনে সদস্যদের বহিষ্কার করতে পারেন। পার্লামেন্ট পরিচালনায় তাঁর ক্ষমতা একচ্ছত্র বলে এ পদাধিকারীর পক্ষপাতহীন ও দূরদৃষ্টি সম্পন্ন আচরণ ও গুণাবলীর ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়।[৮] ইংল্যান্ডে স্পীকারকে সাধারণতঃ সরকারী দল ও বিরোধী দলের পারস্পরিক বোঝাপরার ভিত্তিতে নির্বাচন করা হয়। দলীয় ভিত্তিতে নির্বাচিত হলেও স্পীকার ব্যক্তিগত ইচ্ছার উর্ধ্বে থেকে দলমত নির্বিশেষে সবদলের নিকট গ্রহণযোগ্য ব্যক্তি হিসেবে কার্য সম্পাদন করেন।[৯] অপরদিকে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রতিনিধি সভার স্পীকার নির্বাচিত হবার পরও দল নিরপেক্ষ থাকেন না। তিনি তাঁর দলের

Dhaka University Institutional Repository

প্রধান মুখপাত্র হিসেবে কাজ করেন। এমনকি প্রতিনিধি সভার ভিতরেও স্পীকার গোপনে তাঁর দলের নেতাদের পরামর্শ দিয়ে থাকেন।[১০] বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের স্পীকারও নির্বাচিত হবার পর নিরপেক্ষ ভূমিকা পালনের লক্ষ্যে দল থেকে পদত্যাগ করেন না।

বাংলাদেশে এখনও স্পীকারদের ভূমিকা বিতর্কহীন ঔজ্জ্বল্যে ভাস্বর হয়ে উঠেনি। তবে স্পীকার যাতে স্বাধীন ও নিরপেক্ষভাবে তাঁর কর্তব্য পালন করতে পারেন তজ্জন্য বাংলাদেশের সংবিধানে কতিপয় ব্যবস্থা রয়েছে। এগুলো হলো ঃ (অ) স্পীকার সংসদে সাধারণতঃ ভোটদান করবেন না। যখন কোনো বিষয়ে স্বপক্ষে ও বিপক্ষে সমান সংখ্যক ভোট প্রদত্ত হয়, তখনই কেবল তিনি তাঁর নির্ণায়ক ভোট প্রদান করবেন।[১১] (আ) সংসদের কার্যপরিচালনা, শৃঙ্খলা রক্ষা বা তাঁর অন্যান্য ক্ষমতা প্রয়োগের ব্যাপারে স্পীকার কোনো আদালতের এখতিয়ারের অধীন হবে না।[১২] (ই) স্পীকার ও ডেপুটি স্পীকারকে দেয় পারিশ্রমিক সংযুক্ত তহবিলের ওপর দায়যুক্ত ব্যয়রূপে গণ্য হবে।[১৩] তবে বাস্তব ক্ষেত্রে স্পীকারের স্বাধীনতা ও নিরপেক্ষতা নির্ভর করবে দেশের রাজনৈতিক পরিমণ্ডল, অভ্যাস ও ঐতিহ্য সৃষ্টির ওপরে।

৫.কমিটি

বর্তমান যুগে রাষ্ট্রের কার্যাবলী একদিকে যেমন ব্যাপক বেড়ে গেছে তেমনি জটিল আকার ধারণ করেছে। ফলে বহু সদস্যবিশিষ্ট আইনসভাগুলোর পক্ষে বিভিন্ন বিষয়ের বিস্তৃত বিচার-বিবেচনা করে সঠিক সিদ্ধান্ত দেয়া সম্ভবপর হচ্ছে না। সুতরাং সীমিত সময়ের মধ্যে দক্ষতার সাথে আইনসভার কাজ সম্পাদনের জন্য প্রায় সকল দেশেই কমিটি ব্যবস্থা রয়েছে। আইনসভা কর্তৃক নিযুক্ত সকল দলের অভিজ্ঞ ও দক্ষ কিছু সংখ্যক সদস্য নিয়ে গঠিত যে সকল ছোট ছোট সংস্থার ওপর আইন ও অন্যান্য বিষয় সম্পর্কিত প্রস্তাবের বিস্তৃত বিচার-বিবেচনার দায়িত্ব অর্পণ করা হয়, সেগুলোকে আইনসভার কমিটিতে বিভিন্ন প্রশ্নের খুঁটিনাটি বিবেচনার পর কমিটি এর মন্তব্য ও সুপারিশ রিপোর্ট আকারে আইনসভায় পেশ করে। এ রিপোর্টের ভিত্তিতে আইনসভা সহজে ও অল্প সময়ে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে। শুধু তাই নয়, এর মাধ্যমে আইনসভা শাসন বিভাগের কার্যাবলীও নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।

বৃটেন, ভারত, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি দেশের ন্যায় বাংলাদেশেও কমিটি ব্যবস্থা রয়েছে। সংবিধানের ৭৬ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে যে, সংসদ 'সরকারী হিসাব কমিটি' ও 'বিশেষ অধিকার কমিটি' এবং সংসদের কার্যপ্রণালী-বিধিতে নির্দিষ্ট অন্যান্য কমিটি নিয়োগ করবে। কমিটিগুলোকে মোটামুটি দু'শ্রেণীতে ভাগ করা যায়-অস্থায়ী কমিটিও স্থায়ী কমিটি। অস্থায়ী কমিটি কোনো নির্দিষ্ট বিল পরীক্ষা বা অন্য কোনো বিশেষ কাজের জন্য গঠিত হয় এবং সেই বিশেষ কাজ শেষ হলে ভেঙ্গে

Dhaka University Institutional Repository

যায়। 'বিল সম্পর্কিত বাছাই কমিটি' এরূপ একটি অস্থায়ী কমিটি। স্থায়ী কমিটি একটি মাত্র বিশেষ উদ্দেশ্যে গঠিত হয় না; এর উদ্দেশ্য ও কাজ স্থায়ী প্রকৃতির। এ শ্রেণীর কমিটির সদস্যগণ সাধারণতঃ নির্দিষ্ট সময়ের জন্য নিযুক্ত হন এবং এক একটি কমিটির ওপর এক এক প্রকার কাজের দায়িত্ব দেয়া হয়। যেমন, 'সরকারী হিসাব সম্পর্কিত কমিটি', 'বিশেষ অধিকার সম্পর্কিত কমিটি', 'কার্যপ্রণালী বিধি সম্পর্কিত কমিটি ' ইত্যাদি।

১৯৭৩ সালে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক প্রণীত কার্যপ্রণালী-বিধিতে ৯টি কমিটি গঠনের বিধান ছিলো, যেমন- কার্যউপদেষ্টা কমিটি, বেসরকারী সদস্যদের বিল এবং বেসরকারী সদস্যদের সিদ্ধান্ত প্রস্তাব সম্পর্কিত কমিটি, বিল সম্পর্কিত বাছাই কমিটি, সরকারী হিসাব সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি, অনুমিত হিসাব সম্পর্কিত কমিটি, বিশেষ অধিকার সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি, সরকারী প্রতিশ্রুতি সম্পর্কিত কমিটি, কার্যপ্রণালী-বিধি সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি ও বিশেষ কমিটি। ১৯৭৪ সালের ২২ জুলাই তারিখে প্রথম কার্যপ্রণালী-বিধি প্রণয়ন কালে উক্ত কমিটিগুলো ছাড়া আরও পাঁচটি কমিটি গঠনের ব্যবস্থা করা হয়। এগুলো হচ্ছেঃ পিটিশন কমিটি, সরকারী প্রতিষ্ঠান কমিটি, কতিপয় অন্যান্য বিষয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি, সংসদ কমিটি ও লাইব্রেরী কমিটি। এর ফলে প্রথম পার্লামেন্টে মোট কমিটি সংখ্যা ছিলো চৌদ্দটি। দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম পার্লামেন্টে অনুরূপ কমিটি ব্যবস্থা বিদ্যমান থাকে।[১৪] কমিটিগুলোর সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হলো।

ক.কার্য উপদেষ্টা কমিটি (Business Advisory Committee) ঃ স্পীকারসহ অনধিক পনের জন সদস্য নিয়ে কার্য উপদেষ্টা কমিটি গঠিত হবে। ১৪-০৭-৮৭ তারিখের পূর্বে সদস্য সংখ্যা দশ জন ছিলো। স্পীকার কমিটির সদস্যদেরকে মনোনীত করেন এবং তিনি নিজেই এর সভাপতি। এর প্রধান কাজ হলো সরকারী বিল বা অন্যান্য সরকারী কার্যের পর্যালোচনার বিভিন্ন পর্যায়ের জন্য সংসদ কত সময় ব্যয় করা যাবে সেই সম্পর্কে পরামর্শ দান করা।[১৫]

খ.বেসরকারী সদস্যদের বিল এবং সিদ্ধান্ত-প্রস্তাব সম্পর্কিত কমিটি (Committee on Private Member Bills and Resolutions ঃ সংসদ কর্তৃক নিযুক্ত অনধিক দশ জন সদস্য নিয়ে এই কমিটি গঠিত হয়। বেসরকারী সদস্য কর্তৃক উত্থাপিত সকল বিল সংসদে আলোচিত হওয়ার পূর্বেই কমিটি এর পরীক্ষা করে এবং এর প্রকৃতি, আশু প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব অনুসারে বিলগুলোকে "ক" ও "খ" দু'শ্রেণীতে বিভক্ত করে। বিলগুলো আলোচনার বিভিন্ন পর্যায়ে কতটা সময় দেয়া হবে এবং বেসরকারী সিদ্ধান্ত-প্রস্তাব আলোচনার জন্য সময়সীমা কি হবে সে সম্পর্কে কমিটি সুপারিশ করে।[১৬]

Dhaka University Institutional Repository

গ.বিল সম্পর্কিত বাছাই কমিটি (Select Committee on Bills) ঃ যখন কোনো বিল সম্পর্কে ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী বা সদস্য নিয়োগ করা হবে। ভারপ্রাপ্ত সদস্য অবশ্যই একমিটির অন্তর্ভুক্ত থাকবেন। কমিটির সদস্য সংখ্যা নির্দিষ্ট নয়। বিভিন্ন বিল বিবেচনার জন্য বিভিন্ন বাছাই কমিটি নিয়োগ করা হয়। কমিটি সংশ্লিষ্ট বিলের বিচার-বিবেচনা করে এর উন্নয়ন সাধনের জন্য সুপারিশ করে। বাছাই কমিটি বিলের বিভিন্ন ধারায় সংশোধনের জন্যও প্রস্তাব করতে পারে। সংসদ কোনো বাছাই কমিটি কর্তৃক রিপোর্ট প্রদানের সময়সীমা নির্দিষ্ট করে না দিলে, বিলটি কমিটিতে প্রেরণ করার তিন মাসের মধ্যে একে সংসদে রিপোর্ট পেশ করতে হয়।[১৭]

ঘ.আবেদন সংক্রান্ত কমিটি (Committee on Petitions) ঃ স্পীকার অন্যূন দশ জন সদস্যের সমন্বয়ে আবেদন সংক্রান্ত কমিটি গঠন করেন।[১৮] কোনো মন্ত্রী এ কমিটির সদস্য হবেন না। কমিটিতে প্রেরিত প্রত্যেকটি আবেদন কমিটি পরীক্ষা করে প্রচারের নির্দেশ দেন। অবশ্য স্পীকার যে কোনো সময়ে আবেদনটি প্রচার করার নির্দেশ দিতে পারেন। কমিটিতে প্রেরিত আবেদনে লিপিবদ্ধ নির্দিষ্ট অভিযোগ সম্পর্কে সংসদের নিকট রিপোর্ট পেশ করা এবং প্রতিকারমূলক বাস্তব ব্যবস্থা সম্পর্কে পরামর্শ দান করাও একমিটির কাজ।[১৯]

ঙ. সরকারী হিসাব সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি (Standing Committe on Public Accounts)ঃ সংসদ কর্তৃক অনধিক পনের জন সদস্য নিয়ে এ কমিটি গঠিত হবে। কোনো মন্ত্রীকে এ কমিটির সদস্য নিযুক্ত করা হবে না। এ কমিটির কাজ হলো সরকারের বিভিন্ন হিসাব পরীক্ষা করা। সরকারী হিসাব পরীক্ষা করবার সময় এ কমিটি মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের রিপোর্ট পরীক্ষা করেন। কমিটিকে দেখতে হয়, সরকার যে অর্থ ব্যয় করেছেন তা সংসদের আইন অনুসারে প্রদত্ত কিনা এবং সংসদ যে উদ্দেশ্যে অর্থ মঞ্জুর করেন সেই নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে তা ব্যয় হয়েছে কিনা। যে ক্ষেত্রে সরকার সংসদ কর্তৃক অনুমোদিত অর্থ অপেক্ষা অধিক অর্থ ব্যয় করেন সে ক্ষেত্রে কমিটি এর কারণও যৌক্তিকতা বিচার করেন এবং নিজের সুপারিশ প্রদান করেন। আইন অনুসারে মহা হিসাব নিরীক্ষক যে সকল কর্পোরেশন, বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান বা স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের হিসাব নিরীক্ষা করেন, সেগুলোর হিসাব পরীক্ষা করাও এর কর্তব্য।[২০]

চ.অনুমিত হিসাব সম্পর্কিত কমিটি (Committee on Estimates) ঃ এই কমিটিতে অনধিক দশজন সদস্য থাকবেন, এবং সংসদ-সদস্যদের মধ্য হতে তাঁদেরকে নিয়োগ করবে। কোনো মন্ত্রী এর সদস্য হতে পারবেন না। এ কমিটির কাজ হচ্ছেঃ (১) কমিটি অনুমিত হিসাবসমূহ পরীক্ষা করে এবং কিভাবে মিতব্যয়িতা, সাংগঠনিক উন্নয়ন, দক্ষতা ও প্রশাসনিক সংস্কার সাধন করা যায় সে সম্পর্কে রিপোর্ট প্রদান করে; (২) প্রশাসনিক ক্ষেত্রে দক্ষতা ও মিতব্যয়িতা অর্জন কল্পে বিকল্প নীতির

Dhaka University Institutional Repository

সুপারিশ করে; (৩) অনুমিত হিসাব নিহিত নীতি অনুসারে বিভিন্ন খাতের মধ্যে সুষ্ঠুভাবে অর্থ বন্টন করা হয়েছে কিনা তা পরীক্ষা করে; (৪) অনুমিত হিসাব সংসদে কি আকারে পেশ করতে হবে সে সম্পর্কে পরামর্শ দেয়।[২১]

ছ.সরকারী প্রতিষ্ঠান কমিটি (Committee on Public Undertakings) ঃ সংসদ কর্তৃক নিযুক্ত অনধিক দশজন সদস্য নিয়ে এ কমিটি গঠিত হবে। কোনো মন্ত্রী এর সদস্য হতে পারবেন না। এ কমিটির কাজ হলোঃ (১) সরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের রিপোর্ট ও হিসাব পরীক্ষা করা; (২) সরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ সম্পর্কে মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের কোনো রিপোর্ট থাকলে তা পরীক্ষা করা;(৩) সরকারী প্রতিষ্ঠানগুলো সুষ্ঠু ও বাণিজ্যিক নীতি ও নিয়মকানুন অনুযায়ী পরিচালিত হচ্ছে কিনা; তৎসম্পর্কিত ত্রুটি-বিচ্যুতি পরীক্ষা করা;[২২] (৪) সরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের ব্যাপারে সরকারী হিসাব কমিটি এবং অনুমিত হিসাব কমিটিতে ন্যস্ত যেসব কাজ স্পীকার কমিটিতে প্রেরণ করবেন তা করা।[২৩]

জ.বিশেষ অধিকার সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি (Standing Committee on Privileges)ঃ সংসদের প্রথম অধিবেশনেই[২৪] সংসদ অনধিক দশজন সদস্যের সমন্বয়ে এ কমিটি নিয়োগ করবেন। এ কমিটি সংসদ এবং এর সদস্য বা কোনো কমিটির বিশেষ অধিকার ভঙ্গের প্রশ্ন কমিটির নিকট পেশ করতে পারে। কমিটি এ সব প্রশ্ন পরীক্ষা করে, প্রয়োজনমত অনুসন্ধান চালায়, কোনো অধিকার ভঙ্গ হয়েছে কিনা তা নির্ধারণ করে এবং সেই সম্পর্কে সংসদে রিপোর্ট পেশ করে।[২৫]

ঝ.সরকারী প্রতিশ্রুতি কমিটি (Committe on Government Assurance) ঃ এই কমিটি সংসদ কর্তৃক নিযুক্ত অনধিক আট জন সদস্য নিয়ে গঠিত হয়। মন্ত্রীরা জাতীয় সংসদে যে সব প্রতিশ্রুতি দেন তা এ কমিটি পরীক্ষা করে দেখে কতদূর এসব প্রতিশ্রুতি কার্যকর করা হয়েছে এবং সময়মত কার্যকর করা হয়েছে কিনা সে সম্পর্কে সংসদের নিকট রিপোর্ট প্রদান করে।[২৬]

ঞ.মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত সংসদীয় কমিটি (Parliamentary Committee on Ministries)ঃ প্রত্যেক নতুন সংসদ উদ্বোধনের পর যথাশীঘ্র সংসদ প্রত্যেক মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি নিয়োগ করবে। সংসদ কর্তৃক এ সকল কমিটিতে সভাপতিসহ অনধিক দশজন সদস্য নিযুক্ত হবেন। কোনো মন্ত্রী এর সভাপতি হবেন না। কমিটির কাজ হলোঃ (১) খসড়া বিলসমূহ ও অন্যান্য আইনগত প্রস্তাব পরীক্ষা করা; (২) আইনের বলবৎকরণ পর্যালোচনা করা ও অনুরূপ বলবৎ-সম্বন্ধে ব্যবস্থাবলীর প্রস্তাব করা; (৩) সংসদ জন-গুরুত্বসম্পন্ন কোনো বিষয় সম্পর্কে কমিটিকে অবহিত করলে সেই বিষয়ে কোনো মন্ত্রণালয়ের কাজ বা প্রশাসন সম্বন্ধে অনুসন্ধান বা তদন্ত করা;

Dhaka University Institutional Repository

এবং (৪) সংসদ কর্তৃক অর্পিত অন্য যে কোনো দায়িত্ব পালন করা।[২৭] উল্লেখ্য প্রথম পার্লামেন্টের কার্যপ্রণালী-বিধি অনুযায়ী এগারটি মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত সংসদীয় কমিটির ব্যবস্থা ছিলো। কিন্তু মন্ত্রণালয়ের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় দ্বিতীয় পার্লামেন্টের আমলে এ সংখ্যা বৃদ্ধি করে ৩৬টি করা হয়। তৃতীয় ও চতুর্থ পার্লামেন্টেও ছত্রিশটি ছিলো। কিন্তু পঞ্চম পার্লামেন্টে মন্ত্রণালয়ের সংখ্যা বৃদ্ধি করে ৩৭টি করা হয়।

ট.সংসদ কমিটি (Committee on Parliament) ঃ স্পীকার কর্তৃক মনোনীত সভাপতিসহ বারো জন সদস্যের সমন্বয়ে এ কমিটি গঠিত হবে। এ কমিটির কাজ হবে সংসদ-সদস্যদের আবাসিক, খাদ্য, চিকিৎসা ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধার ওপর তত্ত্বাবধান করা। একটি আবাসিক সাব-কমিটিও থাকবে।[২৮]

ঠ.লাইব্রেরী কমিটি (Library Committee) ঃ স্পীকার কর্তৃক সংসদ হতে মনোনীত নয়জন সদস্য এবং ডেপুটি স্পীকারের সমন্বয়ে একটি লাইব্রেরী কমিটি গঠিত হবে। ডেপুটি স্পীকার এ কমিটির সভাপতি হবেন। কমিটির কাজ হবেঃ (১) লাইব্রেরী সংক্রান্ত যেসব বিষয় স্পীকার কমিটির নিকট প্রেরণ করবেন, তা বিবেচনা করে পরামর্শ দান করা, (২) লাইব্রেরীর উন্নতি বিধানের জন্য পরামর্শদান করা; এবং (৩) লাইব্রেরী কর্তৃক প্রদত্ত সুযোগ-সুবিধার পূর্ণ সদ্ব্যবহারের ব্যাপারে সদস্যগণকে সাহায্য করা।[২৯]

ড.কার্যপ্রণালী-বিধি সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি (Standing Committe on procedure) ঃ এই কমিটি সংসদ কর্তৃক নির্বাচিত হয়। এর সদস্য সংখ্যা সর্বমোট বার জন। স্পীকার পদাধিকার বলে এ কমিটির সভাপতি। কমিটি সংসদের কাজের পদ্ধতি ও পরিচালন সম্পর্কিত বিষয় পর্যালোচনা করে এবং এর উন্নতির জন্য কোনো বিধির সংশোধন বা সংযোজনের সুপারিশ করতে পারেন।[৩০]

ঢ.বিশেষ কমিটি (Special Committee) ঃ সংসদ কোনো প্রস্তাব দ্বারা যে কোনো সময় একটি বিশেষ কমিটি নিয়োগ করতে পারে। অনুরূপ কমিটি নিয়োগের সময় সংসদ এর গঠন ও কর্তব্য নির্ধারণ করে দিবে।[৩১]

উপর্যুক্ত প্রত্যেক কমিটির একজন সভাপতি থাকেন। কার্যপ্রণালী-বিধি কমিটি ও কার্যউপদেষ্টা কমিটির সভাপতি হন স্পীকার। অন্যান্য কমিটির সভাপতি সংসদ মনোনয়ন করেন, নতুবা কমিটির সদস্যগণ নিজেদের মধ্য হতে একজনকে সভাপতি নির্বাচিত করেন। প্রত্যেক কমিটিতে সাধারণতঃ বিরোধী দলের সদস্য অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

Dhaka University Institutional Repository

কমিটিগুলোর বৈঠকে কোরামের জন্য অন্যূন এক-তৃতীয়াংশ সদস্যের উপস্থিতি প্রয়োজন। উপস্থিত ভোটদানকারী সদস্যদের সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।[৩২] কোনো কমিটি প্রয়োজনবোধে এক বা একাধিক উপকমিটি গঠন করতে পারে। সংসদের বৈঠক চলাকালেও কমিটির বৈঠক বসতে পারে। কমিটির পক্ষ হতে কমিটির সভাপতি সংসদে উহার রিপোর্ট পেশ করেন।

মার্কিনযুক্তরাষ্ট্র, বৃটেন ও ভারতের সাথে বাংলাদেশের কমিটি ব্যবস্থার তুলনা করে দেখা যাচ্ছে যে, কমিটিগুলো মোটামুটি বৃটেন ও ভারতের ব্যবস্থার মত। কিন্তু মার্কিন কংগ্রেসের কমিটিগুলোর ন্যায় পূর্ণ ক্ষমতা ভোগ করে না। কেননা মার্কিন কমিটিগুলোর ন্যায় এখানে কমিটিগুলো বিলের উদ্দেশ্য বা নীতির পরিবর্তন করতে বা তা ফেলে রাখতেও পারে না।[৩৩] ব্রিটেনে কমিটি ব্যবস্থা তেমন ব্যাপকতা লাভ করেনি। এখানে পার্লামেন্ট পূর্ণাঙ্গ বৈঠকে আইন প্রণয়ন করে।[৩৪] ভারতের কমিটিগুলোও তেমন ক্ষমতা ভোগ করে না। এছাড়া ভারতের কমিটিগুলো বিলের মৌল বিষয় পরিবর্তন করতে পারে না।[৩৫] বাংলাদেশে কমিটিগুলোর প্রধান কর্তব্য হলো খসড়া বিল ও অন্যান্য আইনগত প্রস্তাব পরীক্ষা করা ও বিভিন্ন বিলের উন্নয়ন সাধনের জন্য সুপারিশ করা। ইহা বিলের উদ্দেশ্য বা নীতির কোনো পরিবর্তন করতে পারে না।

সংসদের কার্যপ্রণালী (Parliamentary Procedure)

গণতান্ত্রিক দেশের আইনসভাগুলো স্বাধীনভাবে দায়িত্ব পালনের লক্ষ্যে সংবিধানের সাথে সামঞ্জস্য রেখে স্বীয় রচিত বিধি অনুযায়ী তাদের কাজ পরিচালনা করে। বাংলাদেশে ১৯৭২ সালের সংবিধানে বিধান করা হয় যে, জাতীয় সংসদ তার নিজস্ব কার্যপ্রণালী-বিধি প্রণয়ন করবে এবং অনুরূপ বিধি প্রণীত না হওয়া পর্যন্ত রাষ্ট্রপতি কর্তৃক প্রণীত বিধি দ্বারা সংসদের কার্যপ্রণালী নিয়ন্ত্রিত হবে।[৩৬] এই বিধান মতে বাংলাদেশের প্রথম কার্যপ্রণালী-বিধি রাষ্ট্রপতি ১৯৭৩ সালের ১ এপ্রিল জারি করেন। ইহা ব্রিটিশ ঐতিহ্য এবং দীর্ঘদিন থেকে পার্লামেন্টারি ব্যবস্থার যে অভিজ্ঞতা তার ভিত্তিতে প্রণীত (দেখুন Bengal Legislative Council)। ১৯৯৫ সাল পর্যন্ত জাতীয় সংসদ কর্তৃক কার্যপ্রণালী-বিধিটির কিছু কিছু পরিবর্তন হয়েছে। নিম্নে সংসদের কার্যপ্রণালী আলোচনা করার সাথে বিভিন্ন সময়ে উহার পরিবর্তিত বিধান তুলে ধরা হলো।

১.সংসদের অধিবেশন

রাষ্ট্রপতি সংসদের অধিবেশন আহবান, স্থগিত ও ভঙ্গ করার ক্ষমতা রাখেন। এক অধিবেশনের সমাপ্তি ও পরবর্তী অধিবেশনের প্রথম বৈঠকের মধ্যে ষাট দিনের অতিরিক্ত বিরতি থাকবে না। যে কোনো সাধারণ নির্বাচনের ফলাফল ঘোষিত হবার ত্রিশ দিনের মধ্যে সংসদের অধিবেশন আহবান করতে হবে।[৩৭] কিন্তু ১৯৭৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসে গৃহীত সংবিধানের দ্বিতীয়

Dhaka University Institutional Repository

সংশোধনীর দ্বারা এই বিরতির ব্যবধান ষাট দিন থেকে বাড়িয়ে একশত বিশদিন করা হয়। ১৯৭৫ সালের জানুয়ারি মাসে গৃহীত সংবিধানের চতুর্থ সংশোধনীর মাধ্যমে এ ব্যবধান আরো বৃদ্ধি করে বিধান করা হয় যে, প্রতিবছর জাতীয় সংসদের অন্ততঃ দুটি অধিবেশন বসবে। দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ পার্লামেন্টে অনুরূপ অবস্থাই বহাল থাকে। ১৯৯১ সালের সেপ্টেম্বরে দ্বাদশ সংশোধনীর মাধ্যমে উক্ত ব্যবস্থায় মূল সাংবিধানিক বিধি প্রবর্তিত হয়। অর্থাৎ এক অধিবেশন সমাপ্তি ও পরবর্তী অধিবেশন শুরুর মধ্যে সময়কাল ষাট দিনের বেশী হবে না। পঞ্চম পার্লামেন্টেও এই বিধিই কার্যকর থাকে।

২.সংসদে সিদ্ধান্ত গ্রহণ পদ্ধতি

সংসদে সিদ্ধান্ত গৃহীত হবে উপস্থিত ও ভোটদানকারী সদস্যদের সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে তবে সমসংখ্যক ভোটের ক্ষেত্র ব্যতীত সভাপতি ভোটদান করবেন না এবং অনুরূপ ক্ষেত্রে তিনি নির্ণয়ক ভোট প্রদান করবেন (অনুচ্ছেদ ঃ ৭৫ (১) (খ))।

৩.সংসদের কার্যধারার বৈধতা যাচাই

সংসদের কোনো সদস্যপদ শূন্য রয়েছে, কেবল এ কারণে বা সংসদে উপস্থিত হবার বা ভোটদানের বা অন্য কোনো উপায়ে কার্যধারায় অংশগ্রহণের অধিকার না থাকা সত্ত্বেও কোনো ব্যক্তি অনুরূপ কাজ করেছেন, কেবল এ কারণে সংসদের কোনো কার্যধারা অবৈধ হবে না (অনুচ্ছেদ ঃ ৭৫ (১) (গ))। শপথ গ্রহণের পূর্বে কোনো সদস্য সংসদে আসন গ্রহণ বা ভোট দান করলে অনুরূপ কাজের জন্য তিনি প্রতিদিন একহাজার টাকা করে অর্থদন্ডে দন্ডিত হবেন (অনুচ্ছেদ ঃ ৬৯)।

৪.কোরাম

সংসদে কার্য পরিচালনার জন্য অন্যূন ষাট জন সদস্যের উপস্থিতি প্রয়োজন। বৈঠক চলাকালে ষাট জনের কম সদস্য উপস্থিত আছেন বলে সভাপতির দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে, তিনি অন্যূন ষাট জন সদস্য উপস্থিত না হওয়া পর্যন্ত বৈঠক স্থগিত রাখবেন কিংবা মুলতবী করবেন।[৩৮]

৫.সংসদ ও সদস্যদের বিশেষ অধিকার ও দায়মুক্তি

সংসদের কার্যধারার বৈধতা সম্পর্কে কোনো আদালতে প্রশ্ন উত্থাপন করা যাবে না। সংসদের যে সদস্য বা কর্মচারীদের ওপর সংসদের কার্যপ্রণালী নিয়ন্ত্রণ, কার্য-পরিচালনা বা শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব ন্যস্ত থাকবে, তিনি তাঁর ক্ষমতা প্রয়োগের ব্যাপারে কোনো আদালতের এখতিয়ারাধীন হবেন না। সংসদ বা সংসদের কোনো কমিটিতে কিছু বলা বা ভোটদানের জন্য কোনো সদস্যের বিরুদ্ধে কোনো আদালতে মামলা করা যাবে না। সংসদ কর্তৃক বা এর কর্তৃত্বে কোনো রিপোর্ট, কাগজপত্র, ভোট বা কার্যধারা প্রকাশের জন্য কোনো ব্যক্তির বিরুদ্ধে আদালতে কোনো কার্যধারা গ্রহণ করা যাবে না।[৩৯]

Dhaka University Institutional Repository

৬.কার্যাবলী-বিন্যাস

সংসদের কার্যাবলীকে সরকারী সদস্যদের কার্যাবলী এবং বেসরকারী সদস্যদের কার্যাবলী এ দু'শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। কোনো মন্ত্রী কর্তৃক উত্থাপিত বিল, বাজেট, সিদ্ধান্ত-প্রস্তাব, সংশোধনী ও অন্যান্য প্রস্তাব সরকারী কার্যাবলী বলে গণ্য হবে। অপরপক্ষে, বেসরকারী সদস্যগণ কর্তৃক প্রস্তাবিত বিল, সিদ্ধান্ত-প্রস্তাব, সংশোধনী ও অন্যান্য প্রস্তাব বেসরকারী সদস্যদের কার্যাবলী বলে গণ্য হবে। প্রতি বৃহস্পতিবারে বেসরকারী সদস্যদের কার্যাবলী প্রাধান্য পাবে এবং অন্যান্য দিনে কেবলমাত্র সরকারী কাজ করা হবে।[৪০]

৭.আইন প্রণয়ন পদ্ধতি (Legislative Procedure)

বাংলাদেশে আইন প্রণয়নের ক্ষমতা জাতীয় সংসদের ওপর ন্যস্ত। আইনের খসড়া বা প্রস্তাবকে "বিল" বলে। বিল দু'প্রকারের হতে পারে, যেমনঃ বেসরকারী বিল (Private Members Bill) এবং সরকারী বিল (Government Bill)। যে সকল বিল সংসদের সাধারণ সদস্য কর্তৃক উত্থাপিত হয় সেগুলোকে বেসরকারী বিল বলে; এবং যে সমস্ত বিল মন্ত্রীগণ উত্থাপন করেন সেগুলোকে সরকারী বিল বলে।

প্রথম ভাগ ঃ বিল উত্থাপন- কোনো বেসরকারী সাধারণ সদস্য বিল উত্থাপন করতে চাইলে তিনি সংসদ সচিবের নিকট পনের দিনের লিখিত নোটিশ প্রদান এবং সঙ্গে বিলের তিনটি প্রতিলিপি পেশ করবেন। কিন্তু মন্ত্রীদের বেলায় মাত্র সাত দিনের নোটিশ ও দু'টি প্রতিলিপির প্রয়োজন হয়। বিভিন্ন মন্ত্রণালয় বা দপ্তর প্রয়োজন অনুসারে আইন পাসের প্রস্তাব মন্ত্রীসভার নিকট পেশ করে এবং মন্ত্রীসভা অনুমোদন করলে আইন ও সংসদ বিষয়ক দপ্তর প্রস্তাবিত আইনের খসড়া রচনা করে। পরে ভারপ্রাপ্ত সদস্য নামে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীগণ বিভিন্ন বিল সংসদে উত্থাপন করেন। সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী বা ভারপ্রাপ্ত সদস্য কোনো বিল উত্থাপনের অনুমতির জন্য সংসদে প্রস্তাব করেন। সংসদ অনুমতি দিলে উক্ত সদস্য বিলটি আনুষ্ঠানিকভাবে উত্থাপন করেন।[৪১] এ পর্যায়ে কোনো আলোচনা হয় না।

দ্বিতীয় ভাগ ঃ বিলের প্রকাশন- এ পর্যায়ে সচিব বিলের উদ্দেশ্য ও কারণ সংবলিত বিবৃতি এবং প্রযোজ্য হলে আর্থিক স্মারকলিপিসহ উত্থাপিত প্রত্যেকটি বিল গেজেটে প্রকাশের ব্যবস্থা করেন।[৪২] অবশ্য রাষ্ট্রপতি কোনো সরকারী বিল উত্থাপিত হবার পূর্বেই উহা গেজেটে প্রকাশ করার নির্দেশ দিতে পারেন।

তৃতীয় ভাগ ঃ বিল বিবেচনা- বিল উত্থাপনের পর ভারপ্রাপ্ত সদস্য প্রস্তাব করতে পারেন যে, বিলটি (ক) সংসদে বিবেচিত হোক; (খ) স্থায়ী কমিটির নিকট প্রেরণ করা হোক; (গ) বাছাই কমিটির নিকট প্রেরণ করা হোক এবং (ঘ) জনমত যাচাইয়ের জন্য প্রচার করা হোক। এ পর্যায়ে ভারপ্রাপ্ত

Dhaka University Institutional Repository

সদস্য বিলটির উদ্দেশ্য ও উহা পাসের প্রয়োজনীয়তা ইত্যাদি ব্যাখ্যা করেন। সদস্যগণ বিলটির নীতি ও সাধারণ বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করতে পারেন এবং উপর্যুক্ত চার প্রকার প্রস্তাবের ওপর সংশোধনী উত্থাপন করতে পারেন। আলোচনার পর বিলটি নীতিগতভাবে গৃহীত হলে, উহা হয় কমিটির নিকট পাঠান হয় নতুবা বিবেচনা করা হয়।[৪৩]

কমিটি পর্যায় ঃ কোনো বিল স্থায়ী বা বাছাই কমিটিতে পাঠান হলে কমিটির সদস্যগণ বিলটির প্রত্যেকটি ধারা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিবেচনা করেন এবং উহার ভাষাগত দুর্বলতা বা অস্পষ্টতা থাকলে এর উন্নতির জন্য সুপারিশ করেন। কমিটি বিলের আসল উদ্দেশ্য পরিবর্তন করতে না পারলেও সংশোধনের জন্য সুপারিশ করতে পারে।[৪৪]

রিপোর্ট পর্যায় ঃ বিচার-বিবেচনার পর কমিটি রিপোর্ট রচনা করে এবং কমিটির চেয়ারম্যান উহা সংসদে পেশ করে। তখন কমিটির রিপোর্ট ও সংশোধিত বিল গেজেটে প্রকাশ করা হয়। এরপর ভারপ্রাপ্ত সদস্য প্রস্তাব করতে পারেন যে কমিটি কর্তৃক প্রেরিত বিল বিচার-বিবেচনা করা হোক, অথবা পুনর্বার কমিটির নিকট পাঠান হোক, অথবা জনসাধারণের মতামত গ্রহণের জন্য প্রচার করা হোক।[৪৫]

দফাওয়ারী আলোচনাঃ কমিটি কর্তৃক প্রেরিত কোনো বিল সম্পর্কে বিচার-বিবেচনার প্রস্তাব ভোটে গৃহীত হলে বিলটির বিভিন্ন ধারা সম্পর্কে আলোচনা চলে। এই পর্যায়ে সদস্যগণ সংশোধনী প্রস্তাব উত্থাপন করেন এবং স্পীকার বিভিন্ন ধারা ও তফসিল এবং ঐগুলোর ওপর আনীত সংশোধনীর ওপর ভোট গ্রহণ করেন।[৪৬]

চতুর্থ ভাগ ঃ বিল পাস- বিলের সকল ধারা সম্পর্কে বিচার-বিবেচনা ও ভোট গ্রহণ সমাপ্ত হওয়ার পর বিলের চতুর্থভাগে প্রস্তাব করা হয় যে, বিলটি গ্রহণ করা হোক। এ ভাগে মৌখিক বা আনুষ্ঠানিক ছোট-খাট সংশোধনী ছাড়া কোনো মৌলিক সংশোধনী উত্থাপন করা যায় না; বিলটিকে সামগ্রিকভাবে গ্রহণ বা প্রত্যাখানের প্রশ্ন নিয়া বিতর্ক চলে। বিল পাসের জন্য উপস্থিত ও ভোটদানকারী সদস্যদের সংখ্যাগরিষ্ঠের সমর্থনে বিলটি গৃহীত হবার পর স্পীকার উহা সত্যায়িত করেন এবং রাষ্ট্রপতির সম্মতির জন্য প্রেরণ করেন। রাষ্ট্রপতি সম্মতি দিলে সচিব অবিলম্বে বিলটিকে সংসদের আইনরূপে গেজেটে প্রকাশ করেন।[৪৭]

পঞ্চম ভাগ ঃ রাষ্ট্রপতি কর্তৃক ফেরৎ পাঠানো বিল পুনর্বিবেচনা- সংসদে গৃহীত কোনো বিলে রাষ্ট্রপতি সম্মতি না দিয়ে যদি সংসদে ফেরত পাঠান তবে সংসদ উহার পুনর্বিবেচনা করবে। সংসদ পুনরায় বিলটি গ্রহণ করলে রাষ্ট্রপতির নিকট উপস্থাপিত হবে। রাষ্ট্রপতি সাত দিনের মধ্যে বিলটিতে সম্মতি না দিলে সম্মতি ব্যতিরেকেই বিলটি আইনে পরিণত হবে।[৪৮]

Dhaka University Institutional Repository

৮.অর্থ সংক্রান্ত কার্যপদ্ধতি (Financial Procedure)

ক) বাজেট পেশ (Presentation of Budget) ঃ প্রত্যেক অর্থ-বছরে সরকার উক্ত বছরের জন্য অনুমতি আয় ও ব্যয় সংবলিত "বার্ষিক আর্থিক বিবৃতি" সংসদে উপস্থাপন করেন (অনুচ্ছেদঃ ৮৭ (১))। যাকে বাজেট বলে। বাংলাদেশে অর্থ-বছর ১ জুলাই শুরু হয় এবং ৩০ জুন শেষ হয়। অর্থ-বছর আরম্ভ হওয়ার পূর্বেই অর্থ মন্ত্রণালয় বাজেট রচনা করেন এবং মন্ত্রীসভার অনুমোদনের পর সংসদের কার্যপ্রণালী-বিধি অনুসারে, অর্থমন্ত্রী বাজেট পেশ করেন এবং বাজেট পেশ করার সময় তিনি উহার ব্যাখ্যা বক্তৃতা প্রদান করেন। অর্থমন্ত্রীর বক্তৃতা ছাড়া সেই বাজেটের ওপর অন্য কোনো আলোচনা হয়না (কার্যপ্রণালী-বিধি ১১১ (২), ১১২)। সংবিধানে বিধান করা হয় যে, বাজেটে (ক) সংযুক্ত তহবিল হতে দায়যুক্ত ব্যয় নির্বাহের জন্য অর্থ এবং (খ) সংযুক্ত তহবিল হতে ব্যয় করা হবে এইরূপ প্রস্তাবিত অন্যান্য ব্যয় নির্বাহের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ প্রদর্শিত হবে এবং অন্যান্য ব্যয় হতে রাজস্ব খাতের ব্যয় পৃথক করে প্রকাশিত হবে (অনুচ্ছেদ ঃ ৮৭ (২))।

সংবিধানে সংযুক্ত তহবিলের ওপর দায়যুক্ত ব্যয়গুলো হচ্ছে ঃ রাষ্ট্রপতিকে দেয় পারিশ্রমিক* ও তার দপ্তর সংশ্লিষ্ট অন্যান্য ব্যয় স্পীকার ও ডেপুটি স্পীকার, সুপ্রীমকোর্টের বিচারকগণ, মহাহিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক, নির্বাচন কমিশনারগণ, সরকারী কর্ম-কমিশনের কর্মচারীদেরকে দেয় পারিশ্রমিকসহ প্রশাসনিক ব্যয়, কোনো আদালতের রায়ের ফলে দেয় অর্থ, সরকারের ঋণ সংক্রান্ত সকল দেনার দায় এবং সংসদের আইন দ্বারা ঘোষিত অন্য ব্যয় (অনুচ্ছেদ ঃ ৮৮)। সংযুক্ত তহবিলের ওপর ধার্য ব্যয় সম্পর্কে সংসদে আলোচনা করা যাবে কিন্তু উহার ওপর ভোট গ্রহণ করা হবে না। সংযুক্ত তহবিলের আয়ের উৎস হচ্ছে-সকল রাজস্ব, সংগৃহীত সকল ঋণ এবং কোনো ঋণ পরিশোধ হতে প্রাপ্ত সকল অর্থ। সরকার কর্তৃক প্রাপ্ত অন্য সকল সরকারী অর্থ, যেমন- লাইসেন্স ফি, কোর্ট ফি ইত্যাদি "প্রজাতন্ত্রের সরকারী হিসাবে" জমা হয় (অনুচ্ছেদ ঃ ৮৪)।

খ) সাধারণ আলোচনা (General Discussion) ঃ বাজেট উপস্থাপনের পর কোন দিন বাজেটের ওপর সাধারণ আলোচনা শুরু হবে এবং কতটা সময় পর্যন্ত আলোচনা চলবে তা স্পীকার নির্ধারণ করে দেন। এই সময়ে সদস্যগণ শুধু বাজেট সম্পর্কিত সরকারী নীতি নিয়ে আলোচনা করেন। আলোচনার শেষে অর্থমন্ত্রী উত্তর প্রদান করেন।[৪৯]

*সংবিধানের অষ্টম সংশোধনীতে ৬৮ অনুচ্ছেদ সংশোধনের মাধ্যমে "বেতন" শব্দটির পরিবর্তে "পারিশ্রমিক" শব্দটি প্রতিস্থাপিত হয়।

Dhaka University Institutional Repository

গ) মঞ্জুরী-দাবি ও ভোটগ্রহণ (Voting on Demands for Grants) ঃ সংযুক্ত তহবিলের ওপর দায়যুক্ত ব্যয় ব্যতীত অন্যান্য ব্যয়সমূহ মঞ্জুরী-দাবির আকারে সংসদে উপস্থাপিত হয়। সাধারণতঃ বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের ব্যয়ের জন্য পৃথক পৃথকভাবে মঞ্জুরী-দাবি করা হয়। এর ওপর আলোচনা ও ভোট গ্রহণ করার জন্য কতদিন সময় দেয়া হবে তা স্পীকার সংসদের নেতার সাথে পরামর্শ করে ধার্য করেন।[৫০] নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে আলোচনা শেষ না হল উক্ত সময়ের শেষে অবশিষ্ট মঞ্জুরী-দাবি সম্পর্কে স্পীকার "গিলোটিন" প্রয়োগ করেন। অর্থাৎ আলোচনা ছাড়াই ভোটের সাহায্যে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ব্যবস্থা করেন।

ঘ) নির্দিষ্টকরণ আইন (Appropriation Bill) ঃ সংসদ কর্তৃক মঞ্জুরী-দাবি অনুমোদনের পর যথাশীঘ্র "নির্দিষ্টকরণ বিল" নামে একটি অর্থ বিল সংসদে উত্থাপিত করা হয়। এই বিলের উদ্দেশ্য হলো সংসদ কর্তৃক মঞ্জুরীকৃত ব্যয় ও সংযুক্ত তহবিল হতে অর্থ তুলবার ক্ষমতা সরকারকে দেয়া। সংসদ কর্তৃক গৃহীত আইনের দ্বারা নির্দিষ্টকরণ ব্যতীত কোনো অর্থ উঠান যায় না। এই পর্যায়ে বিতর্ক বিলে উত্থাপিত মঞ্জুরীসমূহের মধ্যে যেসব জন-গুরুত্বসম্পন্ন বিষয় থাকবে, যা সংশ্লিষ্ট মঞ্জুরী- দাবিসমূহের বিবেচনাকালে ইতোপূর্বে উত্থাপিত হয় নাই।

ঙ) হিসাবের ওপর ভোট (Votes on Account) ঃ বার্ষিক বাজেট ও নির্দিষ্টকরণ বিল সংসদে গৃহীত হবার পূর্বেই নতুন অর্থ বছর আরম্ভ হয়ে যেতে পারে। অথচ আইনের কর্তৃত্ব ব্যতীত সরকার নতুন বছরের জন্য কোনো অর্থ ব্যয় করতে পারে না। সুতরাং নতুন অর্থ-বছরের শুরু হতে নির্দিষ্টকরণ আইন গৃহীত না হওয়া পর্যন্ত সময়ের জন্য অনুমিত ব্যয়ের অগ্রিম মঞ্জুরী সরকার সংসদের নিকট হতে নিয়ে থাকেন। এই অগ্রিম মঞ্জুরী দানকে "হিসাবের ওপর ভোট" বলা হয়।[৫১] বৃটেন, ভারত প্রভৃতি দেশেও এই ধরনের ব্যবস্থা আছে।

চ) সম্পূরক ও অতিরিক্ত মঞ্জুরী (Supplementary and excess grants) ঃ কোনো অর্থ-বছর প্রসঙ্গে যদি দেখা যায যে, (ক) চলতি অর্থ-বছরে নির্দিষ্ট কোনো কর্মবিভাগের জন্য অনুমোদিত ব্যয় অপর্যাপ্ত হয়েছে কিংবা ঐ বছরের বাজেটে অন্তর্ভুক্ত হয় নাই, এমন কোনো নতুন কর্ম-বিভাগের জন্য ব্যয় নির্বাহের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে; অথবা (খ) কোনো অর্থ-বছরে কোনো কর্মবিভাগের জন্য মঞ্জুরীকৃত অর্থের অধিক অর্থ উহার জন্য ব্যয় হয়েছে, তাহলে রাষ্ট্রপতি সংযুক্ত তহবিল হতে এই ব্যয় নির্বাহের কর্তৃত্ব প্রদান করতে পারেন। এরূপ ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতি এই ব্যয়ের অনুমিত পরিমাণ-সংবলিত একটি সম্পূরক বাজেট বা অতিরিক্ত বাজেট সংসদে উপস্থাপনের ব্যবস্থা করবেন। বার্ষিক বাজেট পাসের পদ্ধতিতে এই সম্পূরক বা অতিরিক্ত বাজেট সংসদে পাস করতে হবে।[৫২]

Dhaka University Institutional Repository

ছ) রাজস্ব আইন (Finance Act) ঃ সংসদের আইন দ্বারা বা কর্তৃত্ব ব্যতীত কোনো কর আরোপ বা সংগ্রহ করা যায় না।[৫৩] যে আইনের দ্বারা সরকারকে কর আরোপ ও সংগ্রহ করার ক্ষমতা দেয়া হয় তাকে রাজস্ব আইন বলে। সরকার রাজস্ব সম্পর্কিত প্রস্তাবসমূহ রাজস্ব বিলের আকারে সংসদে পেশ করেন। বার্ষিক বাজেট পেশ করার সময় ঐ বিল উপস্থাপিত হয়। রাষ্ট্রপতির সুপারিশ ব্যতীত কোনো রাজস্ব বিল সংসদে উত্থাপন করা যায় না। তবে কোনো কর হ্রাস বা বিলোপের বিধান সম্বলিত কোনো সংশোধনী উত্থাপনের জন্য রাষ্ট্রপতির সুপারিশের প্রয়োজন হয় না।[৫৪] বেসরকারী সদস্যগণ কোনো কর বৃদ্ধি বা নতুন কর ধার্য করার প্রস্তাব করতে পারেন না, তারা শুধু কর হ্রাস বা বিলোপের জন্য সংশোধনী প্রস্তাব আনতে পারেন। রাজস্ব বিল আলোচনার জন্য স্পীকার এক বা একাধিক দিন ধার্য করেন সেই সময়ের মধ্যেই আলোচনা ও ভোট গ্রহণ শেষ করতে হয়।[৫৫]

১৯৭৪ সালের ২২ জুলাই তারিখ জাতীয় সংসদ কর্তৃক রচিত কার্যপ্রণালী-বিধির ১৯৯০ সাল পর্যন্ত কিছু কিছু পরিবর্তন ছাড়া কোনো মৌলিক পরিবর্তন সাধিত হয়নি। এমনকি একদলীয় রাষ্ট্রপতি আমলেও কার্যপ্রণালী-বিধিটি অপরিবর্তিত ছিলো। জাতীয় সংসদ কর্তৃক প্রণীত কার্যপ্রণালী-বিধির কিছু মৌলিক পরিবর্তন সাধিত হয় পঞ্চম পার্লামেন্টে। দ্বিতীয় পার্লামেন্টে কার্যপ্রণালী-বিধির পরিবর্তনগুলো হলোঃ (ক) সংসদ-সদস্যগণ "প্রথম অধিবেশনেই"এর পরিবর্তে "প্রথম অধিবেশনের পূর্বে" শপথ গ্রহণ করবেন। আর যাঁরা ইতোপূর্বে শপথ গ্রহণ করেননি, তাঁরা "সংসদের যে কোনো বৈঠক"এর পরিবর্তে স্পীকার কর্তৃক নির্ধারিত সময় ও স্থানে শপথ গ্রহণ করবেন (কার্যপ্রণালী-বিধি ঃ ৫)। (খ) একজন সদস্য সংসদে তারকা চিহ্নিত প্রশ্ন "তিনটি" এর পরিবর্তে "দুটি" এবং তারকা চিহ্নবিহীন প্রশ্ন "পাঁচটি" এর পরিবর্তে "তিনটি" উত্থাপন করতে পারবেন (বিধি ঃ ৪৯)। (গ) মন্ত্রণালয়ের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে ১১টি স্থায়ী কমিটির স্থলে ৩৬টি কমিটি গঠনের ব্যবস্থা করা হয় (বিধি ঃ ২৪৬)।[৫৬]

তৃতীয় পার্লামেন্টে কার্যউপদেষ্টা কমিটির সদস্যসংখ্যা "দশজন" এর পরিবর্তে "পনের জন" করা হয় (বিধি ঃ ২১৯)।[৫৭]

চতুর্থ পার্লামেন্টে স্পীকারের নির্দেশ অনুযায়ী সংসদে বৈঠকের সময়সূচী নির্ধারিত হয়।[৫৮] এর পূর্বে নিয়ম ছিলো স্পীকার নির্দেশ না দিলে সংসদের বৈঠক সাধারণতঃ পূর্বাহ্ন ন'টা হতে অপরাহ্ন দু'টা পর্যন্ত বসবে; তবে শুক্রবার সাধারণতঃ পূর্বাহ্ন ন'টা হতে দ্বি-প্রহর বারটা ত্রিশ মিনিট পর্যন্ত বৈঠক বসবে।

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম পার্লামেন্টে কার্যপ্রণালী-বিধির ছোট-খাট বহু পরিবর্তন করা হয়; তবে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনগুলো হলো ঃ (ক) একজন সংসদ-সদস্য "একটি" তারকা চিহ্নিত প্রশ্নের অধিক সংসদে উত্থাপন করতে পারবেন না। যেখানে পূর্বে ছিলো "দুটি" তারকা চিহ্নিত প্রশ্ন (বিধি ঃ ৪৯)।[৫৯] (খ) ১২শ ক অধ্যায়, ৭১ ক বিধিতে জরুরী জন-গুরুত্বসম্পন্ন বিষয়ে সদস্য কর্তৃক বিবৃতি অধ্যায়টি সংযুক্ত করা হয়।[৬০] (গ) স্পীকারের অনুমতি ব্যতিরেকে কোনো সিদ্ধান্ত-প্রস্তাব সম্পর্কিত বক্তব্য "দশ মিনিটের" পরিবর্তে 'তিন মিনিট' করা হয়। তবে সিদ্ধান্ত-প্রস্তাবটির উত্থাপনকালে এর উত্থাপনকারী 'পনের মিনিট' বক্তৃতা করতে পারবেন (বিধি ঃ ১৪২)।[৬১] (ঘ) রাষ্ট্রপতির অভিশংসন ও অসামর্থ্যের কারণে তাঁর অপসারণের পদ্ধতি সংবিধানের "৫৩" ও "৫৪" অনুচ্ছেদের পরিবর্তে "৫২" ও "৫৩" অনুচ্ছেদ অনুযায়ী হবে (বিধি ঃ ১৬২)। ঙ) কার্যপ্রণালী-বিধির ২১ ক তম অধ্যায়, ১৬২ ক বিধিতে উপ-রাষ্ট্রপতির পদ এবং ২১ খ তম অধ্যায়, ১৬২ খ বিধিতে রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব পালন সম্পর্কে বিধানকরণ বিলুপ্ত ছিলো কার্যপ্রণালী-বিধির একটি মৌলিক পরিবর্তন। চ) কমিটির মেয়াদ এক বছরের পরিবর্তে সংসদের মেয়াদকাল পর্যন্ত বলবৎ থাকবে (বিধি ১৮৯)। ছ) জনগুরুত্বসম্পন্ন মুলতবী প্রস্তাবের নোটিশ কোনো বৈঠকে উত্থাপনের "অন্যূন দু'ঘন্টা" পূর্বে অনুরূপ নোটিশের প্রতিলিপি সচিবের নিকট প্রেরণ করতে হবে। যেখানে পূর্বে ছিলো "অন্যূন একঘন্টা পূর্বে"। জ) লাইব্রেরী কমিটির ক্ষেত্রে ২৫৭ (২) উপবিধি, ২৫৯, ২৬০, ২৬১ এইসব বিধি বিলুপ্ত করা হয়।[৬২] ঝ) সিদ্ধান্ত-প্রস্তাবের ক্ষেত্রে কোন সদস্য এক দিনে পঁচিশটির অধিক প্রস্তাবের নোটিশ প্রদান করতে পারবেন না, এ শর্তটি সংযুক্ত করা হয় (বিধি১৩১)।*

জাতীয় সংসদের ক্ষমতা ও কার্যাবলী (Powers and Functions)

সকল সরকার পদ্ধতিতে পার্লামেন্টের ক্ষমতা এক ধরনের নয়। গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় সরকারের তিনটি বিভাগের মধ্যে আইন বিভাগকে গুরুত্ব ও মর্যাদা বেশী দেয়া হয় বলে এ সরকার ব্যবস্থায় পার্লামেন্ট অধিক ক্ষমতা ভোগ করে। তবে গণতান্ত্রিক সরকারগুলোর মধ্যে সংসদীয় সরকার পদ্ধতিতে শাসন বিভাগ আইনসভার নিকট দায়ী থাকে বলে এক্ষেত্রে পার্লামেন্ট সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী। অন্যদিকে, রাষ্ট্রপতি শাসিত শাসন ব্যবস্থা সাধারণতঃ ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত বলে সেখানে নির্বাহী বিভাগের ওপর পার্লামেন্টের নিয়ন্ত্রণ অপেক্ষাকৃত কম থাকে। তবে একদলীয় শাসন ব্যবস্থায় আইনসভাকে তেমন ক্ষমতা দেয়া হয় না। সামরিক শাসন বাদ দিয়ে বাংলাদেশে পর্যায়ক্রমে (১৯৭২-১৯৯০) সাল পর্যন্ত এ তিন প্রকারের সরকার ব্যবস্থাই ছিলো। পঞ্চম পার্লামেন্টে বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের ক্ষমতা ও কার্যাবলী আলোচনা করা হলো।

* ৫-২-৯২ তারিখের গেজেট অতিরিক্ত সংখ্যায় প্রকাশিত সংসদ বিজ্ঞপ্তি দ্বারা শর্তাংশটি সন্নিবেশিত।

Dhaka University Institutional Repository

১.আইন প্রণয়ন (Legislation)

বাংলাদেশে আইন প্রণয়ন ক্ষমতা জাতীয় সংসদের হাতে ন্যস্ত। তবে সংসদ কর্তৃক গৃহীত বিল রাষ্ট্রপতির সম্মতি লাভ করে আইনে পরিণত হয়। কোনো বিল রাষ্ট্রপতির নিকট পেশ করার পনের দিনের মধ্যে তিনি তাতে সম্মতি দান করবেন কিংবা অর্থবিল ব্যতীত অন্য কোনো বিলের ক্ষেত্রে বিলটি পুনর্বিবেচনার জন্য তাঁর সুপারিশসহ সংসদে ফেরৎ পাঠাবেন। কিন্তু রাষ্ট্রপতি তা করতে অসামর্থ্য হলে, উক্ত মেয়াদের অবসানে তিনি বিলটিতে সম্মতিদান করেছেন বলে গণ্য হবে। তবে রাষ্ট্রপতি যদি বিলটি সংসদে ফেরত পাঠান, তাহলে সংসদ বিলটি সংশোধনীসহ বা সংশোধনী ব্যতীত মোট সংসদ-সদস্যের সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে পুনরায় পাস করলে তা রাষ্ট্রপতির নিকট আবার উপস্থাপিত হবে এবং তিনি সাতদিনের মধ্যে বিলটিতে সম্মতি দানে অসামর্থ্য হলে উক্ত সময়ের অবসানে তাঁর সম্মতি ব্যতীত বিলটি আইনে পরিণত হবে।[৬৩] এক্ষেত্রে আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ বৃটেন ও ভারতের ন্যায় একক ক্ষমতার অধিকারী। কেননা, ইংল্যান্ডের রাজা বা রানী আইনত পার্লামেন্ট কর্তৃক গৃহীত বিলে সম্মতি দিতে অস্বীকৃতি জানাতে পারেন, কিন্তু বাস্তবে তিনি তা করেন না।[৬৪] অনুরূপভাবে, ভারতের রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা থাকলেও তিনি যেহেতু প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ অনুসারে কাজ করেন। কাজেই তার ভেটো প্রয়োগ ক্ষমতার অবকাশ নেই।

সংসদীয় শাসনামলে আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে জাতীয় সংসদের অবাধ ক্ষমতা ছিলো। কিন্তু একদলীয় রাষ্ট্রপতি পদ্ধতিতে জাতীয় সংসদের আইন প্রণয়ন ক্ষমতা হ্রাস পায়। কেননা সংসদ কর্তৃক গৃহীত বিলে রাষ্ট্রপতি ভেটো প্রয়োগ করতে পারতেন।[৬৬] তাঁর ভেটোকে অতিক্রম করার ক্ষমতা কারো ছিলো না। রাষ্ট্রপতি শাসনামলে ১৯৭৯ সালে পঞ্চম সংশোধনীর দ্বারা রাষ্ট্রপতির ভেটো ক্ষমতা রহিত করা হয় এবং অন্য সকল বিধি সংসদীয় সরকারের অনুরূপ ছিলো।

২. আর্থিক নিয়ন্ত্রণ (Financial Control)

আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে আইনসভা রাষ্ট্রের অর্থ সংক্রান্ত কার্যাবলী নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। ১৯৭২ সালের সংবিধান অনুযায়ী বাংলাদেশে সংসদের আইন বা উহার কর্তৃত্ব ব্যতীত কোনো কর আরোপ বা সংগ্রহ করা যাবে না (অনুচ্ছেদ ঃ ৮৩)। সরকার প্রতি বছর আয়-ব্যয়ের অনুমিত হিসাব সংবলিত একটি বাজেট সংসদে উপস্থাপিত করবেন [অনুচ্ছেদ ঃ ৮৭ (১)]। সংযুক্ত তহবিলের ওপর ধার্য ব্যয়সমূহ সংসদে আলোচিত হবে, কিন্তু উহার ওপর ভোটগ্রহণ করা হবে না [অনুচ্ছেদ ঃ ৮৯ (১)]। অন্যান্য বিষয় সম্পর্কিত ব্যয় মঞ্জুরি-দাবির আকারে সংসদে উপস্থাপিত হবে এবং সংসদ এরূপ মঞ্জুরি দাবি অনুমোদন কিংবা প্রত্যাখ্যান করতে পারবে [অনুচ্ছেদ ঃ ৮৯ (২)] কিন্তু রাষ্ট্রপতির সুপারিশ ব্যতীত অর্থ ব্যয়-সংক্রান্ত কোনো বিল বা মঞ্জুরি-দাবি সংসদে উত্থাপন করা যায় না[৬৭]। ইংল্যান্ড এবং ভারতেও পার্লামেন্টের আইন ব্যতীত সরকার কোনো কর ধার্য বা সংগ্রহ করতে পারে না। সে সব দেশেও পার্লামেন্টের অনুমোদন নিয়ে বার্ষিক বাজেট কার্যকর হয়।[৬৮]

Dhaka University Institutional Repository

একদলীয় রাষ্ট্রপতি শাসনামলে অর্থ সংক্রান্ত ক্ষেত্রে জাতীয় সংসদের ক্ষমতা খর্ব করা হয়। রাষ্ট্রপতিই অর্থ-সংক্রান্ত সকল বিষয় নিয়ন্ত্রণ করতেন; এমনকি অর্থ বিলেও রাষ্ট্রপতি ভেটো প্রয়োগ করতে পারতেন।[৬৯] কিন্তু পঞ্চম সংশোধনীর দ্বারা জাতীয় সংসদের অর্থ সংক্রান্ত ক্ষমতা খর্ব করে বিধান করা হয় যে, সংসদের কোনো অর্থ বছরে সংযুক্ত তহবিলের ওপর দায়যুক্ত ব্যয় ছাড়া অন্যান্য ব্যয় সম্পর্কিত মঞ্জুরী-দাবি মঞ্জুর করতে অসমর্থ হলে বা হ্রাস করলে কিংবা সংযুক্ত তহবিল হতে ব্যয় নির্বাহের জন্য নির্দিষ্টকরণ আইনে পাস না করলে রাষ্ট্রপতি ১২০ দিনের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ ব্যয়ের অনুমতি দিতে পারতেন।[৭০] দ্বাদশ সংশোধনীর মাধ্যমে সংসদের আর্থিক নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা পুনরায় ১৯৭২ সালের মূল সংবিধান অনুযায়ী কার্যকরী হয়।

৩. শাসন বিভাগের ওপর নিয়ন্ত্রণ (Controlling the Executive)

মূল সংবিধান অনুসারে বাংলাদেশের শাসন বিভাগ তাদের যাবতীয় কার্যের জন্য আইন বিভাগের নিকট দায়ী থাকবে। কিন্তু চতুর্থ সংশোধনীর মাধ্যমে সংসদের এই ক্ষমতা খর্ব করা হয়।

১৯৭৫ সালের ২৫ জানুয়ারী সংসদীয় সরকার বিলুপ্ত হওয়ার পর দ্বাদশ সংশোধনীর মাধ্যমে পুনরায় পঞ্চম পার্লামেন্টে সংসদীয় সরকার প্রবর্তিত হওয়ায় পার্লামেন্টের অন্যতম ক্ষমতা ছিলো মন্ত্রীসভাকে নিয়ন্ত্রণ করা। সংবিধানে বিধান করা হয় যে, প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে একটি মন্ত্রীসভা থাকবে এবং মন্ত্রীসভা যৌথভাবে সংসদের নিকট দায়ী থাকবে। প্রধামন্ত্রীসহ অন্যান্য সকল মন্ত্রীদের রাষ্ট্রপতি নিয়োগ দান করবেন।[৭১]

প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক বা তাঁর কর্তৃত্বে সকল নির্বাহী ক্ষমতা প্রযুক্ত হতো। এখানে উল্লেখ্য যে, ভারতে নির্বাহী ক্ষমতা আইনত রাষ্ট্রপতির হাতে ন্যস্ত। মন্ত্রীসভা তাঁকে সাহায্য ও পরামর্শদান করেন। ইংল্যান্ডে তত্ত্বগতভাবে সার্বভৌম ক্ষমতা রাজা বা রানীর ওপর ন্যস্ত কিন্তু প্রথাগতভাবে ভারত ও বৃটেন উভয় দেশের রাষ্ট্র প্রধানই প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ অনুযায়ী তাঁদের দায়িত্ব পালন করেন। অনুরূপভাবে, বাংলাদেশের সংবিধানে সরকারের সকল নির্বাহী ব্যবস্থা রাষ্ট্রপতির নামে গৃহীত হয়েছে বলে প্রকাশ করা হলেও বাস্তবে সকল নির্বাহী ক্ষমতার অধিকারী প্রধানমন্ত্রী। মন্ত্রীসভা যতক্ষণ সংসদের আস্থা ভোগ করবেন, ততক্ষণ পর্যন্ত ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকবেন। সংসদ সদস্যগণ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা ও বিভিন্ন প্রকার প্রস্তাব উত্থাপনের মাধ্যমে সরকারের সমালোচনা করে থাকেন। সংসদে মন্ত্রীসভার বিরুদ্ধে সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের সমর্থনে অনাস্থা প্রস্তাব পাসে মন্ত্রীসভাকে পদত্যাগ করতে হয়। অবশ্য প্রধানমন্ত্রী যে কোনো সময় সংসদ ভেঙ্গে দেবার জন্য রাষ্ট্রপতিকে পরামর্শ দান করতে পারেন এবং সে অনুসারে রাষ্ট্রপতি সংসদ ভেঙ্গে দিবেন। ব্রিটেন এবং ভারতের আইনসভা ভেঙ্গে দেবার ক্ষমতা প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ অধিকার হিসেবে স্বীকৃত।[৭২] সংসদে সরকারী দলের নিরঙ্কুশ

Dhaka University Institutional Repository

সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকলে সরকারের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব গৃহীত হওয়ার কোনো সম্ভাবনা থাকে না এবং এ অবস্থায় সংসদ মন্ত্রীসভাকে নিয়ন্ত্রণ করার পরিবর্তে কার্যতঃ মন্ত্রীসভাই সংসদকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। সুতরাং সংসদের প্রধান কাজ হচ্ছে সরকারী নীতি ও কার্যকলাপের সমালোচনা করা। সরকারী কর্মচারী নিয়োগ ও বরখাস্ত, চুক্তি সম্পাদন ইত্যাদি শাসন সংক্রান্ত কাজে সংসদের অনুমোদন প্রয়োজন হয় না। তবে সংসদের সম্মতি ব্যতীত নির্বাহী বিভাগ যুদ্ধ ঘোষণা করতে পারে না কিংবা বাংলাদেশ কোনো যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করতে পারে না [অনুচ্ছেদ ঃ ৬৩ (১)]

সংসদীয় ব্যবস্থায় শাসন বিভাগের ওপর জাতীয় সংসদের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ ছিলো। কিন্তু ১৯৭৫ সালে প্রবর্তিত রাষ্ট্রপতি পদ্ধতিতে শাসন বিভাগকে নিয়ন্ত্রিত করার ক্ষেত্রে জাতীয় সংসদের ক্ষমতা খর্ব হয়। এক্ষেত্রে রাষ্ট্রের নির্বাহী ক্ষমতা প্রধানমন্ত্রীর পরিবর্তে রাষ্ট্রপতির ওপর ন্যস্ত করা হয়। রাষ্ট্রপতি সংসদ কর্তৃক নির্বাচিত না হয়ে জনগণের দ্বারা সরাসরি নির্বাচিত হতেন। এরূপ একদলীয় রাষ্ট্রপতি ব্যবস্থায় মন্ত্রীপরিষদ সংসদের নিকট দায়ী ছিলো না। রাষ্ট্রপতিই মন্ত্রীদের নিয়োগ করতেন এবং তার সন্তুষ্টি অনুযায়ী মন্ত্রীগণ স্বপদে বহাল থাকতেন।[১৩] মন্ত্রীসভার বিরুদ্ধে জাতীয় সংসদ কোনো অনাস্থা প্রস্তাব আনতে পারত না তবে মুলতবী প্রস্তাব, মনোযোগ আকর্ষণী প্রস্তাব, সংক্ষিপ্ত আলোচনা প্রস্তাব প্রভৃতি সংসদীয় পদ্ধতিগুলো বহাল ছিলো। পঞ্চম সংশোধনীর মাধ্যমে একদলীয় ব্যবস্থার পরিবর্তে বহুদলীয় রাষ্ট্রপতি ব্যবস্থা চালু হলেও এর দ্বারা সরকারের প্রকৃতিগত কোনো পরিবর্তন হয়নি। ১৯৭২ সালের মূল সংবিধান অনুযায়ী সংসদীয় সরকারের ক্ষেত্রে মন্ত্রীসভার সকল সদস্যকেই সংসদের সদস্য হতে হতো। চতুর্থ সংশোধনীর অধীনে রাষ্ট্রপতি সংসদ-সদস্য হবার যোগ্য যে কোনো ব্যক্তিকে প্রধামন্ত্রী বা মন্ত্রী নিয়োগ করতে পারতেন কিন্তু পঞ্চম সংশোধনীতে বিধান করা হয় যে, রাষ্ট্রপতি মন্ত্রীপরিষদের অনধিক এক-পঞ্চমাংশ সদস্য সংসদের বাহির হতে নিযুক্ত করতে পারবেন। উল্লেখ্য যে, রাষ্ট্রপতি পদ্ধতিতে সাধারণত মন্ত্রীরা সংসদ-সদস্য থাকতে পারেন না। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মত রাষ্ট্রপতি ব্যবস্থায় মন্ত্রীরা পার্লামেন্টে উপস্থিত থাকতে কিংবা সংসদীয় কার্যক্রমে অংশ নিতে পারেন না।

৪. বিচার সংক্রান্ত ক্ষমতা (Judicial Power)

রাষ্ট্রের বিচার ক্ষমতা সুপ্রীম কোর্ট ও অন্যান্য আদালতের ওপর ন্যাস্ত। সাধারণতঃ বিচার কার্য বলতে যা বুঝায় সংসদের সেরূপ কোনো কার্য নেই। তবে সংসদীয় শাসনব্যবস্থায় সংবিধান লংঘন বা গুরুতর অসদাচরণের অভিযোগে কিংবা শারীরিক অসামর্থ্যের কারণে জাতীয় সংসদের মোট সদস্য সংখ্যার অন্যূন দুই-তৃতীয়াংশ ভোটে নির্বাচন কমিশনার, সরকারী কর্ম-কমিশনার, সভাপতি ও রাষ্ট্রপতিকে অপসারণ করা যায়।[১৪] তবে বিচারপতি অপসারণ প্রক্রিয়া পঞ্চম সংশোধনীর মাধ্যমে সংবিধানের ৯৬ অনুচ্ছেদ পরিবর্তন করে যে বিধান করা হয় তা পঞ্চম পার্লামেন্টে বহাল

Dhaka University Institutional Repository

থাকে। প্রধান বিচারপতি ও দু'জন সর্বাপেক্ষা সিনিয়র বিচারপতির সমন্বয়ে একটি "সুপ্রীম জুডিশিয়াল কাউন্সিল" থাকবে। উক্ত কাউন্সিল কোনো বিচারকের শারীরিক অসামর্থ্য ও গুরুতর অসদাচরণের জন্য তদন্ত করে রাষ্ট্রপতির নিকট যে রিপোর্ট দিবেন, সেই অনুসারে রাষ্ট্রপতি যদি মনে করেন বিচারক দোষী তাহলে তিনি আদেশের দ্বারা উক্ত বিচারককে তার পদ হতে অপসারিত করবেন।[৭৫] অপরদিকে, প্রথম সংসদে বিচারপতি অপসারণ প্রক্রিয়া রাষ্ট্রপতি কিংবা নির্বাচন কমিশনার অপসারণের ন্যায় ছিলো। ভারতের পার্লামেন্টও সে দেশের বিচারকদের এবং রাষ্ট্রপতিকে অপসারিত করার ক্ষমতা ভোগ করে।[৭৬] ১৯৭৫ সালে রাষ্ট্রপতি পদ্ধতিতে বিচারকদের অপসারণের ক্ষেত্রে জাতীয় সংসদের ক্ষমতা বিলুপ্ত করে তা এককভাবে রাষ্ট্রপতির ওপর ন্যাস্ত করা হয়। তবে সংবিধান লংঘন কিংবা অসদাচরণের অভিযোগে রাষ্ট্রপতিকে অভিশংসিত করার ক্ষমতা সংসদের বহাল ছিলো। এ অভিযোগ সম্বলিত প্রস্তাব জাতীয় সংসদে দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের সমর্থনে উত্থাপিত হলে এবং তা তিন-চতুর্থাংশ সদস্যের দ্বারা গৃহীত হলে রাষ্ট্রপতিকে অপসারণ করা যেত।[৭৭] বহুদলীয় রাষ্ট্রপতি পদ্ধতিতে শারীরিক অসামর্থ্য কিংবা সংবিধান লংঘনের অভিযোগে বিচারকদের অপসারণ প্রক্রিয়া পঞ্চম পার্লামেন্টের অনুরূপ ছিলো।

৫. সংবিধান সংক্রান্ত ক্ষমতা (Constituent Power)

সংসদীয় শাসন ব্যবস্থায় সংবিধান সংশোধনের ক্ষমতা এককভাবে জাতীয় সংসদের ওপর ন্যস্ত। সংবিধানের কোনো বিধান সংশোধন বা রহিত করার নিমিত্তে পার্লামেন্ট মোট সদস্য-সংখ্যার অন্যূন দুই-তৃতীয়াংশ ভোটে কোনো বিল গ্রহণ করলে তা রাষ্ট্রপতির নিকট প্রেরণ করা হয়। রাষ্ট্রপতি সাত দিনের মধ্যে বিলটিকে সম্মতি দান করবেন। তিনি তা করতে অসমর্থ হলে উক্ত সাত দিন মেয়াদের অবসানে রাষ্ট্রপতি বিলটিতে সম্মতি দান করেছেন বলে গণ্য হবে।[৭৮] একদলীয় রাষ্ট্রপতি শাসন ব্যবস্থায় জাতীয় সংসদের সংবিধান সংক্রান্ত ক্ষমতা পূর্বের মতই বহালছিলো। রাষ্ট্রপতি সংসদ কর্তৃক গৃহীত অন্যান্য বিলে ভেটো প্রদানে সমর্থ হলেও তিনি সংবিধান সংশোধন বিলে ভেটো দিতে পারতেন না। কিন্তু ১৯৭৯ সালে পঞ্চম সংশোধনীয় দ্বারা জাতীয় সংসদের সংবিধান সংশোধন সংক্রান্ত ক্ষমতা বহুদলীয় রাষ্ট্রপতি আমলে সংকুচিত হয়। সংসদ দুই-তৃতীয়াংশ ভোটে সংবিধানের যে কোনো বিধান সংশোধনের লক্ষ্যে বিল গ্রহণ করতে পারত। তবে সংবিধানের কতিপয় বিধান, যথাঃ প্রস্তাবনা, অনুচ্ছেদ যথাক্রমে ৮ (রাষ্ট্রীয় আদর্শ), ৫৮ (মন্ত্রীপরিষদের গঠন ও ক্ষমতা), ৪৮, ৮০ ও ৯২ (ক) (রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা) এবং ১৪২ (সংবিধানে সংশোধন পদ্ধতি) সম্পর্কিত কোনো সংশোধনী বিল মোট সদস্য সংখ্যার দুই-তৃতীয়াংশ ভোটে গৃহীত হবার পর তা সম্মতির জন্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশ করতে হতো। রাষ্ট্রপতি বিলটিতে সম্মতি দান করবেন কি করবেন না তা নির্ধারণের জন্য বিষয়টি গণভোটে দিতেন। গণভোটের সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে অনুমোদিত হলেই তা কার্যকর হতো।[৭৯]

Dhaka University Institutional Repository

জাতীয় সংসদের সাংবিধানিক মর্যাদা (Constitutional Status of the parliament)

আইনসভার মর্যাদার কথা বিবেচনা করলে দুই ধরনের রাষ্ট্রব্যবস্থা পরিলক্ষিত হয়। এই দুই প্রকার রাষ্ট্রব্যবস্থার একটিতে সংসদের সার্বভৌমত্ব ও অপরটিতে সংবিধানের সার্বভৌমত্ব বিদ্যমান। দৃষ্টান্তস্বরূপঃ বৃটেন ও মার্কিন রাষ্ট্রব্যবস্থার উল্লেখ করা যায়। বৃটিশ সংবিধানের মূলতত্ত্ব হলো সংসদের সার্বভৌমত্ব (Soverignty of the Parliament)। অপরদিকে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সংবিধানের সার্বভৌমত্ব (Supremacy of the Constitution) বিদ্যমান। বৃটিশ সংবিধান প্রধানতঃ অলিখিত এবং সুপরিবর্তনীয়। সেখানে সাধারণ আইন এবং সাংবিধানিক আইনের মধ্যে কোনো পার্থক্য করা হয় না এবং পার্লামেন্টের আইন প্রণয়ন ক্ষমতার ওপর কোনো আইনগত বাধা নেই। সাধারণ সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে পার্লামেন্ট যে কোনো প্রকার আইন প্রণয়ন, পরিবর্তন বা রদ করতে পারে। বৃটিশ রাজা-রানী কোনো আইনে ভেটো প্রদান করেন না। আদালত আইনের ব্যাখ্যা প্রদান করে; কিন্তু পার্লামেন্ট কর্তৃক প্রণীত কোনো আইনকে অগ্রাহ্য করতে পারে না। পার্লামেন্টের সকল আইন আদালতের নিকট বৈধ। কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সংবিধানই সর্বোচ্চ আইন এবং সরকারের সকল অঙ্গ সংবিধানের দ্বারা নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে থেকে কাজ করতে বাধ্য। সুতরাং মার্কিন কংগ্রেস (আইনসভা) সার্বভৌম ক্ষমতাসম্পন্ন নয়। কংগ্রেস কেবল সংবিধান প্রদত্ত ক্ষমতা ভোগ করবে এবং কংগ্রেস সংবিধানের পরিপন্থী কোনো আইন প্রণয়ন করলে তা অবৈধ বলে গণ্য হবে। মার্কিন সুপ্রীম কোর্ট সংবিধানের ব্যাখ্যাকারক ও অভিভাবক। সংবিধানের অর্থ কি এবং আইনসভা ও শাসন বিভাগ সংবিধান নির্দিষ্ট সীমা লংঘন করছে কিনা, তা বিবেচনার ক্ষমতা নিজের হাতে তুলে নিয়ে সুপ্রীম কোর্ট কার্যতঃ নিজের প্রাধান্য সুপ্রতিষ্ঠিত করেছে। সুতরাং আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে কংগ্রেসের সিদ্ধান্তই শেষ কথা নয়; সুপ্রীম কোর্টের ব্যাখ্যা আইনের বৈধতা নির্ধারণ করে। তাছাড়া মার্কিন প্রেসিডেন্ট কংগ্রেস কর্তৃক গৃহীত বিলে ভেটো প্রদান করতে পারেন এবং অনুরূপ ভেটো অতিক্রম করতে হলে কংগ্রেসের উভয় কক্ষে দুই-তৃতীয়াংশ ভোটে ঐ বিল পুনরায় পাস করতে হয়।[৮০]

বাংলাদেশে জাতীয় সংসদ বৃটিশ পার্লামেন্টের ন্যায় সার্বভৌম সংস্থা নয়, আবার মার্কিন কংগ্রেসের ন্যায় তার ক্ষমতা তত সীমাবদ্ধও নয়। এদিক থেকে বলা যায় ১৯৭২ সালের মূল সংবিধান অনুযায়ী সংসদীয় শাসন ব্যবস্থায় বাংলাদেশ সংবিধান পার্লামেন্টের জন্য ব্রিটেনের ন্যায় সংসদের প্রাধান্য এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আদালতের প্রাধান্য এই দুই ব্যবস্থার মধ্যবর্তী স্থান নির্দেশ করে। কিন্তু সংবিধানের চতুর্থ সংশোধনী গৃহীত হবার ফলে বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতিকে জাতীয় সংসদ কর্তৃক গৃহীত বিলে ভেটো প্রদানের ক্ষমতা দেয়া হয়। ফলে আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে পার্লামেন্টের মর্যাদা ক্ষুণ্ন হয়। তবে পঞ্চম সংশোধনীর দ্বারা রাষ্ট্রপতির ভেটো ক্ষমতা বিলুপ্ত করা হলে সংসদের আইন সংক্রান্ত ক্ষমতা কিছুটা বৃদ্ধি পায়। পঞ্চম পার্লামেন্টে সংবিধানের দ্বাদশ সংশোধনীর মাধ্যমে পুনরায় জাতীয় সংসদের ক্ষমতা ১৯৭২ সালের মূল সংবিধানে ফিরিয়ে নেয়া হয়।

Dhaka University Institutional Repository

ব্রিটেন, ভারত ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানের সাথে ১৯৭২ সালের মূল সংবিধান অনুযায়ী বর্তমান বাংলাদেশ সংবিধানে জাতীয় সংসদের সাংবিধানিক মর্যাদার তুলনামূলক বিশ্লেষণ নিম্নরূপ ঃ

জাতীয় সংসদ কোনো বিল পাস করলে তাতে রাষ্ট্রপতিকে একটা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সম্মতি দিতে হয়। উল্লেখ্য যে, ভারতের সংবিধানে সে দেশের পার্লামেন্ট কর্তৃক গৃহীত বিলে সম্মতি দেয়ার জন্য রাষ্ট্রপতিকে সময় নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়নি।[৮১] এদিক থেকে বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ ভারতের পার্লামেন্টের চেয়ে অধিক মর্যাদার অধিকারী।

বাংলাদেশের সংবিধান লিখিত এবং দুষ্পরিবর্তনীয়। জাতীয় সংসদের ক্ষমতার উৎস হলো এই সংবিধান। প্রজাতন্ত্রের আইন-প্রণয়ন ক্ষমতা সংসদের হাতে ন্যস্ত; কিন্তু সংবিধানের বিধানবলী সাপেক্ষে সংসদ এই আইন প্রণয়ন ক্ষমতা প্রয়োগ করবে [অনুচ্ছেদ ৬৫ (১)]। সংবিধানের ৭ অনুচ্ছেদে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, সংবিধান জনগণের অভিপ্রায়ের অভিব্যক্তি এবং ইহা প্রজাতন্ত্রের সর্বোচ্চ আইন। অর্থাৎ সকল ক্ষমতা সংবিধান অনুসারে প্রয়োগ করতে হবে। কোনো আইন যদি সংবিধানের সাথে অসামঞ্জস্য হয়, তাহলে সেই আইনের অসামঞ্জস্যপূর্ণ ততখানি বাতিল হয়ে যাবে। দ্বিতীয়তঃ সংবিধানের তৃতীয় ভাগে বর্ণিত মৌলিক অধিকারের বিধান লঙ্ঘন করে সংসদ কোনো আইন প্রণয়ন করতে পারে না; মৌলিক অধিকারের সাথে অসামঞ্জস্য কোনো আইন বা তার কোনো অংশ বাতিল বলে গণ্য হবে (অনুচ্ছেদ ঃ ২৬)। অর্থাৎ সংসদ সংবিধানের পরিপন্থী কোনো আইন প্রণয়ন করলে সুপ্রীম কোর্ট তা অবৈধ বলে ঘোষণা করতে পারে। এই দিক দিয়ে বৃটিশ পার্লামেন্ট অপেক্ষা মার্কিন কংগ্রেসের সাথে জাতীয় সংসদের অধিক সাদৃশ্য রয়েছে।[৮২]

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ মার্কিন কংগ্রেসের ন্যায় অসার্বভৌম আইনসভা হলেও তার ওপর বিচার বিভাগের নিয়ন্ত্রণ তত ব্যাপক নয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রচলিত "যথাবিহীত প্রণালী" (Due process of Law) নীতি অনুসারে শুধু যে সংবিধানের সীমা লঙ্ঘন করেছে বলে সুপ্রীম কোর্ট কোনো আইনকে বাতিল করতে পারে তা নয়, উপরন্তু মৌলিক অধিকার সম্পর্কিত কোনো আইন সাধারণ ন্যায়নীতির পরিপন্থী হলেও অবৈধ ঘোষণা করতে পারে। এ ধরনের সুদূরপ্রসারী ক্ষমতা বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের নেই। মৌলিক অধিকারের ওপর কি ধরনের বাধা-নিষেধ আরোপ করা যাবে সংবিধানে তার উল্লেখ আছে, অতএব আইনের দ্বারা আরোপিত বাধা-নিষেধ 'যুক্তসঙ্গত' কিনা আদালত শুধু তাই বিচার করে।[৮৩]

Dhaka University Institutional Repository

সংবিধান সংশোধনের ক্ষেত্রে মার্কিন কংগ্রেস ও ভারতের পার্লামেন্টের তুলনায় বাংলাদেশ পার্লামেন্টের ক্ষমতা অধিক। মার্কিন কংগ্রেস এককভাবে সংবিধান সংশোধন করতে পারে না। কংগ্রেসের উভয় কক্ষে দুই-তৃতীয়াংশ ভোটে গৃহীত সংশোধনী প্রস্তাব তিন-চতুর্থাংশ অংগ রাজ্য কর্তৃক অনুমোদিত না হলে তা কার্যকর হয় না। ভারতেও সংবিধানের কতগুলো বিষয় সংশোধন করতে হলে পার্লামেন্টের অনুমোদন থাকলেই চলবে না, রাজ্যগুলোর আইনসভায় অন্ততঃ অর্ধেকের সমর্থন থাকা প্রয়োজন। অপরপক্ষে, বাংলাদেশ সংবিধানের সংশোধন বা রহিত করা যায় সংসদের মোট সদস্য সংখ্যা দুই-তৃতীয়াংশ ভোটে, বিচারকদের অপসারণ করার ক্ষেত্রে ১৯৭২ সালের মূল সংবিধানে জাতীয় সংসদের এক বিশেষ ক্ষমতা থাকলেও চতুর্থ সংশোধনীতে রাষ্ট্রপতি স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা বলে ও পঞ্চম সংশোধনীতে রাষ্ট্রপতি "সুপ্রীম জুডিশিয়াল কাউন্সিলের" সুপারিশক্রমে বিচারকদের অপসারণ করবেন। এরূপ ক্ষেত্রে পঞ্চম সংশোধনীই দ্বাদশ সংশোধনীতে বহাল থাকে। সুতরাং মার্কিন কংগ্রেসের উচ্চ কক্ষ সিনেট বিচারপতিদের অপসারণের ক্ষেত্রে যে অধিকার ভোগ করে বাংলাদেশ পার্লামেন্ট সে অধিকার থেকে বঞ্চিত। তাছাড়া, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি আইনসভা ভেঙ্গে দিতে পারেন না, কিন্তু বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি সংসদীয় সরকারের সময় প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শক্রমে এবং একদলীয় ও বহুদলীয় রাষ্ট্রপতি শাসনামলে রাষ্ট্রপতি স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা বলে যে কোনো সময় আইনসভা ভেঙ্গে দিতে পারেন। এ সকল ক্ষেত্রে বাংলাদেশ পার্লামেন্ট মার্কিন কংগ্রেসের তুলনায় কম ক্ষমতা ভোগ করে।

উপরোক্ত আলোচনা হতে প্রতীয়মান হয় যে সংসদীয় সরকার ব্যবস্থায় জাতীয় সংসদ আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী না হলেও তা রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন সংস্থা জনগণের অপ্রত্যাশিত একদলীয় ও বহুদলীয় রাষ্ট্রপতি শাসন ব্যবস্থা ব্যতীত বাংলাদেশে বৃটেনের ন্যায় সংসদীয় শাসন ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছে। এখানে শাসন বিভাগ তার সকল কাজ ও নীতির জন্য সংসদের নিকট দায়ী। সংসদের আস্থা হারালে মন্ত্রীসভাকে পদত্যাগ করতে হয়। অবশ্য মন্ত্রীসভা পদত্যাগ না করে সংসদ ভেঙ্গে দিয়ে ৯০ দিনের মধ্যে নির্বাচনের মাধ্যমে নতুন সংসদ গঠন করতে হয় এবং এই নতুন সংসদে মন্ত্রীসভা সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করতে না পারলে মন্ত্রীসভাকে অবশ্যই পদত্যাগ করতে হবে এবং যে দল সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করবে তারা নতুন মন্ত্রীসভা গঠন করবে। বর্তমান সংবিধানে ত্রয়োদশ সংশোধনীর মাধ্যমে বিধান করা হয় যে, উল্লেখিত অবস্থা ছাড়াও সংসদের মেয়াদ শেষ হবার পর ক্ষমতাসীন দল সংসদ ভেঙ্গে দিয়ে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের হাতে ক্ষমতা ছেড়ে দিবে এবং এ সরকার নতুন মন্ত্রীসভা গঠন একই নিয়মে সমাধান করবে। তাছাড়া সংসদের দুই-তৃতীয়াংশ ভোটে রাষ্ট্রপতি, নির্বাচন কমিশনার, সরকারী কর্ম-কমিশনের সভাপতিকেও অপসারণ করতে পারে। বস্তুতঃ ইহা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, বাংলাদেশ পার্লামেন্ট রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী না হয়েও সর্বোচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন সংস্থা।

Dhaka University Institutional Repository

টীকা ও তথ্যনির্দেশ

১. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, বাংলাদেশ গণপরিষদ, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান (অতঃপর কেবল "সংবিধান" বলে অভিহিত), ঢাকা ১৯৭৩।

২. পকিস্তানের কয়েকটি দল বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের সরাসরি বিরোধিতা করে এবং পাকিস্তান সামরিক জান্তাকে সক্রিয় সমর্থন ও সহযোগিতা দান করে। স্বাধীনতা যুদ্ধের পর স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশে স্বাধীনতা বিরোধীদের বিচার করার লক্ষ্যে ১৯৭২ সালে বাংলাদেশ যোগসাজশকারী (বিশেষ ট্রাইব্যুনাল) আদেশ (রাষ্ট্রপতির আদেশ নং ৮, ১৯৭২) জারি করা হয়। এতে বিধান করা হয় যে, উক্ত আদেশের অধীনে কোনো অপরাধের জন্য দন্ডিত হয়ে থাকলে তিনি সংসদ নির্বাচনে ভোটদান এবং সংসদ সদস্য নির্বাচিত হবার বা থাকবার যোগ্য হবেন না। ১৯৭৫ সালের রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের পর সামরিক আইন আদেশ (Second Proclamation order No. III of 1975) বলে যোগসাজসকারী আদেশের অধীন দন্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের সংসদ নির্বাচনে ভোট প্রদান ও সংসদ-সদস্য নির্বাচিত হবার অধিকার দেয়া হয় এবং পঞ্চম সংশোধনীর মাধ্যমে তা সাংবিধানিক আইনে পরিণত হয়।

৩. সংবিধান, ঢাকা, ১৯৯৮, অনুচ্ছেদঃ ৭২ (৩), (৪)।

৪. জালাল ফিরোজ, পার্লামেন্টারি শব্দকোষ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, জুন ১৯৯৮ পৃষ্ঠা ঃ ১৮৭।

৫. সংবিধান, ১৯৯৮, অনুচ্ছেদ ঃ ৭৪ (১), (২)।

৬. ঐ, অনুচ্ছেদ ঃ ৭৪ (৩)।

৭. ঐ, অনুচ্ছেদ ঃ ৫৪

৮. জালাল ফিরোজ, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ঃ ১৮৭।

৯. সত্যসাধন চক্রবর্তী ও নিমাই প্রামাণিক, নির্বাচিত আধুনিক শাসন ব্যবস্থা, শ্রীভূমি পাবলিশিং কোম্পানী, কলকাতা, জুলাই ১৯৮০, পৃষ্ঠা ঃ ১৩০।

১০. Thomas R. Dye, Governing the American Democracy, New York, 1980, PP. 278-279.

১১. সংবিধান, ১৯৯৮, অনুচ্ছেদ ঃ ৭৫ (১) (খ)।

১২. ঐ, অনুচ্ছেদ ঃ ৭৮ (২)।

১৩. ঐ, অনুচ্ছেদ ঃ ৮৮ (খ) (অ)।

১৪. বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালী-বিধি (অতঃপর কেবল কার্যপ্রণালী-বিধি বলে অভিহিত), ঢাকা ১৯৯৭, পৃষ্ঠা ঃ ৮০-৯২।

Dhaka University Institutional Repository

১৫. কার্যপ্রণালী-বিধি, বিধি ঃ ২১৯-২২০, পৃষ্ঠা ঃ ৮০।

১৬. ঐ, বিধি ঃ ২২২-২২৩, পৃষ্ঠা ঃ ৮১।

১৭. ঐ, বিধি ঃ ২২৫, ২২৬, ২২৮, পৃষ্ঠা ঃ ৮১-৮৩।

১৮. ৪-৩-৮০ তারিখের গেজেটে অতিরিক্ত সংখ্যা (খন্ড ৫)-এ প্রকাশিত সংসদ বিজ্ঞপ্তি দ্বারা পিটিশন কমিটি গঠিত হব "ক্ষেত্রমত সংসদের প্রত্যেক অধিবেশনের প্রথম বৈঠকে বা সময়ে সময়ে" শব্দাবলী বিলুপ্ত।

১৯. কার্যপ্রণালী-বিধি, বিধি ঃ ২৩১-২৩২, পৃষ্ঠা ঃ ৮৩-৮৪।

২০. ঐ, বিধি ঃ ২৩৩-২৩৪, পৃষ্ঠা ঃ ৮৪-৮৫।

২১. ঐ, বিধি ঃ ২৩৫-২৩৭, পৃষ্ঠা ঃ ৮৫-৮৬।

২২. কমিটি প্রতিষ্ঠানের অনিয়ম ও ত্রুটি-বিচ্যুতি দূরীকরণ এবং প্রতিষ্ঠানকে দুর্নীতি-মুক্তকরণের জন্য প্রয়োজনীয় সুপারিশ করে সংসদে রিপোর্ট পেশ করবেন এবং প্রয়োজনবোধে সংসদে রিপোর্ট পেশ করবার পূর্বে এর অংশ বিশেষ সরকারের নিকট পেশ করবেন। ৫-২-৯২ তারিখের গেজেট অতিরিক্ত সংখ্যায় প্রকাশিত সংসদ বিজ্ঞপ্তি দ্বারা সংযোজিত।

২৩. কার্যপ্রণালী-বিধি, বিধি ঃ ২৩৮-২৩৯, পৃষ্ঠা ঃ ৮৬-৮৭।

২৪. ৫-২-৯২ তারিখের গেজেট অতিরিক্ত সংখ্যায় প্রকাশিত সংসদ বিজ্ঞপ্তি দ্বারা "সংসদের প্রথম অধিবেশন" সংযোজিত।

২৫. কার্যপ্রণালী-বিধি, বিধি ঃ ২৪০-২৪২, পৃষ্ঠা ঃ ৮৭-৮৮।

২৬. ঐ, বিধি ঃ ২৪৪-২৪৫, পৃষ্ঠা ঃ ৮৮।

২৭. ঐ, বিধি ঃ ২৪৬-২৪৭, পৃষ্ঠা ঃ ৮৮-৮৯।

২৮. ঐ, বিধি ঃ ২৪৯-২৫১, পৃষ্ঠা ঃ ৮৯-৯০।

২৯. ঐ, বিধি ঃ ২৫৭-২৫৮, পৃষ্ঠা ঃ ৯১।

৩০. ঐ, বিধি ঃ ২৬৩-২৬৪, পৃষ্ঠা ঃ ৯২।

৩১. ঐ, বিধি ঃ ২৬৬, পৃষ্ঠা ঃ ৯২।

৩২. ঐ, বিধি ঃ ১৯২ (১) ১৯৪, পৃষ্ঠা ঃ ৭৫।

৩৩. আবুল ফজল হক, বাংলাদেশের শাসন ব্যবস্থা ও রাজনীতি, বাংলা একাডেমী, অক্টোবর ১৯৭৪ পৃষ্ঠা ঃ ১৯৯-২০০।

৩৪. Eric Taylor, The House of commons at work England, 1965, P. 166.

৩৫. Madan Gopal Gupta, Modern Governments, এলাহাবাদ, ১৯৬৩, পৃষ্ঠা ঃ ৫৩৩-৫৬৩।

Dhaka University Institutional Repository

৩৬. সংবিধান, ১৯৯৮, অনুচ্ছেদ ঃ ৭৫ (১) (ক)।

৩৭. ঐ, অনুচ্ছেদ ঃ ৭২ (১) (২)।

৩৮. ঐ, অনুচ্ছেদ ঃ ৭৫ (২)।

৩৯. ঐ, অনুচ্ছেদ ঃ ৭৮ (১-৪)।

৪০. কার্যপ্রণালী-বিধি ১৯৯৭, বিধি ঃ ২৪ (১-৩), ২৫, পৃষ্ঠা ঃ ১১।

৪১. ঐ, বিধি ঃ ৭২, ৭৪, ৭৫, পৃষ্ঠা ঃ ৩১-৩২।

৪২. ঐ, বিধি ঃ ৭৬, পৃষ্ঠা ঃ ৩২।

৪৩. ঐ, বিধি ঃ ৭৭, ৭৮ পৃষ্ঠা ঃ ৩৩।

৪৪. ঐ, বিধি ঃ ৮৪, পৃষ্ঠা ঃ ৩৬-৩৭।

৪৫. ঐ, বিধি ঃ ৮০, পৃষ্ঠা ঃ ৩৪-৩৫।

৪৬. ঐ, বিধি ঃ ৮৮, পৃষ্ঠা ঃ ৩৭-৩৮।

৪৭. ঐ, বিধি ঃ ৯০-৯৬, পৃষ্ঠা ঃ ৩৮-৩৯।

৪৮. সংবিধান, অনুচ্ছেদ ঃ ৮০ (৪)।

৪৯. কার্যপ্রণালী-বিধি, বিধি ঃ ১১৫, পৃষ্ঠা ঃ ৪৬।

৫০. ঐ, বিধি ঃ ১১৬, ১১৭, পৃষ্ঠা ঃ ৪৭।

৫১. সংবিধান, অনুচ্ছেদ ঃ ৯২ (১)।

৫২. ঐ, অনুচ্ছেদ ঃ ৯১।

৫৩. ঐ, অনুচ্ছেদ ঃ ৮৩।

৫৪. ঐ, অনুচ্ছেদ ঃ ৮২।

৫৫. কার্যপ্রণালী-বিধি ১৯৭৪, বিধি ঃ ১২৭, ১২৮।

৫৬. ৪-৩-৮০ তারিখের গেজেট অতিরিক্ত সংখ্যা (খন্ড-৫) এ প্রকাশিত সংসদ বিজ্ঞপ্তি।—

৫৭. ১৪-৭-৮৭ তারিখের গেজেট অতিরিক্ত সংখ্যায় সংসদ বিজ্ঞপ্তি দ্বারা "দশজন" শব্দটির পরিবর্তে প্রতিস্থাপিত।

৫৮. ১৫-২-৮৯ তারিখের গেজেট অতিরিক্ত সংখ্যায় প্রকাশিত সংসদ বিজ্ঞপ্তির দ্বারা ২২ বিধির পরিবর্তে প্রতিস্থাপিত।

৫৯. ৫-২-৯২ তারিখের গেজেট অতিরিক্ত সংখ্যায় প্রকাশিত সংসদ বিজ্ঞপ্তির দ্বারা সংযুক্ত।

৬০. উপর্যুক্ত বিজ্ঞপ্তি দ্বারা সংযুক্ত।

৬১. উপর্যুক্ত "দশ" মিনিট ও "ত্রিশ" মিনিটের পরিবর্তে প্রতিস্থাপিত।

৬২. উপর্যুক্ত "৫৩" ও "৫৪" অনুচ্ছেদের পরিবর্তে প্রতিস্থাপিত।

৬৩. সংবিধান, অনুচ্ছেদ ঃ ৮০।

Dhaka University Institutional Repository

৬৪. E.C.S. Wade and Godfrey Philips, constitutional law, London, 1953, P. 136.

৬৫. Durga Das Basu, Constitution of India, Calcutta, 1970, P. 240.

৬৬. সংবিধান, ঢাকা, ১৯৭৫, অনুচ্ছেদ ৬৫, ৮০।

৬৭. সংবিধান, ঢাকা, ১৯৭৫, ১৯৯৯, অনুচ্ছেদ ঃ ৮৩, ৮৯ (১) (২) (৩), ৮৭ (১)।

৬৮. E.C.S. Wade and Godfrey Philips, Ibid., P. 105, Durga Dus Basu, Ibid, PP. 259-265.

৬৯. সংবিধান, ১৯৭৫, অনুচ্ছেদ ঃ ৮৩।

৭০. সংবিধান, (ঢাকা ১৯৭৯), অনুচ্ছেদ ঃ ৯৫ (ক)।

৭১. সংবিধান, (ঢাকা ১৯৯৯), অনুচ্ছেদ ঃ ৫৫ (১) (৩), ৫৬ (২)।

৭২. E.C.S. Wade and Godfrey Philips, Ibid, pp. 140-150 Durga Das Busu, Ibid, P. 530.

৭৩. সংবিধান, ১৯৭৫, অনুচ্ছেদ ঃ ৫৮।

৭৪. সংবিধান, ১৯৯৯ ও ১৯৭৩, অনুচ্ছেদ ঃ ৫২ (১) (২), ৫৩ (১) ও ১১৮ (৫)।

৭৫. সংবিধান, ১৯৯৯, অনুচ্ছেদ ঃ ৯৬।

৭৬. Durga Das Basu, Ibid, P. 265.

৭৭. সংবিধান, ১৯৭৫, অনুচ্ছেদ ঃ ৫৩

৭৮. সংবিধান, ১৯৭৩, ১৯৯৯ অনুচ্ছেদ ঃ ১৪২।

৭৯. সংবিধান, ১৯৭৯, অনুচ্ছেদ ঃ ১৪২।

৮০. আবুল ফজল হক, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ঃ ২০৪-২০৫।

৮১. Durga Das Basu, Ibid, Section : 3, p. 259.

৮২. আবুল ফজল হক, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ঃ ২০৫-২০৬।

৮৩. আবুল ফজল হক, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ঃ ২০৬।

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায়

জাতীয় সংসদ ও সাংসদদের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক পটভূমি

রাষ্ট্রকে জীব দেহের সাথে তুলনা করে রাষ্ট্রের জনগণ যদি হয় রাষ্ট্রের প্রাণ তবে পার্লামেন্টকেও দেহের সাথে তুলনা করলে পার্লামেন্টের সদস্যরা হবেন ইহার প্রাণ। প্রাণ ছাড়া দেহের যেমন কোনো মূল্য নেই তদ্রুপ সদস্য ছাড়া পার্লামেন্টের কোনো মূল্য নেই। পার্লামেন্টের সুষ্ঠু কার্যকারিতা অনেকাংশ নির্ভর করে সাংসদদের রাজনৈতিক ঐতিহ্য ও ব্যক্তিগত যোগ্যতা এবং অভিজ্ঞতার ওপর। তাই কোনো সংসদের কার্যকারিতা বিশ্লেষণ করতে গেলে সংসদ-সদস্যদের আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক পটভূমি সম্পর্কে জানা প্রয়োজন। সুক্ষ্মভাবে চিন্তা করলে দেখা যাবে যে, এর মাধ্যমে দেশের সাধারণ জনগণের সাথে সংসদ-সদস্যদের প্রত্যক্ষভাবে না হলেও পরোক্ষভাবে পরিচয় হবে। যে পরিচয়ের সূত্র ধরে সংসদ-সদস্যদের সাথে জনগণের আত্মিক সম্পর্ক গড়ে উঠবে। আর এই সম্পর্কই জনগণকে রাজনীতিতে অংশগ্রহণের প্রেরণা দিবে। তাছাড়া একটি দেশের সামগ্রিক রাজনৈতিক পরিমন্ডল ও সংসদের কার্যকারিতার ওপর যথেষ্ট প্রভাব ফেলতে পারে। তাই নির্বাচন ও একটা নির্দিষ্ট সময়ে দেশে ক্রিয়াশীল রাজনৈতিক দলসমূহের উদ্দেশ্য, কর্মসূচী, রাজনৈতিক কৌশল এবং বিশেষ করে সংসদীয় রাজনীতির প্রতি তাদের দৃষ্টিভঙ্গী অধ্যায়ন করা দরকার।

সুতরাং এই অধ্যায়ে পঞ্চম সংসদ নির্বাচন, পার্লামেন্টের রাজনৈতিক গঠন, সংসদদের আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক পটভূমি এবং বিদ্যমান রাজনৈতিক দলসমূহের নির্বাচনী উদ্দেশ্য, কর্মসূচী, রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী সম্পর্কে আলোচনা করা হবে।

রাজনৈতিক দলসমূহের নির্বাচনী আদর্শ ও কর্মসূচী

প্রত্যেক রাজনৈতিক দলই সকল নির্বাচনের সময় কতগুলো আদর্শ, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের ভিত্তিতে তাদের নির্বাচনী ইস্তেহার ব্যক্ত করে। উদ্দেশ্যের যেগুলো তারা নির্বাচিত হবার পর বাস্তবায়ন করবে বলে জনগণের মাঝে প্রচার চালায়, মূলতঃ এই আদর্শ, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যই কোনো একটি দলকে জনগণের কাছে পরিচিত করায় এবং সমর্থনের ভিত্তি গড়ে তোলে। অপরদিকে কোনো রাজনৈতিক ব্যবস্থার সাফল্য অধিকাংশ নির্ভর করে সেই ব্যবস্থার প্রতি বিদ্যমান রাজনৈতিক দলসমূহের অঙ্গীকারের ওপর। পঞ্চম পার্লামেন্ট ছিলো একটি সংসদীয় সরকার এবং এরূপ

Dhaka University Institutional Repository

সরকারের ক্রিয়াশীল দলসমূহের একটি বড় অংশ যদি সংসদীয় রাজনীতির প্রতি আস্থাশীল না হয়, তাহলে সংসদ কার্যকর ভূমিকা পালন করতে ব্যর্থ হবে। সুতরাং পঞ্চম পার্লামেন্টের আমলে সক্রিয় রাজনৈতিক দলসমূহের মতাদর্শ, বিশেষ করে সংসদীয় রাজনীতির প্রতি তাদের দৃষ্টিভঙ্গী রণকৌশল এবং মতাদর্শের কি মিল ছিলো তা আলোচনা করবো।

পঞ্চম পার্লামেন্ট নির্বাচনে সর্বমোট ৭৬টি রাজনৈতিক দল অংশ নেয়। তবে এদের অধিকাংশ দলই ছিলো নামে মাত্র। মাত্র ১২টি দল নির্বাচনে আসন পেতে সক্ষম হয়। উল্লেখযোগ্য রাজনৈতিক দলসমূহের নির্বাচনী ইস্তেহার নিম্নে আলোচনা করা হলো।

আওয়ামীলীগ

১৯৯১-র ৬ ফেব্রুয়ারী আওয়ামীলীগ নির্বাচনী ইস্তেহারে বলা হয়, চতুর্থ সংশোধনীর পূর্বাবস্থায় ১৯৭২ সালের সংবিধান পূণর্বহালের মাধ্যমে সংসদীয় শাসন ব্যবস্থা কায়েম আওয়ামীলীগের রাজনৈতিক লক্ষ্য ও অঙ্গীকার।

নির্বাচনী ইস্তেহারে বঙ্গবন্ধু ঘোষিত ও সংবিধানে গৃহীত চার মূলনীতি জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতার নীতির ভিত্তিতে এক শোষণমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠা করা বাঙালী জাতির আশা-আকাঙ্খা অনুযায়ী অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রণয়ন এবং বাংলাদেশের ভূখন্ডে বসবাসরত সকল ধর্ম, বর্ণ, গোত্র, জাতি-উপজাতির ধর্মীয় স্বাধীনতার ভিত্তিতে সম্পূর্ণ অসাম্প্রদায়িক রাষ্ট্রীয় নীতি ও সকল প্রকার বৈষম্যের অবসান করা। বাংলাদেশে ধর্মনিরপেক্ষতা প্রতিষ্ঠাই ইহার মূলবক্তব্য। ইস্তেহারে বলা হয়, অর্থনৈতিক লক্ষ্য হিসেবে সামগ্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনায় রাষ্ট্রে ভূমিকা হবে সহায়কের নিয়ন্ত্রক নহে, এই নীতিতে রাষ্ট্রয়ত্ব খাতের দক্ষ ব্যবস্থাপনার পাশাপাশি বেসরকারী খাতের স্বাধীন ও স্বতঃস্ফুর্ত উদ্যোগকে সর্বাত্মকভাবে উৎসাহিত এবং কোনো ব্যবসা-শিল্প প্রতিষ্ঠান জাতীয়করণ না করা; ২৫ বিঘা পর্যন্ত কৃষি জমির খাজনা মওকুফ, ৫ হাজার টাকা পর্যন্ত কৃষিঋণ সুদসহ মওকুফ, ১০ হাজার টাকা পর্যন্ত কৃষিঋণের সুদ মওকুফ ও ভূমি সংস্কারের মাধ্যমে কৃষকের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নয়ন ও উৎপাদন বৃদ্ধি এবং কৃষকের উৎপাদিত পন্যের যুক্তিসংগত মূল্যের নিশ্চয়তা বিধান; সরকারী বেসরকারী খাতের শ্রমিকদের শ্রম সংগঠনের অধিকার সংরক্ষণের মাধ্যমে শ্রমিক মালিক ও অন্যান্য প্রতিনিধি সমন্বয়ে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে মজুরী নির্ধারণ; শিক্ষার সুযোগ প্রতিটি নাগরিকের মৌলিক অধিকার, এই নীতিতে শিক্ষার উন্নয়ন; সরকারী কর্মকর্তাগণ প্রজাতন্ত্রের কর্মচারী, সরকারের নহে, এই নীতিতে প্রশাসন যন্ত্রের প্রাতিষ্ঠানিক নিরপেক্ষতা নিশ্চিত করা এবং দেশকে বহিঃশত্রুর হাত হতে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে একটি সুদক্ষ, শক্তিশালী, সুশৃঙ্খল ও কার্যকর

Dhaka University Institutional Repository

সেনাবাহিনী গড়ে তোলা ও প্রতিরক্ষা বাহিনীর রাজনৈতিক নিরপেক্ষতা থাকতে হবে। সাংবিধানিক অনুশাসন অনুযায়ী নিশ্চিত করার দলীয় নীতি ও লক্ষ্যের কথাও ইস্তেহারে ঘোষণা করা হয়। ইস্তেহারে বলা হয়, ১৯৭৫ সালের ১৫ আগষ্টের পর হতে দীর্ঘ ও নিরবচ্ছিন্ন এক নায়কত্বের কুফল হিসাবে সমাজ জীবনে বিস্তৃত দুর্নীতির মূলোৎপাটনের লক্ষ্যে রাষ্ট্রীয়, সামাজিক ও প্রশাসনিক পর্যায়ে দূর্নীতিবাজ ও তাদের সহযোগীদের বিরুদ্ধে চরম শাস্তির ব্যবস্থা এবং আর যাতে কোনো রাষ্ট্রপতিকে উচ্চাভিলাষী সন্ত্রাসীদের হাতে খুন হতে না হয় এবং ক্ষমতার পরিবর্তন কেবল সাংবিধানিক প্রক্রিয়ায় সংঘটিত হয় সেই লক্ষ্যে খুন বা হত্যালীলার মাধ্যমে নয়, বরং সংবিধানের প্রয়োজনীয় পরিবর্তন ও সংশোধনের মাধ্যমে খুনীদের সংবিধানের আওতায় এনে বিচারের ব্যবস্থা করা হবে।[১]

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল

বি.এন.পি ২৮ জানুয়ারী '৯১ দলীয় নির্বাচনী ঘোষণা পত্রে 'দুর্নীতিমুক্ত সৎ সরকার' প্রতিষ্ঠার অঙ্গীকার ব্যক্ত করে। এই লক্ষ্যে মরহুম প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের ১৯ দফা কর্মসূচীর আলোকে জনগণের পাঁচটি মৌলিক চাহিদা পূরণের পদক্ষেপ গ্রহণের কথা বলা হয়েছে। ঘোষণাপত্রে সামাজিক, অর্থনৈতিক ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সংবিধানের চার মৌলনীতি বাস্তবায়নের কথা বলা হয়। চার মৌলনীতি হলোঃ সর্বশক্তিমান আল্লাহতায়ালার সর্বাত্মক বিশ্বাস, গণতন্ত্র, জাতীয়তাবাদ এবং আর্থ-সামাজিক ন্যায়বিচার। ঘোষণাপত্রে বিচার বিভাগের স্বাধীনতা ও নিরপেক্ষতা এবং আইনের শাসন নিশ্চিত করা, সর্বপ্রকার কালাকানুন বাতিল করে জনগণের মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করার কথা বলা হয়।

বহুদলীয় গণতন্ত্র নিশ্চিত করার অঙ্গীকার ব্যক্ত করে ঘোষণাপত্রে বলা হয়; সকল দল ও মতের স্ব-স্ব মতাদর্শ প্রচারের স্বাধীনতা নিশ্চিতকরণ, সর্বতোভাবে দেশের স্বাধীনতা, অখন্ডতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষা, বিদেশী আগ্রাসনের হাত হতে স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষার পবিত্র দায়িত্বে নিয়োজিত প্রতিরক্ষা বাহিনীকে সুদক্ষ, সুসজ্জিত ও শক্তিশালী করা এবং কৃষি উন্নয়নের জন্য কৃষকদের ৫০০০ টাকা পর্যন্ত ঋণ ও সুদ মওকুফ।[২]

পাঁচ দলীয় ঐক্য জোট

১৯৯১-র ৩১ জানুয়ারী ঘোষিত নির্বাচনী ইস্তেহারে পাঁচদলীয় জোট প্রথম ও তৃতীয় সংশোধনী ব্যতীত সংবিধানের সকল সংশোধনী বাতিল, অর্থনীতিতে পুঁজিবাদী ধারা পরিহার এবং সাবেক প্রেসিডেন্ট এরশাদের সহযোগীদের বিচারে নতুন আইন প্রণয়নের অঙ্গীকার করে ভোটের নির্বাচনী ইস্তেহার ঘোষণা করে।

Dhaka University Institutional Repository

ইস্তেহারে আন্দোলনের মধ্য দিয়ে স্বীকৃত শ্রেণী ও পেশার দাবিসমূহ বাস্তবায়নের অঙ্গীকার করে। পাঁচ দল এই লক্ষ্যে ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের অংশ হিসাবে নির্বাচনকে বিবেচনা করে। স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলনের মূল লক্ষ্য অর্জনে তারা সংসদের ভিতরে ও বাহিরে সংগ্রাম অব্যাহত রাখবে। স্বৈরাচার, সাম্প্রদায়িকতা ও সকল প্রকার শোষণ, নিপীড়ন ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে জনগণের বাঁচার আন্দোলনকে শক্তিশালী করা। শোষক শ্রেণীর আগমন প্রতিরোধ করা, জনগণের আন্দোলনকে সংসদের ভিতরে নিয়ে যাওয়া। জনণের বাক, ব্যক্তি ও সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, ধর্ম বিশ্বাস ও ধর্মপালনের স্বাধীনতা নিশ্চিত করা, জরুরী অবস্থা জারির বিশেষ ক্ষমতা আইন ও প্রেস এন্ড পাবলিকেন্স এ্যাক্ট বিনাবিচারে আটক করার আইনসহ সকল কালাকানুন বাতিল করা হবে এবং রেডিও টেলিভিশন স্বায়ত্তশাসিত সংস্থায় পরিণত করা হবে। এরশাদ ও তাঁর সহযোগীদের দুর্নীতির বিচারের জন্য নতুন আইন প্রণয়ন করা হবে। পুলিশের অত্যাচার থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য নতুন পুলিশ কোড প্রণয়ন এবং সেনাবাহিনীর গঠন কাঠামো ও বিধি ব্যবস্থাকে গণতান্ত্রিক কাঠামোর মধ্যে আনা হবে। অর্থনৈতিক লক্ষ্য হিসাবে উৎপাদিকা শক্তির বিকাশ ও খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা আনয়নের লক্ষ্যে জাতীয় অর্থনীতিকে ঢেলে সাজানো হবে এবং পুঁজিবাদী ধারা পরিহার করা হবে। ব্যাংক বীমা ভারী শিল্প রাষ্ট্রয়ত্ব খাতে রেখে এ যাবৎকালে অনুসৃত বিরাষ্ট্রীয়করণ নীতি বাতিল এবং বেসরকারী খাতের লুটপাটের ধারা পরিহার করে প্রকৃত শিল্প উদ্যোগকে উৎসাহিত করা হবে। সেই সঙ্গে চোরাচালানী, মজুতকারী, বিদেশে সম্পদ পাচার কঠিন হস্তে দমন করা হবে। সামরিক খাত, পুলিশ ও আমলাদের খরচ যুক্তিসঙ্গত পর্যায়ে নামিয়ে আনা হবে। আয়ের সঙ্গে সঙ্গতিহীন সকল স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হবে। "খোদ কৃষকের হাতে জমি ও সমবায়" এই নীতিতে এক ফসলী জমি ৫০ বিঘা ও দু'ফসলী জমি ৩০ বিঘা পর্যন্ত সিলিং নির্ধারণ করে ভূমি সংস্কার বর্গা চাষীদের স্থায়ীভাবে চাষ করার অধিকার নিশ্চিত করা সহ কৃষি উপকরণের দাম শতকরা ৫০ ভাগ কমানো হবে। এছাড়াও বেকার ভাতা প্রদান, জাতীয় বেতন স্কেলের অনুপাত ৫ঃ১ ধার্য করার পদক্ষেপ নেয়া হবে। অসাম্প্রদায়িক শিক্ষা ব্যবস্থা চালু ও দশম শ্রেণী পর্যন্ত অবৈতনিক করা হবে এবং অপসংস্কৃতি, বিকৃত পত্রিকা-পুস্তক, ব্লু-ফ্লিম বন্ধ করা হবে। সকল মানুষের জন্য অভিন্ন স্বাস্থ্যনীতি প্রণয়ন ও কার্যকর, জাতিসংঘে "নারীর সমঅধিকার সনদ" কার্যকর, কঠোর হস্তে নারী নির্যাতন বন্ধ ও শিশুশ্রম নিষিদ্ধ করা হবে।

ইস্তেহারে বলা হয়, পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ী জনগোষ্ঠীর স্বায়ত্তশাসন প্রদান। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের আগ্রাসী ভূমিকার বিরোধিতাসহ সৌদীআরব হতে বাংলাদেশী সৈন্য ফিরিয়ে আনা হবে।[৩]

Dhaka University Institutional Repository

জামাত-ই-ইসলামী

১৯৯১-র ২৯ জানুয়ারী ঘোষিত জামাত-ই-ইসলামীর নির্বাচনী ইস্তেহারে অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে বাংলাদেশকে ইসলামী রাষ্ট্র হিসাবে ঘোষণা, সকল কালাকানুন বাতিল ও সংবিধানের অনৈসলামিক অংশের সংশোধন, বিচার বিভাগের স্বাধীনতা রক্ষা, প্রশাসন ও আমলাতন্ত্রকে সম্পূর্ণরূপে সৎ ও সুদক্ষ করে গড়ে তোলার প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়। এতে ছেলে-মেয়েদের জন্য বাধ্যতামূলক নৈতিক শিক্ষার প্রয়োজনীয়তার ওপরও জোর দেয়া হয়। সরকারের ধরণ সম্পর্কে নির্বাচনী ইস্তেহারে জবাবদিহীমূলক সরকার প্রবর্তনের কথা বলা হয়। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ইসলামী অর্থনীতি চালুর ওয়াদা ব্যক্ত করা হয়। পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে স্বাধীন পররাষ্ট্রনীতি অনুসরণ, বিশ্বের দরবারে বাংলাদেশের মান-মর্যাদা ও অবস্থান বৃদ্ধি বিশেষ করে মুসলিম ও প্রতিবেশী দেশগুলোর সাথে ভ্রাতৃত্বসুলভ সুসম্পর্ক দৃঢ় করার কথা এতে ব্যক্ত করা হয়।[৪]

ফ্রিডম পার্টি

ফ্রিডম পার্টির নির্বাচনী ইস্তেহারে অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে মূল প্রতিপাদ্য বিষয়গুলো ছিলো- দ্বি-কক্ষ বিশিষ্ট আইন সভা সম্বলিত নতুন সংবিধান প্রণয়ন, উচ্চকক্ষে আনুপাতিক প্রতিনিধিত্বের প্রবর্তন, সকল কালাকানুন ও ভারতের সাথে পঁচিশ বছর চুক্তি বাতিল, আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা, বিচার বিভাগের স্বাধীনতা, সংবিধানের আদর্শের আলোকে নতুন শিক্ষা ব্যবস্থার প্রবর্তন, বৈদেশিক নির্ভরতা হ্রাস ও বেকার সমস্যার সমাধান।[৫]

ন্যাপ (মোজাফফর)

ন্যাপের (মোজাফফর) নির্বাচনী ইস্তেহারে ধর্মসহ সমাজতন্ত্রের প্রবর্তন, দেশে প্রকৃত গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা, ২৫ বিঘা পর্যন্ত কৃষি জমির খাজনা মওকুফ, বিশেষ ক্ষমতা আইন ও প্রেস এন্ড পাবলিকেশনস্ এ্যাক্ট ইত্যাদি বাতিলের প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়। এতে ফারাক্কা, তিন বিঘা, তালপট্টি, বেরুবাড়ি সমস্যাসহ ভারতের সাথে সকল বিরোধ সৌহার্দ্যপূর্ণভাবে সমাধানেরও প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়।[৬]

বাকশাল

বাকশালের নির্বাচনী ইস্তেহারে বুলেটের রাজনীতি বন্ধ ও চার রাষ্ট্রীয় মূলনীতিসহ ১৯৭২ সালের সংবিধান পুনরুজ্জীবনের ওয়াদা করা হয়। এতে ফারাক্কার বিরূপ প্রতিক্রিয়া থেকে উত্তরাঞ্চলীয় জেলাগুলোকে রক্ষা করার প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়।[৭]

Dhaka University Institutional Repository

উপদেষ্টা পরিষদে সদস্য নিয়োগের জন্য তিন জোটের নিকট থেকে পৃথকভাবে নামের তালিকা আহবান করেন। তিন জোট কর্তৃক সরবরাহকৃত প্রায় পাঁচ ডজন নামের মধ্য থেকে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি পাঁচ দফায় মোট ১৭ জন উপদেষ্টা নিয়োগ করেন; এবং তাঁদেরকে মন্ত্রীর পদমর্যাদা দেয়া হয়। রাজনৈতিক জোট বা দল কর্তৃক মনোনীত হলেও উপদেষ্টাগণ কোনো দলের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন না এবং তাঁদের অধিকাংশই ছিলেন অবসরপ্রাপ্ত বেসামরিক আমলা। অবশ্য ১৭ জনের মধ্যে একজন ছিলেন অবসরপ্রাপ্ত সামরিক আমলা, চারজন অধ্যাপক (যাঁদের মধ্যে দু'জন ছিলেন প্রাক্তন উপাচার্য), একজন ডাক্তার, একজন প্রাক্তন বিচারপতি ও একজন আইনজীবী[৯] নিম্নের সারণীতে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতির উপদেষ্টা পরিষদ প্রদর্শিত হলো (দেখুন সারণী-৪.১)।

সারণী-৪.১

অস্থায়ী রাষ্ট্রপতির উপদেষ্টা পরিষদ

নাম	মন্ত্রণালয়
১. বিচারপতি এম,এ খালেক	আইন, বিচার ও সংসদীয় বিষয়ক
২. জনাব কফিল উদ্দীন মাহমুদ	অর্থ
৩. জনাব ফখরুদ্দীন আহমদ	পররাষ্ট্র
৪. অধ্যাপক রেহমান সোবহান	পরিকল্পনা
৫. অধ্যাপক ওয়াহিদুদ্দীন আহমদ	জ্বালানী, খনিজ এবং পূর্তকর্ম
৬. অধ্যাপক জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী	শিক্ষা
৭. জনাব আলমগীর এম,এ, কবীর	সমাজকল্যাণ, মহিলা বিষয়ক এবং যুব উন্নয়ন ও ক্রীড়া
৮. জনাব এ,কে,এম, মুসা	শিল্প, পাট এবং বস্ত্র
৯. জনাব ফজলুর রহমান	সেচ পরিবেশ, বন, মৎস ও পশুসম্পদ
১০. এম,এ, মাজেদ	স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা
১১. মেজর অবঃ রফিকুল ইসলাম (বীরউত্তম)	জাহাজ, নৌ-চলাচল এবং পর্যটন
১২. অধ্যাপক ইয়াজউদ্দীন আহমদ	সংস্কৃতি ও খাদ্য
১৩. জনাব এ,বি,এম, জি কিবরিয়া	যোগাযোগ এবং টেলিযোগাযোগ
১৪. জনাব ইমান উদ্দীন আহমদ	বাণিজ্য
১৫. জনাব বি,কে, দাস	ত্রাণ ও পুনর্বাসন
১৬. জনাব এম, আনিসুজ্জামান	কৃষি ও ভূমি ব্যবস্থা
১৭. চৌধুরী এম,এ, আমিনুল হক	শ্রম, জনশক্তি এবং অভ্যন্তরীণ সম্পদ

উৎস ঃ ডঃ এমাজউদ্দীন আহমদ, রাষ্ট্রবিজ্ঞানের কথা, বাংলাদেশ বুক করপোরেশন লিঃ, ঢাকা, জুন ১৯৯৪, পৃষ্ঠা ঃ ৩৩৪।

Dhaka University Institutional Repository

তিন জোটের যৌথ ঘোষণার অন্যতম দাবি ছিলো অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের স্বার্থে নির্বাচন কমিশনকে পুনর্গঠন করা। তদনুসারে ৮ ও ৫ দলীয় জোট এরশাদ কর্তৃক নিযুক্ত প্রধান নির্বাচন কমিশনার নিয়োগের দাবি জানায়। এতে ৭ দলীয় জোট তথা বি,এন,পি, প্রথমে আপত্তি জানালেও পরে তিন জোটের মধ্যে মতৈক্য প্রতিষ্ঠিত হয়, এবং অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতি আব্দুর রউফকে নতুন প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও বিচারপতি মেসবাহ উদ্দীনকে নতুন নির্বাচন কমিশনার নিয়োগ করে নির্বাচন কমিশন পুনর্গঠিত করেন।[১০]

স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে অভ্যুদয়ের পর ১৯৯১ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারী বাংলাদেশে পঞ্চম জাতীয় সংসদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।[১১] বহুমুখী ও বহুমাত্রিক গুরুত্বের কারণে বাংলাদেশের ও বহির্বিশ্বের জনগণ অত্যন্ত আগ্রহ ও কৌতূহল ভরে এ নির্বাচনের জন্য অপেক্ষায় ছিলো।

নির্বাচনের মাধ্যমে ভোটারগণ কর্তৃক ভোটাধিকার প্রয়োগ গণতান্ত্রিক শাসনের ভিত্তি। পাশ্চাত্য দেশের ন্যায় শাসন করার জন্য প্রতিনিধি নির্বাচন বিশ্বের এ অঞ্চলে কখনো স্বাভাবিক ঘটনা ছিলো না। সাধারণতঃ অবস্থার প্রেক্ষিতে বাধ্য হয়েই বৃটিশ আমলে এবং স্বাধীনতা পূর্ব ও স্বাধীনতা উত্তরকালে শাসকগোষ্ঠী অনেকটা অনিচ্ছাকৃতভাবে ও ঈর্ষান্বিত ভাবেই নির্বাচন দেয়[১২] এখানে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার চেয়ে ক্ষমতা বৈধকরণের উপায় হিসেবেই নির্বাচনের অভিনয় করা হয়। ফলে তৃতীয় বিশ্বের ও উন্নয়নশীল যে কোনো দেশের তুলনায় এখানে গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান গঠন মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়। গণতন্ত্রের এরূপ আত্মতৃপ্তিকর ও অনিয়মত চর্চা খাঁটি ও মজবুত গণতান্ত্রিক ভিত্তির বিকাশে খুব একটা সহায়ক হয়নি।[১৩] নির্বাচন স্বয়ং গণতন্ত্র না হলেও এ লক্ষ্যে এটাই সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। দূর্ভাগ্যবশতঃ স্বাধীনতার উনিশ বছরের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা ও প্রতিষ্ঠানগুলোর মূল গভীরে তা প্রোথিত হয়নি। কিন্তু ১৯৯১ সালে সংসদ নির্বাচন এক ভিন্ন প্রেক্ষাপট ও পটভূমিতে অনুষ্ঠিত হয়। এর উদ্দেশ্য ক্ষমতার বৈধকরণ কিংবা শাসকদের হাত বদল কোনোটাই ছিলো না। বরং তা ছিলো জাতির ভবিষ্যৎ ভাগ্য কি হবে তা নির্ধারণ করা।

Dhaka University Institutional Repository

সংসদে দলীয় অবস্থান (১৯৯১-১৯৯৫)

পঞ্চম সংসদ নির্বাচনে সর্বমোট ৬,১৮,৭৭,৫৩৩ জন ভোটারের মধ্যে শতকরা ৫৫-৩৫টি ভোট প্রদত্ত হয়। ৪২৪ জন স্বতন্ত্র প্রার্থীসহ নির্বাচনে অংশ নেয় মোট ২,৭৮৭ জন প্রার্থী। সর্বমোট ৭৬টি রাজনৈতিক দল এই নির্বাচনে অংশ নেয়। প্রার্থীর মৃত্যুজনিত কারণে ২টি আসনে নির্বাচন স্থগিত থাকে। চারজন প্রার্থী একাধিক আসনে জয়লাভ করে। নির্বাচনী সংঘর্ষের কারণেও তিনটি আসনের আংশিক নির্বাচন স্থগিত থাকে। সব মিলিয়ে পরবর্তীতে ১১টি আসনে উপ-নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এছাড়াও পরোক্ষভাবে ৩০ জন মহিলা সদস্য সংসদ-সদস্যদের ভোটের মাধ্যমে নির্বাচিত হয়।[১৪] পঞ্চম সংসদ নির্বাচন, ভোটদাতা, প্রার্থী ও রাজনৈতিক দল এসব দিক থেকে পূর্ববর্তী সকল নির্বাচন থেকে ভিন্ন ছিলো। নিচের সারণীতে তা প্রদর্শিত হলো (সারণী-৪.২)।

সারণী-৪.২

১৯৭৩, ১৯৭৯, ১৯৮৬, ১৯৮৮ ও ১৯৯১ এর নির্বাচনে অংশগ্রহণকৃত

ভোটার, প্রার্থী ও রাজনৈতিক দলের তুলনামূলক চিত্র

নির্বাচনের বছর	ভোটারের সংখ্যা	প্রার্থীর সংখ্যা	রাজনৈতিক দলের সংখ্যা
১৯৭৩	৩,৫২,০৫,৬৪২	১০৮৯	১৪
১৯৭৯	৩,৮৩,৬৩,৮৫৮	২১২৫	২৯
১৯৮৬	৪,৭৩,১৫,৮৮৬	১৫২৭	২৮
১৯৮৮	৪,৯৮,৬৩,৮২৯	৯৭৮	৮
১৯৯১	৬,২২,৮৯,৫৫৬	২৭৮৭	৭৫

উৎস ঃ বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন, ঢাকা।

Dhaka University Institutional Repository

১৯৯১ সালের সংসদ নির্বাচনের ফলাফল বিশ্লেষণে বিজয়ী দল, প্রত্যেকটি দলের মোট প্রার্থী, প্রাপ্ত আসন সংখ্যা এবং প্রাপ্ত ভোটের শতকরা হার নিম্নের সারণীতে দেয়া হলো (সারণী-৪.৩)।

সারণী-৪.৩

১৯৯১ সালের সংসদ নির্বাচনের ফলাফল ঃ দলীয় অবস্থান (বিজয়ী আসনের)

দলের নাম	মোট প্রার্থী	প্রাপ্ত আসন সংখ্যা	প্রাপ্ত ভোট (শতকরা হার)
বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বি.এন.পি)	৩০০	১৪০	৩০.৮১
বাংলাদেশ আওয়ামীলীগ	২৬৪	৮৮	৩০.০৮
বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামীলীগ	৬৮	০৫	১.৮১
বাংলাদেশ কম্যুনিষ্ট পার্টি	৪৯	০৫	১.৯১
ন্যাশনাল আওয়ামীপার্টি	৩১	০১	০.৭৬
গণতন্ত্রী পার্টি	১৬	০১	০.৪৫
জনতা মুক্তি পার্টি	০৮	-	০.০৯
জামাত -ই- ইসলামী	২২২	১৮	১২.১৩
জাতীয় পার্টি	২৭২	৩৫	১১.৯২
ইসলামী ঐক্যজোট	৫৯	০১	০.৭৯
জাকের পার্টি	২৫১	-	১.২২
খেলাফত আন্দোলন	৪৩	-	০.২৭
জাসদ (রব)	১৬১	-	০.৭৯
জাসদ (সিরাজ)	৩১	০১	০.২৫
জাসদ (ইনু)	৬৮	-	০.৫০
ওয়ার্কস পার্টি	৩৫	০১	০.১৯
বাসদ (খালেকুজ্জামান)	১৩	-	০.১০
বাসদ (মাহবুব)	০৬	-	০.০৪
শ্রমিক কৃষক সমাজবাদী দল	০৩	-	০.০২
ইউনাইটেড কম্যুনিষ্ট লীগ	২৬	-	০.৩২
ঐক্য প্রক্রিয়া	০২	-	০.০৩
ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক পার্টি	২০	০১	০.৩৬
বাংলাদেশ জনতা দল	৫০	-	০.৩৫
ফ্রিডম পার্টি	৬৫	-	০.২৭
বাংলাদেশ মুসলিম লীগ (আয়েন উদ্দীন)	০৬	-	০.২০
বাংলাদেশ মুসলিম লীগ (কাদের)	৬২	-	০.১০
বাংলাদেশ মুসলিম লীগ (মতিন)	০৬	-	০.০৩
বাংলাদেশ মুসলিম লীগ (ইউসুফ)	০৮	-	০.০১
অন্যান্য দল	২১৮	-	০.৫৩
স্বতন্ত্র	৪২৪	০৩	৪.৩৯
সর্বমোট	২৭৮৭	৩০০	১০০

উৎস ঃ বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন, ঢাকা।

Dhaka University Institutional Repository

নির্বাচনের ফলাফলে দেখা যায় যে, ৭০টি রাজনৈতিক দলের মধ্যে কেবল ১২টি দল বিভিন্ন সংখ্যক আসন লাভ করে। বি.এন.পি. ১৪০টি আসন পেয়ে সর্বোচ্চ থাকে, আওয়ামীলীগ ৮৮টি আসন পেয়ে দ্বিতীয় স্থান ও ছয়টি রাজনৈতিক দল প্রত্যেকে সর্বনিম্ন একটি করে আসন পায়। আমরা দেখেছি, ২৭ ফেব্রুয়ারীর সাধারণ নির্বাচনে কোনো দলই নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পায়নি। তবে বি.এন.পি ১৪০টি আসন নিয়ে সংসদে একক সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হিসাবে আবির্ভূত হয় এবং এই দল সরকার গঠনের দাবি জানায় কিন্তু অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি জাতির উদ্দেশ্যে এক ভাষণে বলেন, নির্বাচিত সদস্যদের দলগত অবস্থান থেকে কোনো দল সংখ্যাগরিষ্ঠের আস্থাভাজন তা স্পষ্ট নয় বিধায় এ মুহূর্তে মন্ত্রীপরিষদ গঠন সম্ভব নয়। অবশেষে জামাত বি.এন.পিকে সমর্থনের লিখিত প্রতিশ্রুতি প্রদান করলে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সাহাবুদ্দীন আহমদ ১৯ মার্চ, ১৯৯১ তারিখে বি.এন.পি. নেত্রী বেগম খালেদা জিয়াকে প্রধানমন্ত্রী করে একটি ৩০ সদস্যের মন্ত্রীপরিষদ গঠন করেন। উল্লেখ্য যে, সংবিধান অনুযায়ী সকল নির্বাহী ক্ষমতা অস্থায়ী রাষ্ট্রপতির হাতে থেকে যায়। আইনতঃ প্রধানমন্ত্রী ও অন্যান্য মন্ত্রীরা ছিলেন রাষ্ট্রপতির উপদেষ্টা মাত্র। ১৯৯১ সালের ৬ আগষ্ট দ্বাদশ সংশোধনী বিল পাস এবং ১৯ সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার '৯১ সংসদীয় পদ্ধতির সরকারের মন্ত্রীসভা গঠিত হওয়া পর্যন্ত অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি নির্বাহী প্রধান হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। এক্ষেত্রে উক্ত সময়ের শাসনকে দ্বৈত শাসন বলা যেতে পারে। কেননা, বেগম খালেদা জিয়া সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেত্রী হিসাবে প্রধানমন্ত্রী হওয়া সত্ত্বেও সকল নির্বাহী ক্ষমতা অস্থায়ী রাষ্ট্রপতির হাতে থেকে যায়।

স্বাধীনতা উত্তর ১৯৭৩, ১৯৭৮, ১৯৮১ এবং ১৯৯১ এর জাতীয় সংসদ নির্বাচনে মোট ভোটারের একটি তুলনায় দেখা যায় যে, ১৯৭৩ এর নির্বাচনে ৫৫%, ১৯৭৮ সালে ৫৩.৫৯%, ১৯৮১ সালে ৫৬.৫৫% এবং ১৯৯১ এর নির্বাচনে ৫৫.৩৫% ভোটার ভোট দেয়।[১৫] তাহলে দেখা যাচ্ছে তুলনামূলকভাবে ভোটারের পরিমাণ তেমন বৃদ্ধিও পায়নি এবং কমেওনি।

সাংসদদের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক পটভূমি

পঞ্চম পার্লামেন্টের সাংসদদের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক পটভূমি আলোচনা করতে গিয়ে একই সাথে অতীত সংসদীয় সরকারের একটি তুলনামূলক চিত্র সারণীর মাধ্যমে দেখানো হবে। এর মাধ্যমে একদিকে যেমন অতীত ও বর্তমানের যোগসূত্র স্থাপিত হবে এবং যা ভবিষ্যৎ সম্পর্কে দিক নির্দেশনা দিবে। আর যে বিষয়টি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ তাহলো সাংসদদের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থানের ক্রমশ পরিবর্তনের একটি বাস্তব চিত্র ফুটে উঠবে।

Dhaka University Institutional Repository

১. সদস্যদের বয়স

পঞ্চম পার্লামেন্টে ৩৩০ জন সদস্যদের মধ্যে মহিলা সদস্যবাদে ৩০০ জন সাংসদের মধ্যে বয়সের গ্রুপে দেখা যায় যে, ৫৬ বছর বয়সের ওপরে সদস্য ছিলেন ৬২ জন, ৪৬-৫৫ বছর বয়সের গ্রুপে ছিলেন ১০১ জন, ৩৬-৪৫ বছর বয়সের গ্রুপে ছিলেন ১১৩ জন, ৩১-৩৫ বছর বয়সের গ্রুপে ছিলেন ২০ জন, ২০-৩০ বছর বয়সের গ্রুপে ছিলেন ৪ জন। পঞ্চম পার্লামেন্টের সদস্যদের বয়স সারণীতে উপস্থাপন এবং একই সারণীতে প্রথম পার্লামেন্টের সদস্যদের বয়স উল্লেখ করে একটি তুলনামূলক চিত্র প্রদর্শন করা হলো (সারণী-৪.৪)।

সারণী-৪.৪

প্রথম ('৭৩) ও পঞ্চম ('৯১) পার্লামেন্টে নির্বাচিত সাংসদদের বয়সের তুলনামূলক চিত্র

	প্রথম পার্লামেন্ট			পঞ্চম পার্লামেন্ট		
বয়স	সংখ্যা	শতকরা হার		সংখ্যা	শতকরা হার	
৫৬ এর উর্ধ্বে	১৩	৫	২৬	৬২	২১	৫৫
৪৬-৫৫	৬১	২১		১০১	৩৪	
৩৬-৪৫	১১২	৪০	৭৪	১১৩	৩৮	৪৬
৩১-৩৫	৬৩	২৩		২০	৭	
২০-৩৫	৩১	১১		৪	১	
মোট	২৮০	১০০		৩০০	১০১*	

* রাউন্ডিং এর কারণে শতকরা হার বেড়ে গেছে।

উৎস ঃ "Table-2 Members of Parliament" in Ronaq Jahan, Bangladesh Politics : Problems and Issues, Dhaka : University Press Limited, 1980, P. 146, Talukder Maniruzzaman, The Fall of the Military Dictator : 1991 Elections and the prospect of Civilian Rule in Bangladesh, See. The Journal of Pacific Affairs, Vol. 65, No. 2, Summer, 1992, P. 220.

উপর্যুক্ত সারণীতে দেখা যাচ্ছে যে, বয়সের দিক থেকে প্রথম ও পঞ্চম পার্লামেন্টের সদস্যদের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। প্রথম পার্লামেন্টে ৫৬ এর ওপরে বয়সের সদস্য ছিলেন ১৩ জন (৫%) সেখানে পঞ্চম পার্লামেন্টে এরূপ সদস্য ছিলেন ৬২ জন (২১%)। এছাড়া

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম সংসদে (৪৬-৫৫) বছর বয়সের গ্রুপে ৬১ জন (২১%) সদস্য ছিলেন। অপরদিকে পঞ্চম পার্লামেন্টে এই গ্রুপে ১০১ জন (৩৪%) সদস্য নির্বাচিত হন। তবে উভয় পার্লামেন্টেই (৩৬-৪৫) বছর বয়সের গ্রুপে সদস্য সংখ্যা সবচেয়ে বেশী এবং (২০-৩০) বছর বয়সের গ্রুপে সদস্য সংখ্যা সবচেয়ে কম নির্বাচিত হন। উল্লেখ্য যে, ১৯৯১ সালে পার্লামেন্টে মনোনীত ৩০ জন মহিলা সদস্যদের বয়সের গ্রুপে (২৫-৩০) বছর বয়সের গ্রুপে এক জন, (৩১-৩৫) বছর বয়সের গ্রুপে দু'জন, (৩৬-৪০) বছর বয়সের গ্রুপে পাঁচ জন, (৪১-৪৫) বছর বয়সসর গ্রুপে দু'জন, (৪৬-৫০) বছর বয়সের গ্রুপে পাঁচ জন, (৫১-৫৫) বছর বয়সের গ্রুপে পাঁচ জন এবং ৫৬ বছর বয়সের উর্ধ্বে ছিলো পাঁচ জন সদস্য।[১৬]

২. সদস্যদের শিক্ষার মান

শিক্ষা জাতির মেরুদন্ড। কোনো জাতিকে উন্নতির শীর্ষে পৌছতে হলে অবশ্যই সে জাতিকে শিক্ষিত হতে হবে। একটি দেশের কর্ণধার হলেন সে দেশের সরকার। কারণ সরকার যে সকল নীতি- নির্ধারণের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত প্রণয়ন করে থাকেন তার ভিত্তিতেই একটি রাষ্ট্র পরিচালিত হয়। পার্লামেন্টের সদস্যরাই হলেন এ সকল নীতি-নির্ধারণের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের অভিভাবক। একদিকে যেমন সকল সংসদ-সদস্যদের শিক্ষাগত যোগ্যতা সমান নয়; অপরদিকে রাষ্ট্রের প্রতিটি নাগরিকের জ্ঞান-অর্জনে তাঁদের শিক্ষাগত মান সম্পর্কে জানতে হয়। এই লক্ষ্যে সাংসদদের শিক্ষাগত মান সম্পর্কে অনুসন্ধান করা প্রয়োজন।

১৯৯১ সালে নির্বাচিত পঞ্চম পার্লামেন্টে সংসদ-সদস্যদের শিক্ষাগত যোগ্যতায় পোষ্টগ্রাজুয়েট ৯৬ জন (২৯.০৯%), গ্রাজুয়েট ১৫১ জন (৪৫.৭৬%), উচ্চমাধ্যমিক ৩৫ জন (১০.৬১%), মাধ্যমিক ১১ জন (৩.৩৩%), মাধ্যমিকের নিচে ৪ জন (১.২১%), অন্যান্য ১০ জন (৩.০৩%), ২৩ জন (৬.৯৭%) সদস্যের শিক্ষাগত যোগ্যতা জানা সম্ভব হয়নি। নিম্নে পঞ্চম পার্লামেন্টের সাংসদদের শিক্ষাগত মানের সাথে প্রথম পার্লামেন্টের সাংসদদের তুলনামূলক চিত্র প্রদর্শন করা হলো (দেখুন সারণী-৪.৫)।

Dhaka University Institutional Repository

সারণী-৪.৫

প্রথম ('৭৩) ও পঞ্চম ('৯১) সংসদে নির্বাচিত সাংসদদের শিক্ষাগত মানের তুলনামূলক চিত্র

শিক্ষাগত যোগ্যতা	প্রথম পার্লামেন্ট		পঞ্চম পার্লামেন্ট	
	সংখ্যা	শতকরা হার	সংখ্যা	শতকরা হার
পোষ্ট গ্রাজুয়েট	৯০	২৮.৫৭%	৯৬	২৯.০৯%
গ্রাজুয়েট	১২৭	৪০.৩২%	১৫১	৪৫.৭৬%
উচ্চ মাধ্যমিক	২৮	৮.৮৯%	৩৫	১০.৬১%
মাধ্যমিক	৩৩	১০.৪৮%	১১	৩.৩৩%
মাধ্যমিকের নিচে	৬	১.৯০%	৪	১.২১%
অন্যান্য *	১৪	৪.৪৪%	১০	৩.০৩%
অজানা	১৭	৫.৪০%	২৩	৬.৯৭%
মোট	৩১৫	১০০%	৩৩০	১০০%

* অন্যান্যদের মধ্যে ছিলেন ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার চাটার্ড একাউন্ট্যান্ট ইত্যাদি।

উৎস ঃ বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ-সদস্যদের জীবন-বৃত্তান্ত, ঢাকা, ১৯৭৫, মোস্তফা হারুন (সম্পাদক) Who's who in the parliament, সৌখিন প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৭৯, আহমদ উল্লাহ (সম্পাদনা), পঞ্চম জাতীয় সংসদ প্রামাণ্য গ্রন্থ (সংসদ-সদস্যদের জীবন-বৃত্তান্ত), সূচয়ন প্রকাশন, ঢাকা, ১৯৯২।

উপর্যুক্ত সারণীর দিকে তাকালে আমরা প্রথম ও পঞ্চম পার্লামেন্টের সদস্যদের মধ্যে গড়ে শিক্ষাগত মানের ক্ষেত্রে কিছুটা পার্থক্য দেখতে পাচ্ছি। যেমন, প্রথম পার্লামেন্টে যেখানে পোষ্ট গ্রাজুয়েট ছিলেন ৯০ জন সেখানে পঞ্চম পার্লামেন্টে এরূপ সদস্য ছিলেন ৯৬ জন, এভাবে প্রথম পার্লামেন্টে গ্রাজুয়েট ১২৭ জন, উচ্চমাধ্যমিক ২৮ জন, মাধ্যমিক ৩৩ জন, মাধ্যমিকের নিচে ৬ জন, অন্যান্য ১৪ জন। অপরদিকে পঞ্চম পার্লামেন্টে গ্রাজুয়েট ১৫১ জন, উচ্চমাধ্যমিক ৩৫ জন, মাধ্যমিক ১১ জন, মাধ্যমিকের নিচে ৪ জন, অন্যান্য ১০ জন। তবে উভয় পার্লামেন্টেই গ্রাজুয়েট সদস্য সংখ্যা বেশী ছিলো।

Dhaka University Institutional Repository

৩. সদস্যদের পেশা

একটি দেশে নির্বাচনের মাধ্যমে সাধারণতঃ সে দেশের সামাজিক অবস্থার প্রতিফলন ঘটে। কারণ যে কোনো পার্লামেন্টে বিভিন্ন পেশা ও স্বার্থগোষ্ঠীর ব্যক্তিরা সংসদ-সদস্য হিসাবে নির্বাচিত হয়ে আসেন। আর এসব স্বার্থ গোষ্ঠীর সদস্যরা পার্লামেন্টে প্রায় সকল নীতি-নির্ধারণের সময় বিশেষ করে আর্থিক নীতি-নির্ধারণের সময় নিজ নিজ গ্রুপের স্বার্থে সংসদকে প্রভাবিত করতে পারেন। এই উদ্দেশ্যে সংসদ-সদস্যদের পেশা, গোষ্ঠী ইত্যাদি সম্পর্কে অনুসন্ধান করা প্রয়োজন। নিম্নে পঞ্চম পার্লামেন্টে নির্বাচিত সংসদ-সদস্যদের পেশাগত অবস্থান সারণীর মাধ্যমে দেখানো হলো (সারণী-৪.৬)।

সারণী-৪.৬

১৯৯১ সালে জাতীয় সংসদে নির্বাচিত সদস্যদের পেশাগত অবস্থান

পেশা	সংখ্যা	মোট শতকরা হার
আইনজীবী	৫৬	১৯
ব্যবসায়ী এবং শিল্পপতি [ক]	১৬০	৫৩
সাবেক সেনা অফিসার [খ]	১৭	৬
কৃষি জীবী (Landholders)	১২	৪
ডাক্তার	৮	৩
স্কুল এবং মাদ্রাসা শিক্ষক	১২	৪
বিশ্ববিদ্যালয় এবং কলেজ শিক্ষক	১৬	৫
ছাত্রনেতা	১	১
সাংবাদিক	৬	২
সাবেক সরকারী কর্মকর্তা	৬	২
সার্বক্ষণিক রাজনীতিবিদ [গ]	৬	২
মোট	৩০০	১০১*

ক. ১৬০ জন সদস্যের মধ্যে ১৪৩ জন ব্যবসায়ী এবং ১৭ জন শিল্পপতি।

খ. এখন সবাই ব্যবসায়ী এবং শিল্পপতি।

গ. সার্বক্ষণিক রাজনীতিবিদ এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত শেখ হাসিনা, খালেদা জিয়া এবং বাংলাদেশ কম্যুনিষ্ট পার্টির (মস্কো পূর্ব) চার জন সদস্য, যাঁরা দলের রাজনীতিতে নিজদেরকে সবসময় উৎসর্গ করেছেন।

* রাউন্ডিংয়ের কারণে মোট শতকরা হারকে অতিক্রম করেছে।

উৎস ঃ Talukder Maniruzzaman, The Fall of the Military Dictator : 1991 Elections and the Prospect of Civilian Rule in Bangladesh, See : *The Journal of Pacific Affairs,* Vol. 65, No. 2, Summer 1992, P. 214.

Dhaka University Institutional Repository

উপর্যুক্ত সারণীর দিকে লক্ষ্য করলে আমরা দেখতে পাবো যে, জাতীয় সংসদের অধিকাংশ সদস্যরাই ব্যবসায়ী এবং শিল্পপতি গোত্রের, যাঁরা মোট সদস্যদের ৫৩% প্রতিনিধিত্বশীল গোষ্ঠী হিসাবে আবির্ভূত হয়েছে। বর্তমানে মোট ব্যবসায়ী ও শিল্পপতিদের অবস্থান ৫৯%, যেহেতু পূর্ববর্তী সামরিক অফিসারদেরও বর্তমানে ব্যবসায়ী ও শিল্পপতি হিসাবে গণ্য করা হয়। অন্যান্য পেশাজীবী সম্প্রদায় হচ্ছে- আইনজীবী, ডাক্তার, স্কুল শিক্ষক, কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, সাংবাদিক, ছাত্রনেতা এবং অবসরপ্রাপ্ত রাজনৈতিক কর্মকর্তা। যাঁরা এরশাদ শাসনের বিরুদ্ধে ১৯৯০-এর অক্টোবর-নভেম্বরের আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছেন, তাঁদের সংখ্যা বর্তমান সংসদে মাত্র ৩৬%।

উপর্যুক্ত বিষয়গুলো সম্পর্কে আরো পরিষ্কারভাবে আমরা ধারণা পেতে পারি যদি পূর্ববর্তী সংসদ-সদস্যদের একটি তুলনামূলক চিত্র অংকণ করি। নিম্নে ১৯৫৪, ১৯৭৩ এবং ১৯৯১ এ নির্বাচিত সংসদ-সদস্যদের পেশাগত অবস্থানের একটি তুলনামূলক চিত্র দেয়া হলো (সারণী-৪.৭)।

সারণী-৪.৭

১৯৫৪, ১৯৭৩ এবং ১৯৯১ এ আইনসভায় নির্বাচিত সাংসদদের তুলনামূলক পেশাগত অবস্থান

পেশা	১৯৫৪		১৯৭৩		১৯৯১		
	সংখ্যা	শতকরা হার	সংখ্যা	শতকরা হার	সংখ্যা	শতকরা হার	
আইনজীবী	১১৬	৫৫	৭৫	২৬	৫৬	১৯	
ব্যবসায়ী এবং শিল্পপতি	১১	৪	৬৭	২৪	১৬০	৫৩	৫৯
সাবেক সেনা অফিসার এখন ব্যবসায়ী/শিল্পপতি	-	-	-	-	১৭	৬	
কৃষিজীবি	৫৬	১৯	৫০	১৮	১২	৪	
সাবেক বেসামরিক আমলা	-	-	২	১	৬	২	
ডাক্তার	১২	৪	১৫	৫	৮	৩	
অন্যান্য	১৬	৫	২৮	১০	২৮	৯	
ধর্মীয় নেতা	২১	৭	-	-	-	-	
সাংবাদিক	১১	৪	-	-	৬	২	
সার্বক্ষণিক রাজনীতিবিদ	-	-	৩৫	১২	৬	২	
বিবিধ	৭	২	১১	৪	১	১	
মোট	২৫০	১০০	২৮৩	১০০	৩০০	১০১*	

* রাউন্ডিং-এর কারণে মোট শতকরা হারকে অতিক্রম করেছে।

উৎস ঃ Talukder Maniruzzaman, The Fall of the Military Dictator : 1991 Elections and the Prospect of Civilian Rule in Bangladesh, See : *The Journal of Pacific Affairs,* Vol. 65, No. 2, Summer, 1992, P. 214.

Dhaka University Institutional Repository

উপর্যুক্ত সারণীতে দেখা যাচ্ছে ১৯৫৪ সালে আইনজীবীদের সংখ্যা ছিলো ৫৫% তা ১৯৭৩ সালে গিয়ে দাঁড়ায় ২৬% এবং ১৯৯১ সালে কমে গিয়ে হয় মাত্র ১৯%। অন্যদিকে, ব্যবসায়ী এবং শিল্পপতির সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে যথাক্রমে ১৯৫৪ সালের ৪% হতে ১৯৭৩ সালে ২৪% এবং ১৯৯১ সালে ৫৯% হয়। আবার কৃষিজীবী সদস্যদের সংখ্যা ক্রমশঃ কমে গিয়ে যথাক্রমে ১৯৫৪ সালে ১৯%, ১৯৭৩ সালে ১৮% এবং ১৯৯১ সালে হয় ৪%।

৪. সাংসদদের রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা

পত্রিকার পাতা খুলে কোনো চাকরির বিজ্ঞপ্তির দিকে তাকাতেই প্রথমে চোখে পরে পূর্ব অভিজ্ঞতা প্রয়োজন। এর পিছনে প্রধানতঃ যে কারণ তা'হলো কোনো প্রতিষ্ঠানের একজন অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ব্যক্তি ঐ প্রতিষ্ঠানের কর্মকান্ড যতটা সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করতে পারবে, অনুরূপ একজন অনভিজ্ঞ ব্যক্তির পক্ষে তা সম্ভব নয়। আর এজন্যই সকল প্রতিষ্ঠানে কর্মকর্তা নিয়োগ করার পর তাদেরকে শিক্ষানবীশ ট্রেনিং প্রদান করে অভিজ্ঞ করে তোলা হয়। যে কোনো পার্লামেন্টে রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ব্যক্তিরা সংসদ-সদস্য নির্বাচিত হলে একদিকে যেমন পার্লামেন্টের কার্য সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করা সম্ভব হয়, অপরদিকে দেশের সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সমস্যাগুলোর সাথে দীর্ঘদিন ধরে জড়িত থাকায় তাঁদের মধ্যে একটা নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গী ও রাজনৈতিক অঙ্গীকার গড়ে ওঠে। পঞ্চম পার্লামেন্টে নির্বাচিত সাংসদদের রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা বিশ্লেষণ থেকে দেখা যায় তাঁরা বিভিন্ন সময়ে ও বিভিন্ন রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে রাজনীতিতে প্রবেশ করেছে। ফলে সংসদ-সদস্যদের রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা বিভিন্ন গ্রুপে বিভক্ত করে যে তথ্য বের হয়ে আসছে তাতে দেখা যাচ্ছে যে, (০-৫) বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ব্যক্তি ২১ জন (৬.৩৬%), এরূপ পর্যায়ক্রমে (৬-১১) বছরের ১৫ জন (৪.৫৫%), (১২-১৭) বছরের ৩৮ জন (১১.৫২%), (১৮-২৩) বছরের ৫০ জন (১৫.১৫%), (২৪-২৯) বছরের ৬৭ জন (২০.৩০%), (৩০-৩৫) বছরের ৪৩ জন (১৩.০৩%), (৩৬-৪১) বছরের ২৮ জন (৮.৪৮%), (৪২-৪৭) বছরের ১৬ জন (৪.৮৫%), (৪৮-৫৩) বছরের ৪ জন (১.২১%), ৫৪ বছরের উর্ধ্বে রাজনৈতিক অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ব্যক্তি ৬ জন (১.৮২%) এবং ৪২ জন (১২.৩৩%) সাংসদের রাজনৈতিক অভিজ্ঞতার কোনো তথ্য পাওয়া যায় নি।

অভিজ্ঞতার দিক থেকে (২৪-২৯) বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন সদস্য সবচেয়ে বেশী ছিলো। উল্লেখ্য যে, অভিজ্ঞ সদস্যদের অধিকাংশই ছিলেন বিরোধী দলের। নিম্নে পঞ্চম পার্লামেন্টের সাংসদদের রাজনৈতিক অভিজ্ঞতার চিত্র দেয়া হলো (সারণী-৪.৮)।

Dhaka University Institutional Repository

সারণী-৪.৮

পঞ্চম পার্লামেন্টে নির্বাচিত সাংসদদের রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা

রাজনৈতিক অভিজ্ঞতার কাল	সংখ্যা	শতকরা হার
০-৫	২১	৬.৩৬%
৬-১১	১৫	৪.৫৫%
১২-১৭	৩৮	১১.৫২%
১৮-২৩	৫০	১৫.১৫%
২৪-২৯	৬৭	২০.৩০%
৩০-৩৫	৪৩	১৩.০৩%
৩৬-৪১	২৮	৮.৪৮%
৪২-৪৭	১৬	৪.৮৫%
৪৮-৫৩	৪	১.২১%
৫৪ এর উর্ধ্বে	৬	১.৮২%
অজানা *	৪২	১২.৭৩%
মোট	৩৩০	১০০%

উৎস ঃ আহমদ উল্লাহ (সম্পাদনা), পঞ্চম জাতীয় সংসদ প্রামাণ্য গ্রন্থ (সংসদ-সদস্যদের জীবন-বৃত্তান্ত), সূচয়ন প্রকাশন, ঢাকা, ১৯৯২।

৫. সাংসদদের সংসদীয় অভিজ্ঞতা

যে কোনো রাজনৈতিক ব্যবস্থায় অভিজ্ঞ সংসদ-সদস্যরাই সংসদকে কার্যকর করার ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা প্রদান করতে পারেন। সংসদ-সদস্যদের রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা যেমন প্রয়োজন রয়েছে তদ্রুপ পার্লামেন্টারিয়ান হিসাবেও অভিজ্ঞতার প্রয়োজন রয়েছে। পঞ্চম পার্লামেন্টে নির্বাচিত ৩০০ জন সংসদ-সদস্য ও মনোনীত ৩০ জন মহিলা সদস্যদের অভিজ্ঞতা বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, ৭০ (২১.২১%) জনের পার্লামেন্টারিয়ান হিসেবে পাঁচ বছরের, ৩৪ (১০.৩০%) জনের দশ বছরের, ১২ (৩.৬৪%) জনের পনেরো বছরের, ৬ (১.৮২%) জনের বিশ বছরের এবং ১ (০.৩০%) জনের ৩০ বছরের অভিজ্ঞতা ছিলো। এ সংসদের ২০৪ (৬১.৮২%) জন সদস্যের সংসদীয় হিসেবে কোনো অভিজ্ঞতা ছিলো না। ৩ জন সদস্যের কোনো তথ্য পাওয়া যায় নি। প্রথম পার্লামেন্ট সদস্যদের সাথে

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম পার্লামেন্ট সদস্যদের সংসদীয় অভিজ্ঞতার একটি তুলনামূলক আলোচনা থেকে দেখা যায় যে, পঞ্চম পার্লামেন্টের সদস্যদের এক্ষেত্রে অভিজ্ঞতা কম ছিলো (দেখুন সারণী-৪.৯)।

সারণী-৪.৯

প্রথম ও পঞ্চম পার্লামেন্টে নির্বাচিত সাংসদদের সংসদীয় অভিজ্ঞতার অবস্থান

অভিজ্ঞতার কাল	প্রথম পার্লামেন্ট	পঞ্চম পার্লামেন্ট
শূন্য	১২৭ (৪০.৩৩%)	২০৪ (৬১.৮২%)
পাঁচ বছর	১৬০ (৫০.৭৯%)	৭০ (২১.২১%)
১০ বছর	২৩ (৭.৩০%)	৩৪ (১০.৩০%)
১৫ বছর	৫ (১.৫৮%)	১২ (৩.৬৪%)
২০ বছর	-	৬ (১.৮২%)
৩০ বছর * ১	-	১ (০.৩০%)
অজানা * ২	-	৩ (০.৯১%)
মোট	৩১৫ (১০০%)	৩৩০ (১০০%)

* ১ মিজানুর রহমান চৌধুরী (রংপুর-৫)।

* ২ মনোনীত মহিলা সদস্য।

উৎস ঃ আহমদ উল্লাহ (সম্পাদনা), পঞ্চম জাতীয় সংসদ প্রামাণ্য গ্রন্থ (সংসদ-সদস্যদের জীবন-বৃত্তান্ত), সূচয়ন প্রকাশন, ঢাকা, ১৯৯২, বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ-সদস্যদের জীবন-বৃত্তান্ত, ঢাকা, ১৯৭৫, মোস্তফা হারুন (সম্পাদক), Who's who in the Parliament, ঢাকা, সৌখিন প্রকাশনী, ১৯৭৯।

উপর্যুক্ত সারণীতে দেখা যাচ্ছে যে, যেখানে প্রথম পার্লামেন্টে ৩১৫ সদস্যের মধ্যে ১২৭ (৪০.৩৩%) জনের অভিজ্ঞতা ছিলো না, সেখানে পঞ্চম পার্লামেন্টে ৩৩০ সদস্যের মধ্যে ২০৪ (৬১.৮২%) অভিজ্ঞতা ছিলো না। এ থেকে প্রমাণিত হচ্ছে যে, সময় ও যুগের পরিবর্তনের সাথে সাথে কম্পিউটার যুগের পৃথিবী অনেক এগিয়ে গেলেও বাংলাদেশের পার্লামেন্ট জাতীয় সংসদের সাংগঠনিক উন্নয়ন ক্রমশঃ পিছিয়ে যাচ্ছে। অবশ্য এর পশ্চাতে অনেক কারণ রয়েছে। প্রথম পার্লামেন্টে ক্ষমতাসীন আওয়ামীলীগ ছিলো একটি পুরাতন ঐতিহ্যবাহী দল। দীর্ঘ সংগ্রাম পেরিয়ে দলটি ১৯৭১ সালে ক্ষমতায় আসে। সুতরাং প্রথম পার্লামেন্টের সদস্যদের মধ্যে সাধারণ দলীয়

Dhaka University Institutional Repository

আনুগত্যবোধ ও রাজনৈতিক অঙ্গীকার ছিলো। অপরদিকে, দলীয় নেতা-নেত্রীদের রাজনৈতিক ও সংসদীয় অভিজ্ঞতা বিচার-বিবেচনা করে নির্বাচনের প্রার্থী হিসেবে মনোনীত করা হতো। তাই প্রথম পার্লামেন্টে স্যাংসদদের সংসদীয় অভিজ্ঞতা বেশী ছিলো। ১৯৭৫ সালের সামরিক অভ্যুত্থানের পর বাংলাদেশের রাজনীতিতে ব্যাপক পরিবর্তন ঘটে। অন্যান্য দেশের ন্যায় বাংলাদেশেও সামরিক শাসকগণ 'বেসামরিকীকরণ' এর লক্ষ্যে তাঁদের নেতৃত্বে নতুন দল বি.এন.পি ও জাতীয় পার্টি গঠন করেন। বহু অবসারপ্রাপ্ত সামরিক ও বেসামরিক অফিসার এই সব দলে যোগদান করেন। তাছাড়া, মন্ত্রীত্বসহ সরকারী বিভিন্ন সুযোগ সুবিধার বিনিময়ে বিভিন্ন দলের নেতা ও কর্মীরা এসব দলে যোগ দেন। এক্ষেত্রে বিশ্লেষণ করে দেখা যাচ্ছে যে, কিছু কিছু নেতারা সুবিধাবাদী দলের ন্যায় যখন যে দলে সুবিধা পেয়েছেন তখন সেই দলে যোগ দিতে কুণ্ঠিত বোধ করেন নি। বি.এন.পিও জাতীয় পার্টির গঠনকাল ১২ ও ৬ বছর অতিবাহিত হলেও পঞ্চম পার্লামেন্টে সদস্যদের রাজনৈতিক ও সংসদীয় অভিজ্ঞতা বিশ্লেষন থেকে দেখা যায় যে, আওয়ামীলীগের সাংসদদের তুলনায় এ দু'দলের অভিজ্ঞতা কম। সাংসদদের পেশাগত বিশ্লেষণ থেকে এরূপ ক্ষেত্রে যে বিষয়টি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ তা হচ্ছে সকল দলীয় প্রধানরা নির্বাচনে জয়লাভের জন্য তাঁদের মনোনীত প্রার্থীদের তালিকায় দলীয় নেতা-নেত্রীদের অভিজ্ঞতার গুরুত্ব না দিয়ে যারা যত বিত্তশালী তাঁদেরই মনোনয়ন প্রদান করে থাকেন। ফলস্বরূপ প্রথম পার্লামেন্টে যেখানে ব্যবসায়ী এবং শিল্পপতি সদস্যসংখ্যা ২৪% সেখানে পঞ্চম পার্লামেন্টে এরূপ সংখ্যা ছিলো ৫৯%। প্রেক্ষাপটে পার্লামেন্টে সংসদীয় অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ব্যক্তি ক্রমশঃ হ্রাস পেয়েছে।

৬. বিভিন্ন দলের সাংসদদের রাজনৈতিক অতীত

পঞ্চম পার্লামেন্টে বিভিন্ন দলের সদস্যদের রাজনৈতিক অতীত বিশ্লেষণ থেকে দেখা যাচ্ছে যে, কোনো দলেরই সকল সদস্যরা নিরবিচ্ছিন্নভাবে একই দলের সদস্য নয়। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন দলের সদস্যরা নিজ নিজ সুবিধাভোগ কিংবা ভিন্ন দলের আদর্শকে অধিকতর গ্রহণযোগ্য মনে করে দল পরিবর্তন করেছেন (দেখুন সারণী-৪.১০)।

Dhaka University Institutional Repository

সারণী-৪.১০

পঞ্চম পার্লামেন্টে নির্বাচিত সাংসদদের রাজনৈতিক অতীত

পূর্বের রাজনৈতিক সম্পর্ক	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল	আওয়ামীলীগ	জাতীয় পার্টি	জামাত-ই-ইসলাম
আওয়ামীলীগ	২৫	৫৬	১৭	১
বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল	৪০	-	৩	-
জাতীয় পার্টি	-	-	৪	-
জামাত-ই-ইসলামী	১	-	-	১৬
ইউনিয়ন	২৪	৮	৫	-
মুসলিম লীগ	৯	৫	১	২
ন্যাপ (ভাসানী)	৮	১	১	-
ডেমোক্রেটিক লীগ	২	১	-	-
জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল	২	-	১	-
স্বতন্ত্র	২	১	১	-
পূর্ব বাংলার কম্যুনিষ্ট পার্টি	১	১	-	-
ছাত্র কংগ্রেস	-	১	-	-
যুক্তফ্রন্ট	-	-	-	১
জাতীয় লীগ	-	১	-	-
অরাজনৈতিক ব্যক্তি	১২	৪	-	-
অন্যান্য *	৬	-	-	-
অজানা	৩৭	৯	২	-

* অন্যান্য দল ও ছাত্র সংগঠনের মধ্যে ছিলো-শ্রমিক ফেডারেশন, ন্যাশনাল স্টুডেন্ট ফেডারেশন, ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট, ছাত্রশক্তি, জাতীয়লীগ, ইউনাইটেড পিপলস পার্টি।

উৎস ঃ আহমদ উল্লাহ (সম্পাদনা), পঞ্চম জাতীয় সংসদ প্রামাণ্য গ্রন্থ (সংসদ-সদস্যদের জীবন-বৃত্তান্ত), সূচয়ন প্রকাশন, ঢাকা, ১৯৯২।

সাংসদদের আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক বিশ্লেষণ থেকে দেখা যাচ্ছে যে, কয়েক দশক পূর্বে এ দেশের ব্যবসায়ী মহল ছিলেন রাজনীতির প্রশ্নে প্রায় নির্লিপ্ত। হাতে গোণার মত কয়েকজন ছাড়া অধিকাংশ ব্যবসায়ীই রাজনীতিবিদদের সমর্থন ও সহযোগিতা করলেও সক্রিয় রাজনীতির সাথে

Dhaka University Institutional Repository

জড়িত হতে আগ্রহী হতেন না। রাজনীতি রাজনীতিবিদদের পেশাগত ব্যাপার বলেই তাঁরা মনে করতেন। অপরদিকে কৃষিজীবীদের রাজনীতির ব্যাপারে যথেষ্ট আগ্রহ ছিলো। আজ সংসদে তাদের অবস্থান বিলীন হয়ে যাচ্ছে। এর মূলে টাকার কাছে হেরে যাচ্ছে যোগ্যতার মাপকাঠি। আর এই সুযোগ ক্রমশঃ দখল করে নিয়েছে ব্যবসায়ী শিল্পপতিগোষ্ঠী।

জাতীয় স্বাধীনতার কারণে আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে যে দ্রুত পরিবর্তন হয়েছে তা আমাদের ব্যবসায়ীদের মন ও মানসিকতায় দ্রুত পরিবর্তন আনতে সক্ষম হয়েছে। ব্যবসায়ীরা এখন শুধু টাকা রোজগার করেই তুষ্ট নন, তাঁরা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার অংশীদারিত্বেও আগ্রহী। তাঁরা সংসদে যেতে চান, মন্ত্রী হয়ে ব্যবসা-বাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধি করতে আগ্রহী। ক্ষমতায় গিয়ে ব্যবসা করতে পারলে যে রাতারাতি সীমাহীন সম্পদ আহরণ করা সম্ভব, তা তাঁরা অভিজ্ঞতার আলোকেই উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছেন।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্য নির্দেশ ও টীকা

১. নির্বাচনী ইস্তেহার, দৈনিক ইত্তেফাক, ৭ ফেব্রুয়ারী, ১৯৯১।

২. ঐ, ২৯ জানুয়ারী, ১৯৯১।

৩. ঐ, ১ ফেব্রুয়ারী, ১৯৯১।

৪. একে,এম, শহীদুল্লাহ, "বাংলাদেশ সংসদীয় নির্বাচন-১৯৯১" দ্রষ্টব্যঃ অধ্যাপক এমাজউদ্দীন আহমদ সম্পাদিত, বাংলাদেশে সংসদীয় গণতন্ত্র প্রাসঙ্গিক চিন্তাভাবনা, করিম বুক করপোরেশন, ঢাকা, মে ১৯৯২, পৃষ্ঠা ঃ ২৩।

৫. ঐ।

৬. ঐ।

৭. ঐ।

৮. ঐ।

৯. ডঃ আবুল ফজল হক, বাংলাদেশের রাজনীতি ঃ সংঘাত ও পরিবর্তন, সুদীপ্ত প্রিন্টার্স এ্যান্ড প্যাকেজেস লিঃ, ঢাকা, জানুয়ারী, ১৯৯৪, পৃষ্ঠা ঃ ৩৪২।

১০. ডঃ আবুল ফজল হক, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ঃ ৩৫৯।

১১. ১৯৭৩ সালে আওয়ামীলীগ ক্ষমতাসীন থাকাকালে, ১৯৭৯-তে বি.এন.পির শাসনামলে আর জেনারেল এরশাদের সাড়ে আট বছরের শাসনামলে ১৯৮৬ ও ১৯৮৮-তে জাতীয় সংসদের অপর চারটি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।

১২. সাপ্তাহিক হলিডে, ১১ এপ্রিল, ১৯৮৬।

১৩. দি নিউ নেশন, ৮ মে, ১৯৮৬।

১৪. আহমদ উল্লাহ (সম্পাদনা), পঞ্চম জাতীয় সংসদ প্রামাণ্য গ্রন্থ, সূচয়ন প্রকাশন, ঢাকা, ১৯৯২, পৃষ্ঠা ঃ ৩১/নি

১৫. Talukder Maniruzzaman and U.A.B Razia Akter Banu, "Civilian Succession and 1981 Presidential Election in Bangladesh", in Peter Lyon and James, Manor (eds), Transfer and Transformation : Political Institutions in Commonwealth, Leicester : Leicester University Press, 1983, P. 129.

১৬. আহমদ উল্লাহ (সম্পাদনা), পঞ্চম জাতীয় সংসদ প্রামাণ্য গ্রন্থ (সংসদ সদস্যদের জীবন-বৃত্তান্ত), সূচয়ন প্রকাশন, ঢাকা, ১৯৯২ থেকে সংগৃহীত।

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম অধ্যায়

পঞ্চম সংসদের কার্যকলাপ

গণতান্ত্রিক রাজনীতির মূল কেন্দ্র হিসাবে এবং রাষ্ট্র পরিচালনায় স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠার শ্রেষ্ঠতম প্রতিষ্ঠান হিসাবে জাতীয় সংসদের কার্যাবলী নিঃসন্দেহে অতীব গুরুত্বপূর্ণ। ১৯৯১ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারী বাংলাদেশের ইতিহাসে সবচেয়ে অবাধ ও সুষ্ঠ নির্বাচনের মধ্য দিয়ে পঞ্চম জাতীয় সংসদ গঠিত হয়। স্থায়িত্ব ও কার্যক্রমের ব্যাপকতায় এবং সরকারী ও বিরোধী দলের সংখ্যাগত অবস্থানের নৈকট্যে এই সংসদ অতীতের সংসদগুলোকে অতিক্রম করেছে। ১৯৯১'র ৫ এপ্রিল থেকে ১৯৯৫'র ১৮ নভেম্বর পর্যন্ত ২২টি অধিবেশনে মোট ৪০১ কার্যদিবসে ১৮৩৮.১২ ঘন্টা এ সংসদ বৈঠকে বসেছে। তন্মধ্যে সরকারী কার্যাবলী ৩৩৩ দিন এবং বেসরকারী সদস্যদের কার্যাবলী ৬৮ দিন ছিলো। প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ সংসদের কার্যদিবসের সংখ্যা ছিলো যথাক্রমে ১৩৪,২০৬,৭৫ ও ২০৮।

পঞ্চম সংসদে সরকার পদ্ধতি পরিবর্তনের জন্য সর্বসম্মতভাবে সংবিধান-সংশোধন বিল গ্রহণ করে এবং এর পরিপ্রেক্ষিতে দেশে সাংবিধানিক প্রশ্নে গণভোট অনুষ্ঠিত হয় প্রথমবারের মতো। সংসদ সচিবালয় বিল গ্রহণের মধ্য দিয়ে এই সংসদ স্বতন্ত্র সংসদ সচিবালয় প্রতিষ্ঠা করে, যার দরুন সংবিধানের ৭৯ অনুচ্ছেদ প্রথমবারের মতো কার্যকর হয়। পঞ্চম সংসদে প্রথম পিটিশন কমিটি গঠন করা হয় এবং ৩৯টি পিটিশন সংসদের গোচরীভূত ও সংশ্লিষ্ট কমিটিতে প্রেরিত হয়। উল্লেখ, স্পীকার মোট ১৩টি রুলিং / সিদ্ধান্ত প্রদান করেন।

ঘটনাবহুল পঞ্চম সংসদে কার্যপ্রণালী বিধির ২৯৬ বিধির আওতায় মোট ৫ বার বিভক্তি ভোট অনুষ্ঠিত হয়। সংবিধানের একাদশ ও দ্বাদশ সংশোধনী বিল গ্রহণকালে ৪ বার এবং মন্ত্রীসভার বিরূদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাবের ওপর ভোট গ্রহণকালে একবার। অনাস্থা প্রস্তাবটি ১৬৮-১২১ ভোটে সংসদ কর্তৃক নাকচ হয়ে যায়।

পঞ্চম সংসদে বিরোধী দলীয় ও স্বতন্ত্র সদস্যগণ দ্বারা পৃথকভাবে মোট ৬২ বার ওয়াক আউট এর ঘটনা ঘটে। এই সংসদের মোট ১৬ জন সদস্যের ক্ষেত্রে দল বদল(ফ্লোর ক্রসিং) এর ঘটনা ঘটে। তিন জনের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট দল ব্যবস্থা গ্রহণ করায় তাঁদের আসন শূন্য ঘোষিত হয়।

এয়োদশ অধিবেশন চলাকালে ১৯৯৪'র ১মার্চ তদানীন্তন তথ্যমন্ত্রীর একটি উক্তিকে কেন্দ্র করে বিরোধী দলীয় সদস্যরা ওয়াক আউট করেন। এ ওয়াক আউট অধিবেশন বর্জনে পরিণত হয়

Dhaka University Institutional Repository

এবং ২৮ ডিসেম্বর ১৯৯৪ বিরোধী দলীয় সদস্যদের পদত্যাগ, সংসদে ৯০ কার্যদিবস তাঁদের অনুপস্থিতি প্রসঙ্গে সুপ্রীম কোর্টের কাছে প্রেসিডেন্টের ব্যাখ্যা আহবান, তাঁদের আসন শূন্য ঘোষণা এবং শূন্য আসনসমূহে উপ-নির্বাচন অনুষ্ঠানের প্রক্রিয়ায় প্রধানমন্ত্রীর লিখিত পরামর্শের ভিত্তিতে ২৪ নভেম্বর ১৯৯৫ রাষ্ট্রপতি কর্তৃক সংসদ বিলুপ্ত পর্যন্ত ১১৮ কার্যদিনে সংসদ ছিলো বিরোধী দল শূন্য। এ অধ্যায়ে বিরোধী দল সংসদে উপস্থিত থাকাকালীন পার্লামেন্টে কতটুকু কাজ হয়েছে এবং একাধিক্রমে সংসদ বর্জন ও পদত্যাগের পর কি পরিমান কাজ হয়েছে তা পৃথকভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। তবে সারণীর মাধ্যমে পঞ্চম পার্লামেন্টের সম্পূর্ণ কাজের খতিয়ান দেখানো হয়েছে।

আইন প্রণয়ন

প্রত্যেক দেশের আইনসভার মুল কাজ হচ্ছে আইন প্রণয়ন করা। আইনসভার প্রণীত আইন দ্বারা রাষ্ট্রের অন্যান্য সংস্থাগুলো নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে। অন্যান্য দেশের ন্যায় বাংলাদেশ পার্লামেন্টের ওপর আইন প্রণয়ন করার কঠিন দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে। দেশের জন্য আইন প্রণয়ন কাজে বাংলাদেশ পার্লামেন্ট অধিকাংশ সময় ব্যয় করে।

বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, পৃথিবীর প্রায় সব দেশেই পার্লামেন্ট-সদস্যদের আইন সংক্রান্ত প্রস্তাব বা বিল উত্থাপনের অধিকার রয়েছে। তবে বাস্তবে, বিশেষ করে ব্রিটিশ মডেলের সরকার পদ্ধতিতে সাধারণ সদস্যগণ কর্তৃক এই অধিকারের প্রয়োগ খুব কমই দেখা যায়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মতো রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকারগুলোতে আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে বেসরকারী উদ্যোগের একটা প্রাচুর্য পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু সংসদীয় পদ্ধতির সরকার ব্যবস্থায় মূলতঃ তিনটি কারণে বেসরকারী সদস্যদের উক্ত অধিকার প্রয়োগ করা সম্ভব হয় না। প্রথমতঃ বেসরকারী সদস্যদের বিলগুলো টেকনিক্যাল গাইডেন্স হতে বঞ্চিত; দ্বিতীয়তঃ আধুনিক কালে দলীয় সরকার ব্যবস্থা প্রচলিত হবার ফলে সংসদ-সদস্যরা দলীয় মন্ত্রীদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হন; তৃতীয়তঃ বেসরকারী কাজের জন্য পার্লামেন্টের কার্যসূচীতে পর্যাপ্ত সময়ের অভাব। বিশ্বের অন্যান্য দেশের ন্যায় বাংলাদেশের পার্লামেন্টেও বেসরকারী সদস্যদের বিল উত্থাপনের সুযোগ রয়েছে। পঞ্চম সংসদে বেসরকারী সদস্যদের উদ্যোগে মোট ৮২টি সাধারণ বিলের নোটিশ পাওয়া যায়। তন্মধ্যে ১২টি বিল সংসদে উত্থাপিত হয়। উত্থাপিত বিলগুলোর মধ্যে ১টি বিল অষ্টম অধিবেশনে সর্বসম্মতিক্রমে সংসদে গৃহীত হয়। গৃহীত বিলটি -"The Members of Parliament (Remuneration and Allowances) (Amendment) Bill, 1993"

পঞ্চম জাতীয় সংসদে সরকারী উদ্যোগে মোট ২০৯টি সাধারণ বিলের নোটিশ পাওয়া যায়। এর মধ্যে ১৮৪টি বিল সংসদে উত্থাপিত হয়। উত্থাপিত বিলগুলোর মধ্যে আটটি সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীরা স্বেচ্ছায় প্রত্যাহার করে নেন, একটি তামাদি, একটি অনিষ্পন্ন রয়ে যায় এবং একটি সম্পর্কে তথ্য

Dhaka University Institutional Repository

পাওয়া যায়নি। ফলে পার্লামেন্টে মোট ১৭২টি সরকারী বিল পাস হয় (দেখুন সারণী-৫.১)। বিশেষ দ্রষ্টব্য যে, বিরোধী দলের একাধিক্রমে সংসদ বর্জন ও পদত্যাগের পর ৫৩টি বিল পাস হয়।

সারণী ৫.১

পঞ্চম সংসদে উত্থাপিত ও গৃহীত সরকারী সাধারণ বিলের অধিবেশন-ওয়ারী সংখ্যা

অধিবেশন	প্রাপ্ত নোটিশের সংখ্যা	সংসদে উত্থাপিত বিলের সংখ্যা	সংসদে পাসকৃত বিলের সংখ্যা
প্রথম অধিবেশন (০৫.০৪.৯১-১৫.০৫.৯১)	৩০	২৩	১৮
দ্বিতীয় অধিবেশন (১১.০৬.৯১-১৪.০৮.৯১)	১১	১১	১০
তৃতীয় অধিবেশন (১২.১০.৯১-০৫.১১.৯১)	১২	১১	৪
চতুর্থ অধিবেশন (০৪.০১.৯২-১৮.০২.৯২)	১৬	১৩	১৮
পঞ্চম অধিবেশন (১২.০৪.৯২-১৯.০৪.৯২)	১	১	০
ষষ্ঠ অধিবেশন (১৮.০৬.৯২-১৩.০৮.৯২)	২৯	২৬	১৮
সপ্তম অধিবেশন (১১.১০.৯২-০৬.১১.৯২)	১৫	১৪	১৮
অষ্টম অধিবেশন (০৩.০১.৯৩-১১.০৩.৯৩)	১০	১০	১১
নবম অধিবেশন (০৯.০৫.৯৩-১৩.০৫.৯৩)	৬	৪	০
দশম অধিবেশন (০৬.০৬.৯৩-১৫.০৭.৯৩)	১০	৯	৯
একাদশ অধিবেশন (১২.০৯.৯৩-২৭.০৯.৯৩)	৫	৪	৬
দ্বাদশ অধিবেশন (২১.১১.৯৩-০৮.১২.৯৩)	৬	৫	৭
ত্রয়োদশ অধিবেশন (০৫.০২.৯৪-০৭.০৩.৯৪)	৭	৬	২
চতুর্দশ অধিবেশন (০৪.০৫.৯৪-১২.০৫.৯৪)	৩	২	৬
পঞ্চদশ অধিবেশন (০৬.০৬.৯৪-১১.০৭.৯৪)	১০	৯	৭
ষষ্ঠদশ অধিবেশন (৩০.০৮.৯৪-১৪.০৯.৯৪)	২	২	৪
সপ্তদশ অধিবেশন (১২.১১.৯৪-০৮-১২.৯৪)	৬	৬	৭
অষ্টাদশ অধিবেশন (২৩.০১.৯৫-২৩.০২.৯৫)	১২	১১	৯
ঊনিশতম অধিবেশন (২৪.০৪.৯৫-২৭.০৪.৯৫)	২	২	১
বিশতম অধিবেশন (১৫.০৬.৯৫-১১.০৭.৯৫)	৯	৯	৮
একুশতম অধিবেশন (০৬.০৯.৯৫-২৬.০৯.৯৫)	৫	৫	৮
বাইশতম অধিবেশন (১৫.১১.৯৫-১৮.১১.৯৫)	২	১	১
মোট	২০৯	১৮৪	১৭২

উৎসঃ বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ, জাতীয় সংসদের কার্যবাহের সারাংশ, ২২ খন্ড।

Dhaka University Institutional Repository

অধ্যাদেশের মাধ্যমে আইন প্রণয়ন

জাতীয় সংসদের অধিবেশন না থাকাকালে রাষ্ট্রপতির নিকট আশু ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় পরিস্থিতি বিদ্যমান রয়েছে বলে সান্তাষজনকভাবে প্রতীয়মান হলে রাষ্ট্রপতি উক্ত পরিস্থিতি মোকাবেলা করার জন্য সংবিধানের ৯৩ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী প্রয়োজনীয় অধ্যাদেশ জারি করতে পারেন এবং অনুরূপ অধ্যাদেশ আইনের ন্যায় বলবৎ হয়। তবে অধ্যাদেশসমূহ অনুমোদনের জন্য সংসদের পরবর্তী প্রথম বৈঠকে পেশ করতে হয়। কোনো অধ্যাদেশ সংসদে উপস্থাপনের ৩০দিন অতিবাহিত হবার পর এর কার্যকারিতা লোপ পায়। ভারতসহ অনেক দেশেই রাষ্ট্রপতির এ ধরনের অধ্যাদেশ জারি করার ক্ষমতা রয়েছে। তবে এ ক্ষমতা কার্যকরভাবে প্রয়োগ করা হতো কিনা তাই লক্ষণীয় বিষয়।

পঞ্চম সংসদীয় আমলে রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শক্রমে ১০০টি অধ্যাদেশ জারি করেন। এর মধ্যে ৮২টি অধ্যাদেশ সংসদে বিল আকারে উত্থাপিত হয়। উত্থাপিত অধ্যাদেশগুলোর মধ্যে ৫৭টি অধ্যাদেশ বিল সংসদে পাস হয়। তাহলে দেখা যাচ্ছে, পঞ্চম পার্লামেন্টে পাসকৃত ১৭৩ টি সাধারণ বিলের মধ্যে ৫৭টিই ছিলো অধ্যাদেশ বিল এবং ১১৬টি ছিলো মৌলিক বিল। অধ্যাদেশগুলো বিল আকারে সংসদে উত্থাপিত হলেও যেহেতু সেগুলো আইন হিসাবে ইতোপূর্বে বলবৎ হয়েছে, সেহেতু সেগুলোর ওপর আলোচনা করা এবং সংশোধনী আনার সুযোগ থাকে সীমিত।

384756

রাষ্ট্রপতি অধ্যাদেশ জারি করার ক্ষমতার সুযোগ নিয়ে জরুরী নয়, এমন কিছু আইনও সংসদকে পাস কাটিয়ে জারি করেন এবং পরে পাস করিয়ে নেয়া হয়। যেমন, রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী, উপমন্ত্রী, স্পীকার ও ডেপুটি স্পীকারের বেতন, ভাতা ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা দেয়ার জন্য অর্ডিন্যান্স জারি ও পাস করিয়ে নেয়া।[১] অধ্যাদেশের দ্বারা প্রণীত পনেরটি আইনের ওপর বিরোধী সংসদ -সদস্যরা ব্যাপক ভাবে সমালোচনা ও বিরোধিতা করে বিভিন্ন সময়ে ওয়াক আউট করেন।[২] সন্ত্রাসমূলক অপরাধ দমন বিল উত্থাপনের বিরোধিতা করে প্রধান বিরোধী দলের নেত্রী শেখ হাসিনা বলেন, আজকে যে বিলটি আনা হয়েছে এর সব কিছু যদি পরীক্ষা- নিরীক্ষা করা যায় তাহলে একটা কথাই প্রতীয়মান হয় যে, এটা সম্পূর্ণভাবে অসাংবিধানিক, অগণতান্ত্রিক, মানবতা বিরোধী, জাতিসংঘের স্বীকৃত মানবাধিকারের সম্পূর্ণ পরিপন্থী।[৩] এই বিল পাশের বিরোধিতা করে সিদ্ধান্ত প্রস্তাব আনেন কর্ণেল (অবঃ) শওকত আলী। তিনি বলেন, সন্ত্রাস হঠাৎ করেই শুরু হয়নি। এর ওপর অধ্যাদেশ জারি না করে সংসদে বিল এনে আইন পাস করতে পারত। কারণ তাঁদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা আছে। This is not Democracy. This is not Parliamentary Democracy.[৪] The local Government (Upazila Prishad and Upazila Administration reorganisation1992).

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Dhaka University Institutional Repository

বিলটির ওপর অধ্যাদেশ জারি করায় আব্দুর রাজ্জাক বলেন, বিগত স্বৈরাচার সরকার অর্ডিন্যান্সের মাধ্যমে যে আইনটি করেছিলেন, আবার অর্ডিন্যান্সের মাধ্যমে এই উপজেলা পরিষদ বাতিল করায় জনগণ উভয় সরকারের মধ্যে কোনো তফাৎ দেখতে পাচ্ছে না। ইহা পার্লামেন্টকে একটি রাবার ষ্ট্যাম্পে পরিণত করার প্রচেষ্টা।[৫] পৌরসভা অধ্যাদেশে বিল পাসের বিরোধিতা করে এবাদুর রহমান চৌধুরী এ সরকারকে "অধ্যাদেশ সরকার" নামে অভিহিত করেন।[৬]

সংসদে আলোচনা

সংসদে কোনো বিল আলাপ- আলোচনার মাধ্যমে গৃহীত হলে সেখানে সাংসদগণ বিশেষ করে বিরোধী দলীয় সদস্যরা একদিকে যেমন তাঁদের মতামত ব্যক্ত করার সুযোগ পান, অন্য দিকে এভাবে পাসকৃত বিল নিখুঁত ও উন্নত হয়। পঞ্চম সংসদে গৃহীত মোট ১৭৩টি বিলের মধ্যে ১১৫টির ওপর সংসদে সাধারণ আলোচনা হয় এবং ৫৮টি বিল কোনো রকম আলোচনা ছাড়াই পাস হয়। ১১৫টি আলোচিত বিলের মধ্যে ৪৬টি বিল পাস হয় ০১-১০ জন সাংসদের আলোচনার মাধ্যমে, অনুরূপভাবে ২৮টি ১০-২০ জন, ১৬টি ২০-৩০ জন এবং ২৫টি বিল পাস আলোচনায় ৩০ এর উর্ধ্বে সংসদ-সদস্য অংশগ্রহণ করেন।[৭] উল্লেখ্য যে, এ সংসদে ৫৩টি বিল পাস হয় বিরোধী দল একাধিক্রমে সংসদ বর্জন ও পদত্যাগের পর।

এ সংসদে সরকার দলীয় সদস্যরা সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে কতগুলো মৌলিক বিল পাস করে যার ওপর প্রবল বিরোধিতা করে বিভিন্ন সময়ে বিরোধী দল ওয়াক আউট করে। যেমনঃ গণভোট বিল, ১৯৯১ (১৯৯১ সনের ২৫নং আইন), রাষ্ট্রপতি নির্বাচন বিল, ১৯৯১ (১৯৯১ সনের ২৭নং আইন), The local Govt: (Unioun Parishads) (Amendment) Bill,1993(১৯৯৩ সালের ২০নং আইন) ইত্যাদি।

সংসদে বিরোধী দলের সাংসদরা শুধু বিরোধিতার খাতিরে যদি সরকারী বিলের বিরোধিতা করেন, অনুরূপভাবে সরকারী দলও যদি একঘেঁয়েমী মনোভাবের জন্য সর্বদা বিরোধী দলকে উপেক্ষা করে তবে গণতান্ত্রিক ঐতিহ্য যেমন গরে ওঠে না, তেমনি জাতীয় বিষয়ে ঐক্যমত প্রতিষ্ঠিত হবার সুযোগ থাকে কম। ভারতসহ ব্রিটেন ও যুক্তরাষ্ট্রের ন্যায় গণতান্ত্রিক দেশগুলোতে জাতীয় স্বার্থ সর্ম্পকিত অনেক ব্যাপারে সরকার ও বিরোধী দলের সাংসদরা একমত হয়ে থাকেন। বাংলাদেশে এধরনের মানসিকতা আশানুরূপ গরে না ওঠলেও পঞ্চম পার্লামেন্টে সর্বসম্মতিক্রমে পাসকৃত উল্লেখযোগ্য দু'টি বিল হচ্ছে, একাদশ ও দ্বাদশ সংশোধনী বিল। এ বিল দুটি সম্পর্কে বিস্তারিত ভাবে পরে আলোচনা করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে বিলের সকল ধারা সম্পর্কে বিচার-বিবেচনা ও ভোট গ্রহণ সমাপ্ত হওয়ার পর প্রস্তাব করা হয় যে, বিলটি গ্রহণ করা হোক। এ পর্যায়ে মৌখিক বা আনুষ্ঠানিক ছোট-খাট সংশোধনী উত্থাপন করা যায়। সংসদে উত্থাপিত বিলের ওপর সংশোধনী উত্থাপনের অধিকার প্রত্যেক সাংসদের রয়েছে। তবে এক্ষেত্রে সাধারণত বিরোধী দলীয় সদস্যরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকেন। অবশ্য সরকার দলীয় সংশোধনী সংসদে বেশীর ভাগ গৃহীত হয়। পঞ্চম পার্লামেন্টে ৪২টি বিলের ওপর সরকার দলীয় ও বিরোধী দলের মোট ১৪৫টি সংশোধনী গৃহীত হয়। তন্মধ্যে সরকার দলীয় ১৩০টি সংশোধনী এবং বিরোধী দলের ১৫টি সংশোধনী গৃহীত হয় (দেখুন সারণী - ৫.২)।

এ সংসদে গৃহীত ১০৮টি বিলের ওপর জনমত যাচাইয়ের প্রস্তাব করা হয় এবং ৭৭টি বিল বাছাই কমিটিতে প্রেরণের প্রস্তাব দেয়া হয়। তন্মধ্যে জনমত যাচাইয়ের সকল প্রস্তাব সংসদের "হাঁ" "না" ভোটে দিয়ে সাংসদদের সংখ্যাগরিষ্ঠ "না" ভোটে বাতিল করা হয় এবং বাছাই কমিটিতে প্রেরণের আটটি বিলের প্রস্তাব সংখ্যাগরিষ্ঠ "হাঁ" ভোটে গৃহীত হয়। বাকী ৬৯টি প্রস্তাব অনুরূপভাবে বাতিল করা হয়। এছাড়া, পাঁচটি বিল বিশেষ কমিটিতে প্রেরিত হয়। পৌর কর্পোরেশন বিলে একই ধরনের চারটি বিল পাশের ওপর সাংসদ মতিয়া চৌধুরী জনমত যাচাইয়ের প্রস্তাবে বলেন, "তোমার পতাকা যারে দাও, তারে বহিবার শক্তি দাও" এবং সেই শক্তিটা আজকে জনগণের হাতে অর্পণের মাধ্যমে কোনো শক্তি আসতে পারে । সে জন্যই মেয়রের পদে সরাসরি নির্বাচনের জন্য দাবি করছি।[৮]

সংসদে বিল পাস করার ক্ষেত্রে সাধারণতঃ সরকার দলীয় সদস্যরা বিলের পক্ষে কথা বলে থাকেন এবং বিরোধী দলের সদস্যরা বিলের সমালোচনা করে থাকেন। অধ্যাদেশ জারীর মাধ্যমে প্রণীত আইনের ওপর বিরোধীদলের সদস্যরা উত্তপ্ত আলাপ- আলোচনা করেছেন এবং বিভিন্ন সময় সংসদ কক্ষ ত্যাগ করেছেন। এর ওপর পূর্বে যথেষ্ট আলোচনা করা হয়েছে। খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ (সংশোধন) বিল-১৯৯৩ এর ওপর আলোচনা করার সময় বিরোধী দলীয় হুইপ মোহাম্মদ নাসিম বলেন, এই বিল শুধু প্রত্যাহার নয়, যদি আজও সরকারের শুভ বুদ্ধির উদয় হয় তাহলে এই ধরনের জাতীয় সমস্যা নিয়ে বিরোধী দলের সংগে আলোচনার মাধ্যমে একটা পন্থা বের করতে পারেন। যদি না পারেন, তাহলে জনগণের স্বার্থের সংগে তাঁরা বেঈমানী করবেন।[৯] বাংলাদেশ মহাকাশ গবেষণা ও দূর অনুধাবন বিলের আলোচনায় গরীব-দুঃখী জনসাধারণের কল্যাণে মোঃ ওয়ালীউল্লাহ বলেন, বিগত ২৯-০৪-৯১ তারিখে সাইক্লোন এবং জলোচ্ছ্বাসে লক্ষ লক্ষ মানুষ ঘর হারা, হাজার হাজার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান মাটিতে মিশে আছে। বর্তমানে উত্তর বঙ্গে কোটি কোটি মানুষ খাদ্যের অভাবে, ঔষধের অভাবে, বাসস্থানের অভাবে কষ্ট পাচ্ছে। এই মুহূর্তে এমন একটি ব্যয়বহুল প্রতিষ্ঠান সৃষ্টি করা গরীবের ঘোড়া রোগের মতো।[১০]

Dhaka University Institutional Repository

উপর্যুক্ত আলোচনা হতে দেখা যাচ্ছে যে, পঞ্চম পার্লামেন্টে সরকারী ও বেসরকারী ২৯১ টি সাধারণ বিলের নোটিশের মধ্যে সরকারী ২০৯টি বিলের নোটিশ এবং বেসরকারী ৮২টি বিলের নোটিশ ছিলো। তন্মধ্যে সংসদে সরকারী ১৮৪টি এবং বেসরকারী ১২টি সাধারণ বিল উত্থাপিত হয়। উত্থাপিত বিলগুলোর মধ্যে সরকারী ১৭২টি সাধারণ বিল এবং বেসরকারী ১টি সাধারণ বিল সংসদে গৃহীত ও আইনে পরিণত হয়। তবে সরকারী ও বেসরকারী ১৭৩টি বিলের মধ্যে ১১৬টি (৬৭%) মৌলিক বিল এবং ৫৭টি (৩৩%) বিল ছিলো অধ্যাদে শ বিল। ১৭৩টি বিলের মধ্যে ৯১টি (৫৩%) এর ওপর আলোচনা হয় এবং ৮২টি (৪৭%) বিল আলোচনা ছাড়াই পাস হয়। পঞ্চম পার্লামেন্টে ৪২টি (২৪%) বিল ছিলো সংশোধনীসহ এবং ১৩১টি (৭৬%) বিল সংশোধনী ছাড়া পাস হয় (দেখুন সারণী - ৫.২)।

সারণী-৫.২

পঞ্চম সংসদে আইন প্রণয়নমূলক কাজের খতিয়ান

১.	বিলের মোট নোটিশ সংখ্যা	২৯১
	ক. সরকারী বিলের নোটিশ সংখ্যা	২০৯
	খ. বেসরকারী বিলের নোটিশ সংখ্যা	৮২
২.	সংসদে উত্থাপিত মোট বিলের সংখ্যা	১৯৬
	ক. সংসদে উত্থাপিত সরকারী বিল	১৮৪
	খ. সংসদে উত্থাপিত বেসরকারী বিল	১২
৩.	সংসদে গৃহীত মোট বিলের সংখ্যা	১৭৩
	ক. সংসদে গৃহীত সরকারী বিল	১৭২
	খ. সংসদে গৃহীত বেসরকারী বিল	১
	গ. মৌলিক বিল	১১৬ (৬৭%)
	ঘ. অধ্যাদেশ আকারে পূর্বাহ্নে জারিকৃত বিল	৫৭ (৩৩%)
	ঙ. আলোচনা সহ গৃহীত বিল	৯১ (৫৩%)
	চ. আলোচনা ছাড়া গৃহীত বিল	৮২ (৪৭%)
	ছ. সংশোধনীসহ গৃহীত বিল	৪২ (২৪%)
	জ. সংশোধনী ছাড়া গৃহীত বিল	১৩১ (৭৬%)

উৎসঃ বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ, জাতীয় সংসদের কার্যবাহের সারাংশ,২২ খন্ড

বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ বন্ধনীর মধ্যে শতকরা হিসাবটি করা হয়েছে সংসদে গৃহীত মোট বিলের সংখ্যানুপাতে।

Dhaka University Institutional Repository

কমিটির ভূমিকা

আইন প্রণয়নের কোনো বিল ও শাসন বিভাগ নিয়ন্ত্রণের কোনো প্রস্তাব সংসদের কমিটিতে প্রেরিত হলে তা যেমন পুংখানুপুংখভাবে বিশ্লেষণ করার সুযোগ থাকে তেমনি সংসদ- সদস্যরা বিলগুলো ও প্রস্তাব সম্পর্কে তাঁদের স্বাধীন মতামত প্রদান করতে পারেন। কারণ, কমিটিতে সব দলের সদস্যরাই সংখানুপাতে অন্তর্ভুক্ত থাকেন। পঞ্চম পার্লামেন্টে মোট ৫৩টি কমিটি এবং ৭৭টি উপ-কমিটি গঠন করা হয়। ৫৩টি কমিটির মধ্যে ১১টি সংসদীয় কমিটি, ৩৫টি মন্ত্রণালয় সম্পার্কিত কমিটি, ৫টি বিশেষ কমিটি ও ২টি বাছাই কমিটি ছিলো। কমিটিগুলোতে মোট ৫৭২ জন সংসদ - সদস্য অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তন্মধ্যে ৩২২ জন ছিলেন সরকার দলীয় সদস্য এবং ২৫০ জন ছিলেন বিরোধী দলের সদস্য। বিরোধী দলীয় সদস্যদের মধ্যে ১৪৫ জন আওয়ামীলীগ, ৪৪ জন জাতীয় পার্টি, ৩৪ জন জামাত-ই-ইসলামী, ওয়াকার্স ৮ জন, বাংলাদেশ কম্যুনিষ্ট পার্টি এবং গণতন্ত্রী ৬ জন করে, জাসদ (সিরাজ) ২ জন, স্বতন্ত্র ২ জন, ইসলামী ঐক্য জোট ও বাংলাদেশ ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির যথাক্রমে ১জন করে কমিটিতে সদস্য ছিলেন।

পঞ্চম সংসদে ১১টি সংসদীয় কমিটি ও ৩৫টি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত কমিটি ও সরকারী হিসাব সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির ৪টি উপ-কমিটি ১৪৬৫ বার বৈঠকে মিলিত হয়ে ৪১টি রির্পোট প্রদান করে। তন্মধ্যে সংসদীয় কমিটির ২৮টি রির্পোট এবং মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত কমিটির ১৩টি রির্পোট ছিলো।[১১] এসব রির্পোটগুলোর মধ্যে বিশেষ অধিকার সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির ৭টি রিপোর্ট এবং কার্যপ্রণালী বিধি সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির ১টি রিপোর্ট সর্ব সম্মতিক্রমি সংসদে গৃহীত হয়। কার্যপ্রণালী বিধির ২৪২ বিধি অনুসারে বিশেষ অধিকার সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির গৃহীত রির্পোটগুলো হলোঃ কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচী প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন, রাজশাহী খুলনা ও চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন মেয়রদের পদমর্যাদা সম্পর্কে, সংসদ- সদস্যগণকে কূটনৈতিক পাসপোর্ট প্রদান, কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচীর অধীনে প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন প্রসঙ্গে সংসদ-সদস্যগণকে সম্পৃক্ত না করায় তাঁদের অধিকার ক্ষুণ্ন হওয়া সম্পর্কে, বর্ষা মৌসুমে টেষ্ট রিলিফ কর্মসূচীর অধীনে প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে সংসদ-সদস্যদের ভূমিকা সম্পর্কে, কার্যপ্রণালী-বিধির ২১১ (১) বিধি সম্পর্কে। [১২] কার্যপ্রণালী বিধির ২৬৫(১) বিধি অনুযায়ী উত্থাপিত 'কার্যপ্রণালী-বিধি সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির রিপোর্টটি" সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।[১৩]

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম সংসদে সরকারী ও বেসরকারী গৃহীত ১৭৩টি বিলের মধ্যে ২টি বিল বাছাই কমিটিতে প্রেরণ করা হয় এবং এর রিপোর্টের ভিত্তিতে গৃহীত হয়।[১৪] এছাড়া, ৫টি বিল বিশেষ কমিটিতে প্রেরণ করা হয় এবং বিশেষ কমিটির রিপোর্টের ভিত্তিতে গৃহীত হয়। বিশেষ কমিটিতে প্রেরিত সরকারী একটি বিল অনিষ্পন্ন রয়ে যায়। বিলটি হচ্ছে, স্থানীয় সরকার (জেলা পরিষদ) (সংশোধন) বিল, ১৯৯৩।

পঞ্চম পার্লামেন্টে বেসরকারী সদস্যদের নিকট থেকে উত্থাপিত ১২টি বিলের ৬টি বিল বাছাই কমিটি ও বিশেষ কমিটিতে প্রেরণ করা হয়। তন্মধ্যে বাছাই কমিটিতে প্রেরিত ৫টি বিলের ওপর সংসদে রিপোর্ট পেশ করা হয় এবং সংসদেই নিষ্পন্ন হয়ে যায়।[১৫] এছাড়া বিশেষ কমিটিতে প্রেরিত বেসরকারী ইনডেমনিটি অর্ডিন্যান্স বাতিল বিলটির ওপর সংসদে কোনো রিপোর্ট পেশ করা হয়নি।

কমিটিসমূহের গঠন ও আলোচনা হতে দেখা যাচ্ছে যে, পঞ্চম সংসদকে স্বচ্ছ ও জবাবদিহি করার জন্য এত অধিক সংখ্যক কমিটি গঠন ও বৈঠক বাংলাদেশের কোনো সংসদে হয়নি। যেমনঃ প্রথম সংসদীয় সরকারের আমলে গঠিত এগারটি স্থায়ী কমিটির মধ্যে সরকারী হিসাব কমিটি মাত্র তিনটি বৈঠকে মিলিত হয়েছে। অবশ্য সংসদে কোনো রিপোর্ট পেশ করেনি। এ তুলনায় পঞ্চম পার্লামেন্টে কমিটির কাজ বেশী হলেও তা ছিলো প্রয়োজনের তুলনায় নগণ্য। এ সংসদের কমিটিগুলো সংসদে রিপোর্ট পেশ করলেও তা সরকার কর্তৃক কদাচিৎ বাস্তবায়িত হয়েছে। এ প্রসঙ্গে পাবলিক একাউন্টস কমিটির উদাহরণ প্রণিধানযোগ্য। ফলে ১৯৯১-১৯৯৫ সময়কালে পার্লামেন্টকে স্বচ্ছ ও জবাবদিহি করার জন্য কমিটিগুলোর ভূমিকা তেমন ছিলো না।

বাজেট অনুমোদন

গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় রাষ্ট্রীয় তহবিলের ওপর পার্লামেন্টের নিয়ন্ত্রণ একটি অপরিহার্য শর্ত। সাধারণতঃ পার্লামেন্টের অনুমোদন ছাড়া কর আরোপ এবং রাষ্ট্রীয় তহবিল হতে অর্থ ব্যয় করা যায় না। তবে বাজেট তৈরী করা একটি জটিল কাজ এবং এ কাজের জন্য পর্যাপ্ত অভিজ্ঞতার দরকার। তাই প্রায় সব দেশেই শাসন বিভাগের অধীনে অভিজ্ঞ প্রশাসনিক কর্মকর্তারা বাজেট তৈরী সংক্রান্ত জটিল কাজটি সম্পাদন করে থাকেন। যুক্তরাষ্ট্রে 'বাজেট ব্যুরো' নামে হোয়াইট হাউসের একটি শাখা সে দেশের বাজেট তৈরী করে। বিশ্বের কোনো কোনো দেশে বাজেট রচনার জন্য স্থায়ী সংসদীয় কমিটি রয়েছে। সংসদীয় গণতন্ত্রে সাধারণতঃ অর্থমন্ত্রীর তত্ত্বাবধানে অর্থমন্ত্রণালয় বাজেট

Dhaka University Institutional Repository

প্রণয়ন করে। তবে বাজেট যেভাবেই প্রণীত হোক না কেন তা পার্লামেন্টের অনুমোদন ছাড়া কার্যকর হয় না। বাংলাদেশের সংবিধানেও প্রত্যেক অর্থ বছরে সংসদের অনুমোদনের জন্য বাজেট পেশ করার বিধান রয়েছে (অনুচ্ছেদঃ ৮৭)।

১৯৭৩ হতে ১৯৯৫ পর্যন্ত জাতীয় সংসদ পনেরটি বাজেট গৃহীত হয় এবং সংসদের বাইরে ঘোষিত হয় আটটি বাজেট।তন্মধ্যে পঞ্চম সংসদে গৃহীত হয় পাঁচটি বাজেট। উল্লেখ্য যে, চতুর্থ ও পঞ্চম বাজেট পাস হয় বিরোধী দল ব্যতীত। বাজেট আলোচনা কালে সংসদ-সদস্যরা তাঁদের বক্তব্য শুধুমাত্র বাজেটের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখেন না, দেশের সরকার, সমাজ, রাজনীতি, প্রশাসন, অর্থনীতি ইত্যাদি সকল বিষয়ে তাঁদের নিজ- নিজ মতামত ব্যক্ত করেন। এছাড়া এ সময় তাঁরা স্ব-স্ব নির্বাচনী এলাকার অভাব-অভিযোগ সংসদে তুলে ধরেন এবং সেগুলো সমাধানের জন্য সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। পঞ্চম পার্লামেন্টে পাসকৃত পাঁচটি বাজেটের প্রতিটি বাজেট পরিচালনায় পাচঁজন করে সভাপতি ছিলেন। প্রথম বাজেটে সভাপতির চার জন সরকার দলীয় সদস্য এবং এক জন বিরোধী দলীয়, দ্বিতীয় বাজেটে ও অনুরূপ, তৃতীয় বাজেটে তিন জন সরকার দলীয় এবং দু'জন বিরোধী দলীয় সদস্য,চতুর্থ ও পঞ্চম বাজেটে সভাপতির দলীয় অবস্থান তৃতীয় বাজেটের ন্যায় থাকলেও এ বাজেট দু'টো বিরোধী দল বিহীন পাস হয়। নিম্নে পাঁচটি বাজেট পর্যায়ক্রমে আলোচনা করা হয়েছে।

প্রথম বাজেট (১৯৯১-১৯৯২)

পঞ্চম পার্লামেন্টের দ্বিতীয় অধিবেশনে ১৯৯১ সালের ১২ জুন সংসদে প্রথম বাজেট উত্থাপিত হয়। এ বাজেটের ওপর মোট আঠার দিনে ৬০.৩৩ ঘন্টা সাধারণ আলোচনা করা হয়। আলোচনায় মোট ১৯১ জন সাংসদ অংশগ্রহণ করেন। তন্মধ্যে সরকার দলীয় ৮০ জন এবং বিরোধী দলীয় ১১১ জন সাংসদ ছিলেন। বিরোধী দলীয় সাংসদদের মধ্যে আওয়ামীলীগ ৭৩ জন, বাংলাদেশ জামাত-ই-ইসলামী ১৪ জন, জাতীয় পার্টি ৭ জন, স্বতন্ত্র ৫ জন, বাংলাদেশ কম্যুনিষ্ট পার্টি ৫ জন, ইসলামী গণতন্ত্রী, বাকশাল ২ জন করে এবং জাসদ (সাজাহান সিরাজ) ১ জন সাংসদ ছিলেন।[১৬]

প্রথম বাজেটে অর্থ বিল উত্থাপনের বিরোধিতা করে সাংসদ আব্দুল মতিন খসরু বলেন, "যাঁদের ওপর ট্যাক্স বসানো উচিত এবং যাঁরা ট্যাক্স দিতে পারবেন তাঁদের ওপর ট্যাক্স না বসিয়ে এ দেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠী যাদের জীবনযাত্রার মান দারিদ্র সীমার নীচে, যাদের বাঁচার মত অবস্থা নাই, তাদের ওপর ট্যাক্স বসনো হয়েছে। তাই আজকের যে অর্থবিল বা বাজেট এখানে উপস্থাপন করা হয়েছে, সেটা গত নয় বছরের স্বৈরাচার সরকারের বাজেটগুলোর ধারাবাহিকা মাত্র।"[১৭]

Dhaka University Institutional Repository

সম্পূরক বাজেট

সম্পূরক বাজেটের ওপর সংসদে ৩দিনে ২৫ ঘন্টা ১৩ মিনিট সাধারণ আলোচনা করা হয়। আলোচনায় ৫১ জন সাংসদ অংশগ্রহণ করেন। তন্মধ্যে সরকার দলীয় ২২ জন এবং বিরোধী দলীয় ২৯ জন সাংসদ ছিলেন। সম্পূরক বাজেটে অন্যান্য ব্যয় সম্পর্কিত ৬৭টি মঞ্জুরী-দাবি ছিলো। দাবি গুলো সম্পর্কে বিরোধী দলগুলো কর্তৃক ২৪০টি ছাটাই প্রস্তাবের নোটিশ জমা দেয়। তন্মধ্যে ৮টি নাকচ করা হয় এবং বাকী ২৩২টি মধ্যে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড দাবির ওপর ৬টি ছাটাই প্রস্তাব সংসদে উত্থাপিত এবং প্রস্তাবের ওপর আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী সংসদ-সদস্যদের সমালোচনার জবাব দেয়ার পরে প্রস্তাবগুলো সংসদের কণ্ঠ ভোটে নাকচ হয়ে যায় এবং ২২৬টি সংসদে উত্থাপিত হয় নাই। বাকী ৬৬টি মঞ্জুরী -দাবির ওপর সময়াভাবে গিলোটিন প্রয়োগ করা হয়। ফলে এ দাবিগুলো কোনোরূপ আলোচনা ছাড়াই পাস হয়। এগুলোর মধ্যে উল্লেখ্যযোগ্যঃ পুলিশ, রাইফেলস, প্রতিরক্ষা, স্বাস্থ্য, সমবায়, কৃষি, মৎস্য, পশুপালন, বন, চিকিৎসা, শিল্প, সেচ, প্রাকৃতিক সম্পদ ইত্যাদি।

এ বাজেটে শিক্ষা খাতের টাকা উদ্ধৃত্ত, কৃষি, শিল্প খাতে অতিরিক্ত টাকা বিনিয়োগ না করে প্রতিরক্ষা খাতের ন্যায় অনুৎপাদন খাতে অতিরিক্ত টাকা বরাদ্দ করায় তীব্রভাবে সমালোচিত হয়। সংসদ-সদস্য সুরঞ্জিত সেন গুপ্ত সম্পূরক বাজেট বক্তৃতায় বলেন, "এমন বাজেট দেয়া আছে যেটা মূল বাজেটে যত টাকা বরাদ্দ দেয়া হয় নাই তার চেয়ে বেশী টাকা আমাদের দিতে হবে। অর্থাৎ বাঁশের চেছে কঞ্চি বড়। আজকে কৃষিতে আত্মনির্ভরশীল, শিল্পে বিনিয়োগ এবং উৎপাদন বাড়ানো, কর্মে বিনিয়োগ এবং বেকারত্ব দূরীকরণের জন্য এবং কোনো সৃজনশীল প্রকল্পের জন্য অতিরিক্ত টাকা দিতে রাজী আছি। তাই বলতে চাই এটা সম্পূরক বাজেট নয়, এটা হচ্ছে অপচয় বাজেট, দুর্নীতি বরাদ্দের বাজেট, খাম-খেয়ালীপনার বাজেট, লুটেরাবাজ অর্থনীতির বাজেট এবং বিশৃঙ্খল অর্থনীতির বাজেট।"[১৮] শাহ্জাহান সিরাজ বলেন, "এই সম্পূরক বাজেটটি একটি অপরিনামদর্শী পরিকল্পনা, অপচয় এবং দুর্নীতির দলিল, বিগত বাজেট এবং এই সম্পূরক বাজেট জতিকে উপহার দিয়েছে দ্রব্যমূল্যের লাগামহীন মূল্যবৃদ্ধি, সীমাহীন দারিদ্রতা, বেকারত্ব, অপচয় এবং দুর্নীতি।"[১৯] মতিয়া চৌধুরী বলেন, "শিক্ষাখাত থেকে খরচ করতে না পারার জন্য যখন টাকা ফেরৎ যায় তখন বলতে হয় একটা দেশ "আইয়ামে জাহেলিয়াতে" নিয়ে যাওয়ার জন্যই শিক্ষাখাতের বাজেট থেকেই টাকা ফেরৎ যায়। বোধ হয় পায়ের কাজ বেশী করি, মাথার কাজ কম করি, তাই প্রতিরক্ষা খাতের টাকা বেড়ে যাওয়া এবং শিক্ষা খাতের টাকা কমে যাওয়া ঠিক হবেনা। আগামী দিনে এটা যেন আর না হয়।"[২০]

Dhaka University Institutional Repository

সাধারণ বাজেট

সাধারণ বাজেটের ওপর সংসদে ১৫ দিনে ৩৫ঘন্টা ২০মিনিট সাধারণ আলোচনা করা হয়। আলোচনায় ১৪০ জন সাংসদ অংশগ্রহণ করেন। তন্মধ্যে সরকার দলীয় ৫৮ জন এবং বিরোধী দলীয় ৮২ জন সাংসদ ছিলেন। সাধারণ বাজেটে ১২৬টি মঞ্জুরী -দাবি ছিলো। দাবিগুলো সম্পর্কে বিরোধী দল কর্তৃক প্রাপ্ত ৪৬৯০ টি ছাটাই প্রস্তাবের মধ্যে ৫৩৬টি নাকচ করা হয়। বাকি ৪১৫৪ টির মধ্যে সরকারের অংগসমূহ, বিচার ব্যবস্থা, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, আমদানী-রপ্তানী ও আবগারী শুল্ক এবং মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ খাত দাবির ওপর ২৯৬টি ছাটাই প্রস্তাব সংসদে উত্থাপিত এবং আলোচনা অনুষ্ঠিত হয় এবং সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীগণ সংসদ-সদস্যদের সমালোচনার জবাব দেন। তবে ছাটাই প্রস্তাবগুলো সাংসদদের কন্ঠভোটে নাকচ হয়ে যায়। ৩৮৫৮টি প্রস্তাব সংসদে উত্থাপিত হয় নাই। বাকী ১২১টি মঞ্জুরী-দাবির ওপর সময়াভাবে গিলোটিন প্রয়োগ করা হয়। ফলে এ দাবিগুলো কোনোরুপ আলোচনা ছাড়াই পাস হয় । এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য দাবিগুলো ছিলোঃ পুলিশ, শিক্ষা, প্রতিরক্ষা, মুদ্রা, যোগাযোগ, দুর্নীতি দমন বিভাগ, কৃষি, মৎস্য, পশুপালন, স্বাস্থ্য, ভুমি রাজস্ব ইত্যাদি।

সাধারণ বাজেট অধিবেশনের আলোচিত বিষয়গুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলো- কর, সারের দাম বৃদ্ধি, ডিজেল, বিদ্যুৎ, গুড়ো দুধ, ঔষধ, সয়াবিন-পামওয়েল তেল, বলপেন, কেরোসিন, গ্যাসোলিন, পেট্রোল, সুতিজাত দ্রব্য, সাদা সিমেন্ট, এয়ার কন্ডিশনার, টিস্যু পেপার, তাজা ফল, ফ্রিজ, ইমিটেশনের গহনা ইত্যাদি। যে কোনো বাজেটের কর প্রস্তাব একটি উল্লেখযোগ্য বিষয়। জনসাধারণের ওপর এর প্রভাব সরাসরি পড়ে বলে সাংসদরা এ ব্যাপারে বেশী সক্রিয় থাকেন । বাজেটে প্রস্তাবিত কোনো নতুন কর যাতে সাধারণ মানুষের বোঝা হয়ে না দাঁড়ায় সে জন্য পার্লামেন্টের সদস্যরা বিশেষ করে বিরোধী দলীয় সদস্যরা তৎপর হয়ে ওঠে এবং বিরোধিতা করেন। বিশেষ করে এ বাজেটে বিরোধী দলীয় সাংসদরা সার, ডিজেল, বিদ্যুৎ, বলপেন, গুড়ো দুধ, কৃষি উপকরণ, খুচরা যন্ত্রাংশ, লবন, মরিচ, সয়াবিন-পামওয়েল তেল ইত্যাদির ওপর থেকে কর প্রত্যাহারের জন্য এবং বিলাস বহুল দ্রব্যের ওপর কর বৃদ্ধির জন্য আহবান করেন।

বিরোধী দলীয় সাংসদ মতিয়া চৌধুরী তাঁর বাজেট বক্তৃতায় উল্লেখ করেন যে, বর্তমান বাজেটে ২৫ লক্ষ টাকার বাড়ী ৫০ লক্ষ টাকায় করেছে। অর্থাৎ ধনীদের এখানে অর্থমন্ত্রী কর মুক্তি দিয়েছেন। কিন্ত বলপেনের দাম বাড়িয়ে আমাদেরকে সেই প্রাচীন যুগে ফিড়িয়ে দিবার মহান প্রয়াস। যখন আমরা ভূষা কালি ও বাঁশের কলম নিয়ে বিদ্যাচর্চা করতাম।[২১] জাতীয় পার্টির সংসদীয় দলের সদস্যগণ দ্রব্যমূল্য উর্ধগতি,অতিরিক্ত করারোপ এবং দুর্নীতি রোধ না করার কারণে প্রতিবাদ জানিয়ে সংসদ কক্ষ ত্যাগ করেন।[২২]

Dhaka University Institutional Repository

এ বাজেটে বর্তমান সরকারের একটা নতুন পদ্ধতি ভ্যাট অর্থাৎ মূল্য বৃদ্ধি কর এর ওপর ব্যাপক আলোচনা করা হয়। সাংসদ খান টিপু সুলতান বলেন, "ভ্যাট দিয়ে যদি অর্থমন্ত্রী বলতে চান দ্রব্য মূল্যের উর্ধ্বগতি হবে না, শুধু শিল্প মালিকদের ওপরে এটা চালু হবে, সে কথা আমরা বিশ্বাস করিনা। কেননা বাজার নিয়ন্ত্রণে ব্যর্থ হয়ে ভ্যাট চালু করা সম্ভব না এবং দুর্দশাগ্রস্থ ও দুর্নীতিপরায়ন সমাজে এটা চলতে পারে না।"[২৩]

সংসদে সাংসদদের ট্যাক্স কমানো এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে দাবির প্রেক্ষিতে বলপেনের ওপর থেকে কর ৭৫% থেকে কমিয়ে ৬০%, এ্যালুমিনিয়াম ২০% থেকে কমিয়ে ১০%, মরিচের ওপর ট্যারিফ মূল্য ২৫ হাজার টাকা থেকে কমিয়ে ২০ হাজার টাকা, কৃষিতে কর রিলিফের ২০% কাজের টাকা সরকারের বন্ডে জমা এর পরিবর্তে কমিয়ে ১০% করা হয় এবং পেট্রোল চালিত ২০০০ সি সি এর ওপরে গাড়ীর ওপর ট্যাক্স ৬০% থেকে ৭০% এ উন্নীত করা হয়।[২৪]

দ্বিতীয় বাজেট (১৯৯২-৯৩)

দ্বিতীয় বাজেট ষষ্ঠ অধিবেশনে ১৯৯২ সালের ১৮ জুন সংসদে উত্থাপিত হয়। এর ওপর মোট ২০ দিনে ৭৩ ঘন্টা ৩২ মিনিট সাধারণ আলোচনা করা হয়। আলোচনায় সরকার ও বিরোধী দলীয় মোট ৩৩৪ জন সাংসদ অংশগ্রহণ করেন। তন্মধ্যে সরকার দলীয় ১৫৪ জন এবং বিরোধী দলীয় ১৮০ জন সাংসদ ছিলেন। বিরোধী দলীয় সদস্যদের মধ্যে আওয়ামীলীগ সদস্য ৯০ জন, জামাত-ই-ইসলামী ৫৫ জন, জাতীয় পার্টি ৪ জন, স্বতন্ত্র ৩জন, গণতন্ত্রী ও বাকশাল যথাক্রমে ২জন এবং জাসদ (সাজাহান সিরাজ) ও ইসলামী ঐক্যজোটের ১ জন করে সংসদ-সদস্য ছিলেন।[২৫]

সম্পূরক বাজেট

এ বাজেটের ওপর ৬ দিনে ১০ ঘন্টা ৯৬ মিনিট সাধারণ আলোচনা করা হয়। সম্পূরক বাজেট আলোচনায় ৪১ জন সাংসদ অংশগ্রহণ করেন। তার মধ্যে সরকার দলীয় ১৭ জন এবং বিরোধী দলীয় ২৪ জন সাংসদ ছিলেন। বাজেটে অন্যন্য ব্যয় সম্পর্কিত মঞ্জুরী -দাবি ছিলো ৬৭টি। দাবিগুলো সম্পর্কে বিরোধীদল কর্তৃক ৬৩৩ টি ছাটাই প্রস্তাবের নোটিশ আসে। তন্মধ্যে ১৩ টি নাকচ করা হয় এবং বাকী ৬২০টির মধ্যে ১১টি ছাটাই প্রস্তাব ৮টি দাবির ওপর সংসদে উত্থাপিত এবং আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী সংসদ-সদস্যদের সমালোচনার জবাব দেন। তবে ছাটাই প্রস্তাবগুলো সংসদের কণ্ঠ ভোটে নাকচ হয়ে যায় এবং ৬০৯টি সংসদে উত্থাপিত হয় নাই। বাকী ৫৯টি মঞ্জুরী -দাবির ওপর সময়াভাবে গিলোটিন প্রয়োগ করা হয়। ফলে এ দাবিগুলো কোনোরূপ আলোচনা ছাড়াই পাস হয়। এগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য পুলিশ, প্রতিরক্ষা, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সমাজসেবা, সমবায়, শিল্প, চিকিৎসা, তথ্য, সেচ,বিচার ব্যবস্থা, কৃষি ইত্যাদি।

Dhaka University Institutional Repository

সরকার দলীয় সদস্যরা সাধারণত বাজেটের বিরোধিতা করেন না কিন্তু এ পার্লামেন্টে সম্পূরক বাজেটের সমালোচনা করতে গিয়ে সরকার দলীয় সদস্য ছাইফুল আজম বলেন, "সম্পূরক বাজেট বরাদ্দটা বাজেটের ৫% থেকে ১০% এর মধ্যে সীমিত থাকলে খুশি হতাম। দুঃখের বিষয় আজকে এই বাজেট দু'হাজার দু'শত কোটির উর্দ্ধে এবং এটা প্রায় ২৫% বৃদ্দি করা হয়েছে। বাজেট প্রণয়ন করে সেই বাজেট ঠিকভাবে বাস্তবায়ন করা প্রশাসনিক কৃতিত্ব বলে আমি মনে করি।"[২৬] বিরোধী দলীয় সাংসদ শাহ মুহঃ রুহুল কুদ্দুস বলেন, "এই সম্পূরক বাজেটের মাধ্যমে রাজস্ব উন্নয়ন খাতে বরাদ্দের বিরাট "পুকুর চুরির" সুযোগ রয়েছে।"[২৭] সাংসদ রাশিদা খাতুন বলেন, "দেশের বৃহত্তর জনগোষ্টির কল্যাণার্থে সম্পূরক বাজেট করা হয় নাই। কারণ এর ফলে সরকারী কর্মকর্তা-কর্মচারী, প্রধানমন্ত্রী থেকে সংসদ-সদস্যদের বেতন-ভাতা ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি পায়।"[২৮]

গবেষকের দৃষ্টিকোণ থেকে সম্পূরক বাজেটটা ছিলো একটা অপরিনামদর্শী বাজেট। যেখানে মূল বাজেটের ওপর ২৫% বৃদ্ধি করা হয়। এ বাজেট সাধারণ মানুষ, অর্থাৎ কৃষক-শ্রমিক দরিদ্র জনগোষ্টির কলাণের কথা চিন্তা না করে প্রধানমন্ত্রী থেকে শুরু করে সরকারী কর্মকর্তা- কর্মচারীর বেতন-ভাতা বৃদ্ধির জন্য অতিরিরক্ত টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়।

সাধারণ বাজেট

১৯৯২-'৯৩ সালের সাধারণ বাজেটের ওপর সংসদে ১৪দিনে ৬২ ঘন্টা ৩৬ মিনিট সাধারণ আলোচনা করা হয়। আলোচনায় ২৯৩ জন সংসদ-সদস্য অংশগ্রহণ করেন। তন্মধ্যে সরকার দলীয় ১৩৭ জন এবং বিরোধী দলীয় ১৫৬ জন সাংসদ ছিলেন। সাধারণ বাজেটে অন্যান্য ব্যয় সম্পর্কিত মঞ্জুরী -দাবি ছিলো ১২৬টি। দাবি সমূহ সম্পর্কে বিরোধী দল কর্তৃক প্রাপ্ত ৬২৭৯টি ছাটাই প্রস্তাবের মধ্যে ৬৭৮টি নাকচ করা হয় এবং বাকী ৫৬০১টির মধ্যে ১৬৮৮টি ছাটাই প্রস্তাব ১৫টি দাবির ওপর সংসদে উত্থাপিত এবং আলোচনা হয়। সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী সংসদ-সদস্যদের আলোচনার উত্তর দেন এবং পরে সাংসদদের কণ্ঠ ভোটে উহা নাকচ হয়ে যায়। বাকী ৩৮৩৯টি সংসদে উত্থাপিত হয় নাই। ৫টি দাবির ওপর ছাটাই প্রস্তাব আনীত সাংসদগণ সংসদে না থাকায় উহা সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীর প্রস্তাব ক্রমে পাস হয়।

উপর্যুক্ত মঞ্জুরী -দাবিগুলো ছাড়া ১০৬টি মঞ্জুরী-দাবির ওপর সময়াভাবে গিলোটিন প্রয়োগ করা হয়। ফলে এ দাবিগুলো কোনোরূপ আলোচনা ছাড়াই পাস হয়। এগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য দাবিগুলো ছিলো- বাংলাদেশ রাইফেলস, প্রতিরক্ষা, সমাজ সেবা ও কল্যাণ, শ্রম ও জনশক্তি, কৃষি, মৎস্য, বন, শিল্প,তথ্য, স্বরাষ্ট ইত্যাদি।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় বাজেট সাধারণ মানুষের কল্যাণার্থে না হওয়ায় তীব্রভাবে সমালোচিত হয়। বিরোধী দলীয় সাংসদ আলহাজ্ব মোঃ ওবায়দুল হক তাঁর বাজেট বক্তৃতায় উল্লেখ করেন যে, এই উচ্চাভিলাসী বাজেটে টেলিভিশন, মোটরগাড়ী, ফ্যান, এয়ার কুলার প্রভৃতির আমদানী শুল্ক কমানো হয়েছে। অপরদিকে পিয়াজ, মরিচ, ডাল ইত্যাদির আমদানি শুল্ক ও কর বৃদ্ধি করা হয়েছে।[২৯] সাংসদ মোঃ আজিজুর রহমান চৌধুরী শিল্প মন্ত্রীর উক্তি কটাক্ষ করে বলেন, "এক বস্তা সার দিয়ে নাকি দশ মণ ধান বেশী হয়। তাই তিনি সারের মূল্য কমান নাই, আমি তো মনে করি তাঁর অভিমত অনুযায়ী প্রতি বস্তা সারের মূল্য ২৫০০ টাকা করলে ভাল হতো।"[৩০] সংসদ-সদস্য পরিতোষ চক্রবর্তী গার্মেন্টস শিল্পের ওপর ট্যাক্স ধরার সমালোচনা করে বক্তৃতায় বলেন, এর ফলে যদি পোষাক শিল্প ধবংস হয়ে যায় তাহলে হাজার হাজার বেকার নর-নারীর কর্মসংস্থান আমরা করতে পারবো না। কাজেই সময় থাকতে আমাদের সাবধান হতে হবে। প্রয়োজন হলে ভর্তুকি দিয়ে এই পোষাক শিল্পকে টিকিয়ে রাখতে হবে।

বাজেটের ওপর সংসদ-সদস্যদের কর হ্রাসের দাবির প্রেক্ষিতে কতগুলো বিষয়ের ওপর থেকে কর ও ভর্তুকী হ্রাস করা হয়। জি, ডি, পি,এর অতিরিক্ত ভর্তুকী ১% হতে $^{১}/_{২}$% করা হয়, গমের আমদানী কর ৭$^{১}/_{২}$% মওকুফ করা হয়, সুতীজাত দ্রব্যের কর ৩০% হতে ১৫%, বৈদ্যুতিক মিটারের যন্ত্রাংশের ওপর কর ৪৫% হতে ৩০%, কৃষিজাত দ্রব্যের আমদানী কর ৭.৫% হতে ০%, কাঠের ওপর কর ৪৫% হতে ৩০%, চশমার ওপর কর ৩০% হতে ১৫%, সিরামিকের ওপর কর ৩০% থেকে ১৫%, কাঁচের ওপর কর ১৫% থেকে ৭.৫% এবং এ্যালুমিনিয়ামের ওপর কর ৬০% থেকে ৪৫% হ্রাস করা হয়।[৩১]

বাজেট আলোচনা করতে গিয়ে আলোচনা শুধু বাজেটের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে না। দেশের আইন-শৃংখলা, রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করা হয়। এ বাজেট আলোচনায় এরুপ প্রচুর আলোচনা করা হয়। বিরোধী দলীয় সাংসদ মোহাম্মদ নাসিম ৯মে, ১৯৯২ ইত্তেফাকের উদ্ধৃতি উল্লেখ করে বলেন, "দুর্ভাগ্যজনক ভাবে সরকারের দুর্নীতি, সন্ত্রাস,অর্থনৈতিক লুটপাট, প্রশাসন দলীয়করণ, অব্যবস্থা, ব্যর্থতা, অদক্ষতা ও অযোগ্যতার কারণে জনগণের আকাংখ্যা ধুলিসাৎ হতে বসেছে।"[৩২] সাংসদ মোশারফ হোসেন বলেন, "সন্ত্রাসের যন্ত্রণায় সারা দেশের মানুষ ভীত সন্ত্রস্ত বাংলাদেশের প্রতি ইঞ্চি ভূমি আজকে সন্ত্রাসীরা দখল করে ফেলেছে।"[৩৩]

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় বাজেট(১৯৯৩-৯৪)

পঞ্চম পার্লামেন্টের দশম অধিবেশনে ১৯৯৩ সালের ১০ জুন তৃতীয় বাজেট সংসদে উপস্থাপিত হয়। এর ওপর মোট ১৫ দিনে ৮৯ ঘন্টা ৫৯ মিনিট সাধারণ আলোচনা হয়। আলোচনায় ৪৩১ জন সাংসদ অংশগ্রহণ করেন। তন্মধ্যে সরকার দলীয় ১৭৮ জন এবং বিরোধী দলীয় ২৫৩ জন সাংসদ ছিলেন। বিরোধী দলীয় সাংসদদের মধ্যে আওয়ামী লীগ ১৬৭ জন, জামাত-ই-ইসলামী ২৯ জন, জাতীয় পার্টি ১৯ জন, বাংলাদেশ ওয়ার্কাস ১১ জন, গণতন্ত্রী, বাকশাল ৭ জন, জাসদ ৫জন, এন,ডি,পি ও বাংলাদেশ কম্যুনিষ্ট পার্টির ৩ জন করে সাংসদ ছিলেন।[৩৪] উল্লেখ্য যে, পঞ্চম পার্লামেন্টের পাঁচটি বাজেটের মধ্যে তৃতীয় বাজেটের ওপর সবচেয়ে বেশী সংখ্যক সংসদ-সদস্য বেশী সময় আলোচনা করেন।

সম্পূরক বাজেট

সম্পূরক বাজেটের ওপর ৩ দিনে ১২ ঘন্টা ১৩ মিনিট সাধারণ আলোচনা করা হয়। আলোচনায় ১১৩ জন সংসদ-সদস্য অংশগ্রহণ করেন। তন্মধ্যে সরকার দলীয় ৪৩ জন এবং বিরোধী দলীয় ৭০ জন সাংসদ ছিলেন। এ বাজেটে অন্যান্য ব্যয় সম্পর্কিত মঞ্জুরী-দাবি ছিলো ৭৪টি। দাবি গুলো সম্পর্কে বিরোধী দল কর্তৃক প্রাপ্ত ৭১৩টি ছাটাই প্রস্তাবের মধ্যে ৯৭ টি নাকচ করা হয়। বাকী ৬১৬ টির মধ্যে ১৫ টি দাবির ওপর ২৪৫ টি ছাটাই প্রস্তাব সংসদে উথাপিত হয় এবং আলোচনা ও সমালোচনার পর সংসদ কর্তৃক ভোটে বাতিল হয়ে যায়। সংসদে উথাপিত ৫টি দাবির ওপর ছাটাই প্রস্তাব আলোচনা না হয়ে, দাবিগুলো সংসদের ভোটে অগ্রাহ্য হয়ে যায়। বাকী ৩৭১ টি ছাটাই প্রস্তাব সংসদে উথাপিত হয়নি।

উপরোল্লিখিত ৭৪ টি মঞ্জুরী-দাবির মধ্যে ৫৪ টি মঞ্জুরী দাবির ওপর গিলোটিন প্রয়োগ করা হয়। অর্থাৎ কোনো রকম আলোচনা ছাড়াই পাস হয়। এ গুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলো স্বাস্থ্য ও জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ, সমাজ সেবা ও কল্যাণ, সমবায়, কৃষি, শিল্প, বন, বাণিজ্য ইত্যাদি।

পঞ্চম পার্লামেন্টের তৃতীয় বাজেটে সম্পূরক বাজেটের চরম বিরোধিতা করে বিরোধী দলীয় সংসদ-সদস্য কাজী আবদুর রশীদ বলেন, "দেশের সার্বিক অর্থনৈতিক অবস্থার যদি উন্নতি, দ্রব্যমুল্য কম, আইন-শৃংখলা পরিস্থিতির যদি উন্নতি হতো, তাহলে ২,২৩৬ কোটি ৯২ লক্ষ সম্পুরক বাজেটের টাকা দিতে প্রস্তুত থাকতাম।"[৩৫] তিনি আরো বলেন, "আইন-শৃংখলা পরিস্থিতির আজকে চরম অবনতির জন্য শিল্পে আজকে কেউ বিনিয়োগ করে না, ভারত থেকে এসে যেভাবে বিদেশী পণ্যে

Dhaka University Institutional Repository

দেশ ছেয়ে যাচেছ তাতে দেশী পণ্য আজকে দাম পাচেছ না।"[৩৬] মোঃ শাহজাহান ওমর বলেন, "যে দেশে ২৫% কি ২৬% লোক তথাকথিত শিক্ষিত সেখানে শিক্ষা খাতের টাকা কিভাবে অতিরিক্ত থাকে।"[৩৭] রহমত আলী বলেন, "ইহা শিক্ষা ব্যবস্থাকে সম্পূর্ণরূপে পঙ্গু করে দিয়েছে।"[৩৮] তিনি আরো বলেন, "এ বাজেট উন্নয়ন খাতে না হয়ে, হয়েছে অনুন্নয়ন খাতে।"[৩৯] সাংসদ খান টিপু সুলতান বাজেট বক্তৃতা দিতে গিয়ে উল্লেখ করেন যে, গত এক বছর অর্থনৈতিক শোষণের কারণে সারা জাতি অর্থনৈতিক ভাবে মুখ থুবড়ে পরেছে। কোনো ব্যবসায়ীর মুখে আজ হাসি নেই। তারা মাঠে হাল দিয়ে স্বাধীন ভাবে চাষাবাদ করার জন্য স্পৃহা হারিয়ে ফেলেছে। মাত্র ১০% লোক যারা গুলশান বনানীতে বড় বড় আমলা এবং রাজা-মন্ত্রীদের তাবেদার, তারা আজকে এখানে স্বাধীন এবং স্বচ্ছল জীবন-যাপন করছে, তাদের গণতন্ত্র কায়েম হয়েছে। এই জন্য রাজস্ব বোর্ডে যে অতিরিক্ত টাকা বরাদ্দ করেছে আমরা তা দিতে পারি না।[৪০]

সাধারণ বাজেট

সাধারণ বাজেটের ওপর ১২ দিনে ৭৭ ঘন্টা ৪৬ মিনিট সাধারণ আলোচনা হয়। আলোচনায় ৩১৮ জন সাংসদ অংশগ্রহণ করেন। তার মধ্যে সরকার দলীয় ১৩৫ জন এবং বিরোধী দলীয় ১৮৩ জন সাংসদ ছিলেন। সাধারণ বাজেটে অন্যান্য ব্যয় সম্পর্কিত মঞ্জুরী-দাবি ছিলো ১২৮ টি। দাবিসমূহ সম্পর্কে বিরোধী দল গুলো কর্তৃক আনীত ৬৬৬৭ টি ছাটাই প্রস্তাবের মধ্যে ২০৮৭ টি নাকচ করা হয়। বাকী ৪৫৮০ টির মধ্যে ৩১ টি দাবির ওপর ২৮৮৮ টি ছাটাই প্রস্তাব সংসদে উথাপিত হয় এবং সংসদ কর্তৃক ভোটে অগ্রাহ্য হয়ে যায় এবং ১৬৯২টি সংসদে উথাপিত হয় নাই।

উপর্যুক্ত দাবিসমূহ বাদে ৯৭টি মঞ্জুরী-দাবির ওপর সময়াভাবে গিলোটিন প্রয়োগ করা হয়। অর্থাৎ কোনোরুপ আলোচনা ছাড়াই পাস হয়। উল্লেখযোগ্য দাবিগুলো হচ্ছেঃ সমাজসেবা ও কল্যাণ, কৃষি, শিল্প, মৎস্য, স্বাস্থ্য ও জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ, মহিলা বিষয়ক, শ্রম ও জনশক্তি, সমবায়, বন, রেলওয়ে ইত্যাদি।

এ বাজেটে কৃষিতে ভর্তুকী না দেয়ার জন্য বিরোধী দলীয় সাংসদ সুধাংশু শেখর হালদার সমালোচনা করে বলেন, "জাপান, চীন কৃষিতে ভর্তুকী দেয়। আমেরিকা এবং ইউরোপ বাণিজ্যের যে দ্বন্দ্ব, সেই দ্বন্দ্বই হচ্ছে কৃষিজাত পণ্যের ভর্তুকী দিয়ে। সেই দ্বন্দ্ব সব সময় থাকে এবং E.E.C. Country এর অভ্যন্তরীণ যে আইন তাই হচ্ছে ভর্তুকী। কাজেই ফ্রান্স, ইউরোপ, আমেরিকাকে আই, এম, এফ এবং বিশ্ব ব্যাংক যদি ভর্তুকী দেয় আমাদের কেন দেবে না"?[৪১] সাংসদ আবদুর রউফ বলেন, "আমরা জানতাম দুধে-ভাতে বংগালী, মাছে-ভাতে বাংগালী। এখন শুনতে শুরু করেছি

Dhaka University Institutional Repository

ডালে-ভাতে বাংগালী। এই বাজেটে দেখতে পাচ্ছি নতুন কোনো কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা নেই। দারিদ্র দূরীকরণের বুলি এই বাজেটে আওড়ানো হয়েছে। কিন্তু দরিদ্র সীমার নিচে যে সমস্ত মানুষ আছে তাদের জন্য সুনির্দিষ্ট কোনো কর্মসূচী এ বাজেটে রাখা হয়নি। এ বাজেটে কৃষি উপকরণের ওপর থেকে ভর্তুকী প্রত্যাহার করায় দরিদ্র কৃষকদের জন্য এটি একটা মরন ফাঁদ"।[৪২]

পঞ্চম পার্লামেন্টে সকল সাংসদই যে সর্বদা নিজের ছাফাই গেয়েছেন এবং অপরের বিরোধিতা করেছে তা ঠিক নয়। কোনো কোনো সাংসদ উভয়েরই সমালোচনা করেছেন। যার মধ্য থেকে বস্তুনিষ্ঠ সত্য বের হয়ে আসে। যেমন, সরকার দলীয় সাংসদ মেজর আখতারুজ্জামান বলেন, "সর্বদা শুনতে পাচ্ছি, পত্র-পত্রিকায় দেখতে পাচ্ছি, এ বাজেট ধনীকে ধনী করার বাজেট, এতে কোনো দিক নির্দেশনা নেই। বিজ্ঞ বিরোধী দলের কথা বজেট পরিরবর্তন করে নতুন বাজেট দিতে হবে। যাঁরা সবকিছুকে বিরোধিতার চোখে দেখেন। যাঁদের চোখের সামনে সব নেগেটিভ চিত্র ফুটে ওঠে। তাঁরা যেটাকে না বলেন, ঠিক তার বিপরীত হয়। কাজেই সরকারী দল যেটা বলবে তাঁরা ঠিক তার বিরোধী বক্তব্য তুলে ধরবেন"।[৪৩] অনুরূপভাবে অর্থমন্ত্রীর সমালোচনা করে বলেন, "অর্থমন্ত্রী তাঁর বাজেট বক্তৃতায় বলেছেন গত বছর ১৯৭ লক্ষ মেট্রিক টন খাদ্যশষ্য উৎপাদন করে রেকর্ড পরিমাণ করা হয়েছে। অর্থমন্ত্রী সাইফুর রহমান সাহেবের কাছ থেকে রেকর্ড পরিমাণ ফিগার কথাটা আমি আশা করিনি। কারণ, ১৯০ কোটি টন যেটা উৎপাদন করা হয়েছে তা অতি নগণ্য। আমাদের দেশে দু'কোটি একর চাষ যোগ্য জমি আছে। যদি ৫০ মণ করেও উৎপাদন করে তাহলে সেখানে ১০০ কেটি মণ ধান উৎপন্ন হওয়া উচিত। সেখানে দেড়কোটি একরে মাত্র হয়েছে ৫৪ হাজার কোটি মণ ধান, অর্থাৎ প্রতি একরে ২৭.২৩ মণ। আজকে ফিলিপাইনের মতো একটি দেশ, যেখানে প্রতি একরে ১৬০ মণ করে ধান উৎপাদন করে সেখানে ২৭ মণকে যদি রেকর্ড বলা হয় এজন্য দুঃখিত স্যার। আমরা চাই এই কৃষি উৎপাদনে জোর দিয়ে গড় উৎপাদন অন্ততঃপক্ষে ১০০ মণে উন্নীত করা হোক"। [৪৪]

চতুর্থ বাজেট (১৯৯৪-৯৫)

১৯৯৩-৯৪ সালের সম্পূরক বাজেট এবং ১৯৯৪-৯৫ সালের সাধারণ বাজেট সংসদে পঞ্চদশ অধিবেশনে ৯ জুন ১৯৯৪ সালে পেশ করা হয়। চতুর্থ বাজেটের ওপর মোট ১১ দিনে ১৬ ঘন্টা ৯৭ মিনিট আলোচনা করা হয় এবং আলোচনায় ৫০ জন সংসদ-সদস্য অংশগ্রহণ করেন।[৪৫] সংসদ-সদস্যরা সবাই ছিলেন সরকার দলীয়। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে চতুর্থ বাজেট পাস হয় বিরোধী দল বিহীন।

Dhaka University Institutional Repository

সম্পূরক বাজেট

এ বাজেটের ওপর ৫ দিনে ২১ জন সাংসদ ৬ ঘন্টা ৯৬ মিনিট সাধারণ আলোচনা করেন। সম্পূরক বাজেটের ১০টি দাবির ওপর ১১টি ছাটাই প্রস্তাবের নোটিশ আসে। তন্মধ্যে ১টি নাকচ করা হয়। বাকী ১০টি সংসদে উথাপিত হয়নি । সম্পূরক বাজেটের অন্যান্য ব্যয় সম্পর্কিত ৭৬টি মঞ্জুরী-দাবি পর্যায়ক্রমে সংসদে উথাপিত হয় এবং পাস হয়।

১৯৯৩-৯৪ সালের সম্পূরক বাজেটে কৃষির উন্নয়ন, রাস্তা-ঘাট, হাট-বাজারের উন্নয়ন, যুবকদের জন্য সুযোগ-সুবিধার সৃষ্টি, মৎস্য উৎপাদন, বৃক্ষ রোপন, হাস-মুরগির চাষ, গরু-ছাগল পালন, ফল-ফুলের চাষ, সজীর আবাদ ইত্যাদির ওপর সরকার দলীয় সদস্যরা আলোচনা করেন। এ বাজেট আলোচনায় যে বিষয়টি সবচেয়ে গুরুত্ব পেয়েছে তা হচ্ছে বিরোধী দলের সাংসদদের সংসদে আসার আহবান জানিয়ে বক্তব্য। শামসুল ইসলাম (বাণিজ্য মন্ত্রী) বলেন, "৮৫% ভাগ লোক চায় বিরোধী দল সংসদে আসুক। আমরাও চাই সংসদে আসুন। তাহলে আর আপত্তি কোথায়, আপনারা সংসদে আসুন আর হরতাল বন্ধ করে দিন। তাহলে আমরা বাংলাদেশকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবো। তার সুফল এদেশের মানুষ পাবে"।[৪৬] এবাজেট আলোচনায় বিরোধী দল না থাকায় সমালোচনা করার কেহ ছিলো না। সরকার দলীয় সদস্যরা বাজেটের পক্ষেই কথা বলেন। সাংসদ মোঃ আবদুল গণি বলেন, "বাংলাদেশের অর্থনীতি এবং উন্নয়নের ক্ষেত্রে ব্যাপক পরিবর্তন হয়েছে এই বাজেটের কারণে"।[৪৭] মোঃ আবদুস সালাম পিন্টু বলেন, "আজকের সম্পূরক বাজেটে ৪৫৬৭ কোটি টাকা অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দ চাওয়া হয়েছে তা সংবিধানসম্মত"।[৪৮]

এ বাজেটের ফলে শিক্ষাখাত উন্নয়নে ১৯৯২-৯৩ সালে যেখানে ৬০০ কোটি টাকা ছিলো তা বৃদ্ধি করে ৯৮০ কোটি করা হয়েছে। গ্রামাঞ্চলে পানির অভাব দূরীকরণে যেখানে ১৯৯০-৯১ সালে ৩৫ কোটি টাকা দেয়া হয়েছিলো তা বৃদ্ধি করে ১৬৬ কোটি টাকা দেয়া হয়। পল্লী বিদ্যুতায়নে যেখানে ২৩৩ কোটি টাকা ছিলো তা বৃদ্ধি করে ৪০০ কোটি টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়।[৪৯]

সাধারণ বাজেট

সাধারণ বাজেটের ওপর ৬ দিনে ২৯জন এম.পি. ১০ ঘন্টা ০১ মিনিট সাধারণ আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। সাধারণ বাজেটের ১২৯টি মঞ্জুরী-দাবির মধ্যে ৯৭টি দাবির ওপর ৫৮৯টি ছাটাই প্রস্তাবের নোটিশ আসে। তন্মধ্যে ৪২টি নাকচ করা হয় এবং বাকী ৫৪৭টি সংসদে উথাপিত হয় নাই। মঞ্জুরী -দাবিগুলো পর্যায়ক্রমে সংসদে উথাপিত হয় এবং কোনোরকম আলোচনা ছাড়াই পাস হয়।

Dhaka University Institutional Repository

বিরোধী দল বিহীন চতুর্থ বাজেটের আলোচনা ছিলো নিষ্প্রাণ। সাংসদ গোলাম মোহাম্মদ সিরাজ বলেন, "এই বাজেটে কৃষিখাতে ভর্তুকী প্রদান, কৃষিক্ষেত্রে প্রবৃদ্ধি অর্জনকে উৎসাহিত করার জন্য কেরোসিন, ডিজেল, পানি, সেচ ও সারের দাম কমানো হয়েছে। সারা দেশবাসী আজ কৃতজ্ঞ"।[৫০] আবু ইউসুফ মোঃ খলিলুর রহমান বলেন, "রাজস্ব বাজেটে ২৬৮৯ কোটি টাকা উদ্বৃত্ত রেখে, যমুনা সার চার্জকে বিলুপ্ত করে, ৩৮২ কোটি টাকার কর হ্রাস করে, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, মানব সম্পদ উন্নয়ন, ও পশু সম্পদ উন্নয়ন খাতে টাকা বরাদ্দ করে জাতির ইতিহাসে, বাংলাদেশের ইতিহাসে যেন নজির বিহীন একটি বাজেট প্রণীত হয়েছে"।[৫১] মোশাররফ হোসেন মংশু কৃষকদের উৎপাদন ব্যবস্থার দিকে লক্ষ্য রেখে সারের দাম, তেলের দাম কমানোর জন্য এই বাজেটকে একটি চমৎকার বাজেট বলে অভিহিত করেন।

সরকার দলীয় সদস্যরা বাজেটে কৃষিতে ভর্তুকী প্রদান, কেরোসিন, ডিজেল, পানি, সেচ ও সারের দাম কমানো, রাজস্ব বাজেট উদ্ধৃতি, যমুনা সার চার্য বিলুপ্তি করে শিক্ষা খাতে, স্বাস্থ্য খাতে, মানব সম্পদ উন্নয়ন, পশু সম্পদ উন্নয়ন খাতে বেশী টাকা বরাদ্দ করার জন্য সর্বদা সরকারের প্রশংসা করেই আলোচনা করেন। সমাপনী বক্তৃতায় অর্থমন্ত্রী সাইফুর রহমান বলেন, শিক্ষার উন্নয়ন, দারিদ্রতা নিরসন, গণতান্ত্রিক ধারাকে অব্যাহত রাখা, বাজার অর্থনীতিতে আরো গতি সঞ্চার করা, পানি, টেলিফোন এ সমস্ত খাতে যে সব অপচয় হয় সেগুলো বন্ধ করা এবং মানব সম্পদের উন্নয়ন করাই এই বাজেটের লক্ষ্য।[৫২]

পঞ্চম বাজেট (১৯৯৫-৯৬)

পঞ্চম পার্লামেন্টের পঞ্চম বাজেট বিশতম অধিবেশনে ১৯৯৫ এর ১৫ জুন সংসদে উত্থাপিত হয়। এ বাজেটের ওপর ৬ দিনে ৬৯ জন সাংসদ ১৬ ঘন্টা ০৩ মিনিট সাধারণ আলোচনা করেন। বিশেষ দ্রষ্টব্য যে, এ বাজেটেটিও সংসদে পাস হয় বিরোধী দল বিহীন।

সম্পূরক বাজেট

সম্পূরক বাজেটের ওপর ২দিনে ১১জন সাংসদ ৫ ঘন্টা ৫৭ মিনিট সাধারণ আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। এ বাজেটের মঞ্জুরী-দাবি সমূহের ওপর কোনো ছাটাই প্রস্তাব ছিলো না। ৭৫টি অন্যান্য ব্যয় সম্পর্কিত মঞ্জুরী-দাবি মন্ত্রী ও প্রতিমন্ত্রীগণ পর্যায়ক্রমে সংসদে উত্থাপন করেন এবং আলোচনা বিহীন পাস হয়।

Dhaka University Institutional Repository

এ বাজেট আলোচনা করতে গিয়েও পূর্বের ন্যায় সরকার দলীয় সদস্যরা বিরোধী দলের শূন্যতা অনুভব করে এবং সংসদে আসার আহ্বান জানায়। সাংসদ মুহাম্মদ আনসার আলী সিদ্দিকী সিরাজ বলেন, "দুঃখজনক যে, এই গণতান্ত্রিক সরকারের পঞ্চম বাজেট অধিবেশনেও তাঁরা অনুপস্থিত রয়েছেন। আজকে তাঁরা সংসদে উপস্থিত থাকলে সংসদের পরিপর্ণতা হতো। সংসদের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি এবং কার্যকারিতা আরো শক্তিশালী হতো।" বিরোধী দল বিহীন এ বাজেট আলোচনায় সাধারণত সরকারের গুণগানই গাওয়া হয়। তবে ওসমান গণি খান বলেন, "সম্পূরক বাজেটটা আমাদের একটু বিব্রত করেছে। কারণ যেখানে প্রকৃত বাজেট ছিলো ৯,৯৪৮ কোটি টাকা সেখানে সম্পূরক বাজেটে ৩৮৩৭ (৪০.৭১%) কোটি টাকা বেশী চাওয়া হয়েছে"।[৫৩] আবদুল ওহাব সরকারের গুণগান করে বক্তৃতা দেন, স্বাধীনতা যুদ্ধের পর যে কয়টি সরকার বাংলাদেশে রাজস্ব করেছে তাদের আমলের সকল উন্নয়নমূলক কাজ যোগ করলে যা হবে, তার চেয়ে কোনো এলাকায় পাঁচ গুণ আবার কোনো এলাকায় দশ গুণ কাজ সর্বক্ষেত্রে হয়েছে।[৫৪]

এ বাজেটে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, রাস্তা-ঘাট, কালর্ভাট, ব্রীজ প্রভৃতি খাতে বরাদ্দ বৃদ্ধি করা হয়। এই সম্পূরক বাজেটটিতে অতিরিক্ত টাকা বরাদ্দের পরিমাণ পূর্ববর্তী বাজেটগুলোকে ছাড়িয়ে যায়। গবেষকের দৃষ্টিকোণ থেকে মূল বাজেটের ওপর ৪০.৭১% টাকা অতিরিক্ত বরাদ্দ করা কোনো সরকারের অপরিপক্কতার পরিচায়ক ছাড়া আর কিছুই হতে পারে না।

সাধারণ বাজেট

সাধারণ বাজেটের ওপর ৪ দিনে ৫৮জন সাংসদ ১০ ঘন্টা ৪৬ মিনিট সাধারণ আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। সাধারণ বাজেটের ১৩১টি মঞ্জুরী-দাবির মধ্যে ২৩টি দাবির ওপর ১০৬টি ছাটাই প্রস্তাবের নোটিশ পাওয়া যায়। তন্মধ্যে ১৯টি নাকচ করা হয় এবং বাকী ৮৭টি সংসদে উপস্থাপিত হয় নাই। মঞ্জুরী-দাবিগুলো পর্যায়ক্রমে সংসদে মন্ত্রী ও প্রতিমন্ত্রীগণ উপস্থাপন করেন এবং কোনো আলোচনা ছাড়াই পাস হয়। এগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলো ঃ পুলিশ, প্রতিরক্ষা, শিক্ষা, কৃষি, মৎস্য, সমবায়, শিল্প, স্বাস্থ্য, সেচ, বাণিজ্য, যোগাযোগ, বন, প্রাকৃতিক সম্পদ ইত্যাদি।

এ বাজেট আলোচনাকালে বিরোধী দলীয় সদস্য না থাকায় সরকার দলীয় সদস্যদের বক্তব্যের মধ্যে একই ধরনের সুর লক্ষ্য করা যায়। তাই এ আলোচনায় বক্তব্যের গুণগত পরিবর্তনের লক্ষণ ছিলো না। যেমন, তাঁরা বাজেটের কর, ভ্যাট প্রত্যাহারের প্রস্তাব ও এক্ষেত্রে কিছু কিছু ক্ষেত্রে সরকার কর্তৃক কর হ্রাস করার জন্য সরকারের জয়গানই বেশী গায়। তবে কৃষি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য

Dhaka University Institutional Repository

যোগাযোগ ক্ষেত্রে উন্নয়ন, বৈদ্যুতিক সমস্যা দূরীকরণ, কুটির শিল্প স্থাপন, বন্যায় ক্ষতিগ্রস্থ দরিদ্র জনসাধারণের ঘরবাড়ী পুনঃনির্মানে সাংসদদের দাবির ওপর কিছু আলোচনা করা হয়। সাংসদ মিয়া আবদুল ওয়াজেদ বলেন, "গ্রাম উন্নয়ন, দারিদ্র বিমোচন, কর্মসংস্থান গ্রাম পর্যন্ত নিয়ে যেতে হবে"।[৫৫] আকবর হোসেন (বন ও পরিবেশ মন্ত্রী) তাঁর বাজেট বক্তৃতায় বি.এন.পি. সরকারকে সবচেয়ে ভাল সরকার বলে অভিহিত করেন এবং এতে রয়েছে দক্ষ মানুষ, শ্রেষ্ঠ পরিকল্পনা ও চিন্তা যা অন্য কোনো রাজনৈতিক দলে নেই। তিনি আরো বলেন, যাঁরা সংসদে আসেন না তাঁদের জন্য কষ্ট করে ভোট দিয়ে কি লাভ।[৫৬] এম.আকবার আলী মেডিকেল যন্ত্রপাতির ওপর থেকে ভ্যাট প্রত্যাহারের প্রস্তাব করেন।[৫৭]

১৯৯৫-৯৬ সালের বাজেটটি ছিলো পঞ্চম পার্লামেন্টের পঞ্চম ও শেষ বাজেট। এ বাজেটে সংসদ-সদস্যদের দাবির প্রেক্ষিতে সুতার ওপর শুল্ক হার ৩০%হতে হ্রাস করে ২২.৫%,সাইকেল ও রিক্সার ব্যবহৃত টায়ার টিউবের শুল্ক ৪৫% হতে ৩০% হ্রাস, বুকটার, কার্বন, ট্যাপ, জিংক অক্সাইড এর শুল্ক হার ৩০% হতে ২৫% হ্রাস করা হয়।[৫৮]

সংবিধান সংশোধন

সংবিধান সংশোধনের ক্ষেত্রে পঞ্চম পার্লামেন্টের একক ক্ষমতা ছিলো। পার্লামেন্ট তার মোট সদস্য সংখ্যার দুই-তৃতীয়াংশ ভোটে গৃহীত প্রস্তাবের দ্বারা সংবিধানের যে কোনো বিধান সংশোধন করতে পারত। পঞ্চম পার্লামেন্টে সংবিধানের একাদশ ও দ্বাদশ সংশোধনী গৃহীত হয়। সংশোধন প্রক্রিয়া সম্পর্কে নিম্নে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হলো।

একাদশ সংশোধনী

সংবিধানের একাদশ সংশোধনী বিল ১৯৯১ সালের ২ জুলাই জাতীয় সংসদে উত্থাপিত হয় এবং ৬ আগষ্ট '৯১ তারিখে গৃহীত হয়। ১৯৯০ সালের ৬ ডিসেম্বর তারিখে উপ-রাষ্ট্রপতি হিসাবে প্রধান বিচারপতি জনাব সাহাবুদ্দীন আহ্মদের নিয়োগ, উপরাষ্ট্রপতি তথা অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি হিসাবে রাষ্ট্রপতির যাবতীয় ক্ষমতা প্রয়োগ ও দায়িত্ব পালন এবং তৎকর্তৃক প্রণীত সকল আইন ও অধ্যাদেশ এবং কৃত ও গৃহীত সকল কাজকর্ম ও ব্যবস্থা অনুমোদন ও সমর্থনের উদ্দেশ্যে এবং জনগণ ও প্রধান রাজনৈতিক জোট ও দলগুলোর প্রতিশ্রুতি মোতাবেক প্রধান বিচারপতি পদে তাঁর প্রত্যাবর্তন সম্পর্কে বিধান করার লক্ষ্যে এই সংশোধনী আনা হয়।

Dhaka University Institutional Repository

একাদশ সংশোধনী বিল পুংঙ্খানুপুঙ্খরূপে যাচাই করার জন্য সতের জন সংসদ-সদস্য নিয়ে বাছাই কমিটি গঠন করা হয়। তন্মধ্যে দশ জন সরকার দলীয় এবং সাতজন বিরোধী দলীয় সাংসদ ছিলেন। এই সংশোধনী বিলের ওপর সাধারণ আলোচনায় মোট বাষাট্টি জন সাংসদ অংশগ্রহণ করেন। তন্মধ্যে বাইশজন সরকার দলীয় এবং চল্লিশ জন বিরোধী দলীয় সদস্য ছিলেন। চল্লিশ জন বিরোধী দলীয় সদস্যদের মধ্যে বাইশ জন আওয়ামী লীগের সদস্য, সাতজন জাতীয় পার্টি, পাঁচজন জামাত-ই- ইসলামী, স্বতন্ত্র, বাকশাল, গণতন্ত্রী, জাসদ (সাজাহান সিরাজ), বাংলাদেশ কম্যুনিষ্ট পার্টি, বাংলাদেশ ওয়ার্কাসের যথাক্রমে একজন করে সাংসদ ছিলেন।

সংবিধানের একাদশ সংশোধনী বিলের ওপর সরকারী উদ্যোগে আনীত একটি সংশোধনী সংসদে গৃহীত হয়। এ সংশোধনীর দ্বারা"(উভয় দিন সহ) মধ্যে" শব্দাবলীর পরে "নতুন রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হয়ে কার্যভার গ্রহণ করা পর্যন্ত সময় কালের মধ্যে যাহাই পরে হোক"শব্দাবলী সন্নিবেশিত করা হয়। একাদশ সংশোধনী বিলটির ওপর জনমত যাচাইয়ের প্রস্তাব সংসদের কণ্ঠভোটে নাকচ হয়ে যাওয়ার পর বাছাই কমিটির রিপোর্টের ভিত্তিতে দু'বার বিভক্ত ভোটে দিলে প্রথম বার ২০৮ ভোটে এবং দ্বিতীয় বার ২৭৮ ভোটে একাদশ সংশোধনী বিলটি সর্বসম্মতিক্রমে সংসদে গৃহীত হয়। বিপক্ষে কোনো ভোট পড়েনি।

দ্বাদশ সংশোধনী

১৯৯১ সালের ২ জুলাই সংবিধানের দ্বাদশ সংশোধনীন বিল সংসদে উথাপিত হয় এবং ৬ই আগষ্ট'৯১ তারিখে গৃহীত হয়। সংবিধানে দ্বাদশ সংশোধনী আইনের মুল লক্ষ্য ছিলো প্রচলিত রাষ্ট্রপতি পদ্ধতির পরিবর্তে তিন জোটের যৌথ ঘোষণার আলোকে বাংলাদেশে সংসদীয় পদ্ধতি অথা জবাবদিহিমূলক শাসন ব্যবস্থা প্রর্বতন করা এবং তার সাথে সংবিধানের অধিকতর গণতন্ত্রায়ন। দ্বাদশ সংশোধনী বিলের উদ্দেশ্য ও কারণ সম্বলিত বিবৃতিতে বলা হয়ঃ "বর্তমান সংসদ সুদীর্ঘ নয় বছর" যাবৎ এক স্বৈরাচারী শাসকচক্রের বিরুদ্ধে সর্বস্তরের জনগণের প্রচন্ড ও রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম এবং শেষ পর্যায়ে এক সফল গণ- অভ্যুত্থানের ফসল। ব্যতিক্রমধর্মী এই সংসদের এক ভিন্ন জাতীয় আবেদন রয়েছে। নিরপেক্ষ নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে অনুষ্ঠিত, সর্বকালের সর্বাপেক্ষা শান্তিপূর্ণ পরিবেশে জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত এবারের সংসদ-সদস্যদের মর্যাদা ও আবেদন তাই অনস্বীকার্য। তাঁদের কাছে জনগণের প্রত্যাশা অপরিসীম। একমাত্র বহুদলীয় ও বাস্তবতার নিরীখে প্রতিষ্ঠিত অখন্ড গণতন্ত্র এবং এই সংসদের কাছে জবাবদিহি মূলক সরকারই পূরণ করতে পারে জনগণের এই প্রত্যাশা। তাই গণতন্ত্রকে স্থায়ী প্রাতিষ্ঠানিক রুপ দেয়ার জন্য গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশে সংবিধানের এই সংশোধনী সমীচীন এবং অপরিহার্য।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বাদশ সংশোধনীর প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলো ছিলো নিম্নরুপ।

১. বাংলাদেশে একজন রাষ্ট্রপতি থাকবেন, যিনি আইন অনুযায়ী সংসদ-সদস্যগণ কর্তৃক নির্বাচিত হবেন।[৫৯]

২. রাষ্ট্রপতি রাষ্ট্র প্রধান রুপে রাষ্ট্রের অন্য সকল ব্যক্তির উর্ধ্বে স্থান লাভ করবেন।[৬০] তবে কেবল মাত্র প্রধানমন্ত্রী ও প্রধান বিচারপতি নিয়োগের ক্ষেত্র ব্যতীত রাষ্ট্রপতি তাঁর অন্য সকল দায়িত্ব পালন প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ অনুযায়ী কাজ করবেন।[৬১] প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রীয় ও পররাষ্ট্রীয় নীতি সংক্রান্ত বিষয়াদি সম্পর্কে রাষ্ট্রপতিকে অবহিত রাখবেন এবং রাষ্ট্রপতি অনুরোধ করলে যে কোনো বিষয় মন্ত্রী-সভার বিবেচনার জন্য পেশ করবেন।[৬২]

৩. রাষ্ট্রপতি পাচঁ বছর মেয়াদের জন্য নির্বাচিত হবেন।[৬৩] এবং একাধিক্রমে হোক আর না হোক, দু'মেয়াদের অধিক রাষ্ট্রপতি পদে কোনো ব্যক্তি অধিষ্ঠিত থাকবেন না।[৬৪]

৪. রাষ্ট্রপতি স্পীকারের উদ্দেশ্যে স্বাক্ষরযুক্ত পত্রযোগে স্বীয় পদত্যাগ করতে পারবেন। সংবিধান লঙ্ঘন বা গুরুতর অসদাচরণের অভিযোগে রাষ্ট্রপতিকে অভিশংসিত [৬৫] এবং শারীরিক বা মানসিক অসামর্থ্যের কারণে তাঁকে অপসারণ করা যাবে।[৬৬] তবে অনুরুপ অভিশংসন বা অপসারণ প্রস্তাব জাতীয় সংসদে মোট সদস্য-সংখ্যার দুই-তৃতীয়াংশ ভোটে গৃহীত হবে।[৬৭] উল্লেখ্য যে, দ্বাদশ সংশোধনীর অব্যবহিত পূর্বে রাষ্ট্রপতির অভিশংসন বা অপসারণ প্রস্তাব সংসদে তিন-চতুর্থাংশ ভোটে পাশ করতে হতো।

৫. দ্বাদশ সংশোধনীর দ্বারা উপ- রাষ্ট্রপতির পদ বিলোপ করা হয় এবং বিধান করা হয় যে, রাষ্ট্রপতির পদ শূন্য হলে, কিংবা অনুপস্থিতি, অসুস্থতা বা অন্য কারণে রাষ্ট্রপতি দায়িত্ব পালনে অসামর্থ্য হলে জাতীয় সংসদের স্পীকার অস্থায়ীভাবে রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব পালন করবেন।[৬৮]

৬. প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে বাংলাদেশের একটি মন্ত্রীসভা থাকবে এবং সময়ে সময়ে তিনি যেরুপ স্থির করবেন সেরুপ অন্যান্য মন্ত্রী নিয়ে এই মন্ত্রীসভা গঠিত হবে।[৬৯] প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক প্রজাতন্ত্রের নির্বাহী ক্ষমতা প্রযুক্ত হবে।[৭০] তবে সকল নির্বাহী ব্যবস্থা রাষ্ট্রপতির নামে গৃহীত হয়েছে বলে প্রকাশিত হবে।[৭১]

৭. দ্বাদশ সংশোধনীর দ্বারা উপ-প্রধানমন্ত্রীর পদ বিলোপ করা হয়। এতে বলা হয় যে, বাংলাদেশে একজন প্রধানমন্ত্রী থাকবেন এবং প্রধানমন্ত্রী যেরুপ নির্ধারণ করবেন সেরুপ অন্যান্য মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী ও উপ-মন্ত্রী থাকবেন।[৭২]

Dhaka University Institutional Repository

৮. যে সংসদ-সদস্য সংসদের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের আস্থাভাজন বলে রাষ্ট্রপতির নিকট প্রতীয়মান হবে, রাষ্ট্রপতি তাঁকে প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ করবেন।[৭৩] অন্যান্য মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী ও উপমন্ত্রীগণকে রাষ্ট্রপতি নিয়োগদান করবেন (প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ অনুযায়ী)।[৭৪] তবে প্রধানমন্ত্রী ও অন্যান্য মন্ত্রীর মোট সংখ্যার অন্যূন নয়-দশমাংশ সংসদ-সদস্যদের মধ্য থেকে নিযুক্ত হবেন এবং অনধিক এক-দশমাংশ সংসদ-সদস্য নির্বাচিত হবার যোগ্য ব্যক্তিদের মধ্য হতে মনোনীত হতে পারবেন।[৭৫] সংসদ-সদস্য নন এমন কোনো মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী বা উপমন্ত্রী সংসদের কার্যাবলীতে অংশগ্রহণ করতে পারবেন, তবে তিনি সংসদে ভোটদান করতে এবং তাঁর মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত বিষয় ব্যতীত অন্য বিষয়ে বক্তব্য রাখতে পারবেন না।

৯. মন্ত্রীসভা যৌথভাবে সংসদের নিকট দায়ী থাকবে।[৭৬] সংসদের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের সমর্থন হারালে প্রধানমন্ত্রী পদত্যাগ করবেন অথবা সংসদ ভেঙ্গে দিবার জন্য রাষ্ট্রপতিকে পরামর্শ দান করবেন। প্রধানমন্ত্রী সংসদ ভেঙ্গে দিবার পরামর্শ দান করলে রাষ্ট্রপতি যদি সন্তুষ্ট হন যে, অন্য কোনো সংসদ-সদস্য সংসদের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের আস্থাভাজন নন, তবে তিনি সংসদ ভেঙ্গে দিবেন।[৭৭]

১০. প্রধানমন্ত্রীর উত্তরাধিকারী কার্যভার গ্রহণ না করা পর্যন্ত তিনি পদে বহাল থাকতে পারবেন।[৭৮] যে কোনো মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী বা উপমন্ত্রী, প্রধানমন্ত্রীর নিকট পদত্যাগ করতে পারবেন। প্রধানমন্ত্রী যে কোনো সময় কোনো মন্ত্রী বা উপমন্ত্রীকে পদত্যাগ করার অনুরোধ করতে পারবেন, এবং উক্ত মন্ত্রী সে অনুরোধ পালনে অসামর্থ্য হলে তিনি রাষ্ট্রপতিকে উক্ত মন্ত্রীকে অব্যাহতি দানের পরামর্শ দিতে পারবেন।[৭৯] প্রধানমন্ত্রী পদত্যাগ করলে বা স্বীয় পদে বহাল না থাকলে প্রত্যেক মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী বা উপমন্ত্রী পদত্যাগ করেছেন বলে গণ্য হবে। তবে তাঁদের উত্তরাধিকারীগণ কার্যভার গ্রহণ না করা পর্যন্ত তাঁরা স্ব-স্ব পদে বহাল থাকবেন।[৮০]

১১. ৭০ অনুচ্ছেদে বিধান ছিলো যে, কোনো সংসদ-সদস্য তাঁর দল থেকে পদত্যাগ করলে, অথবা সংসদে উক্ত দলের বিপক্ষে ভোটদান করলে, অথবা দলের নির্দেশ অমান্য করে সংসদে অনুপস্থিত থাকলে কিংবা ভোটদানে বিরত থাকলে তাঁর সদস্যপদ বাতিল হয়ে যাবে। দ্বাদশ সংশোধনীর দ্বারা ৭০ অনুচ্ছেদে দু'টি নতুন ধারা সংযোজন করে সংসদ-সদস্যদের ওপর দলীয় নিয়ন্ত্রণ আরো বৃদ্ধি করা হয়। এতে বিধান করা হয় যে, কোনো রাজনৈতিক দলের সংসদীয় গোষ্ঠীর নেতৃত্ব সম্পর্কে কোনো প্রশ্ন দেখা দিলে স্পীকার সেই দলের সংসদ-সদস্যদের বৈঠকে সংখ্যাগরিষ্ঠ

Dhaka University Institutional Repository

ভোটের দ্বারা উক্ত দলের সংসদীয় নেতৃত্ব নির্ধারণ করবেন, এবং সংসদে ভোটদানের ব্যাপারে সেই নেতৃত্বের নির্দেশ যদি কোনো সদস্য অমান্য করেন তবে সংসদে তাঁর আসন শূন্য হবে।[৮১]

১২. ৭২ অনুচেছদে বিধান ছিলো যে, রাষ্ট্রপতি সংসদ আহবান, স্থগিত ও ভঙ্গ করবেন। দ্বাদশ সংশোধনীর দ্বারা রাষ্ট্রপতির কর্তৃত্ব ও মর্যাদা ক্ষুণ্ন করে বিধান করা হয় যে, প্রধানমন্ত্রীর "লিখিত" পরামর্শ অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি সংসদ আহবান, স্থগিত ও ভঙ্গ করবেন।[৮২] অনুরুপভাবে সংবিধানের ১৪১ ক ও ১৪১গ অনুচেছদের অধীনে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক জরুরী অবস্থা ঘোষণা ও জরুরী অবস্থা চলাকালে মৌলিক অধিকার স্থগিত করার ক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রীর "প্রতিস্বাক্ষর" বা "লিখিত" পরামর্শ গ্রহণ বাধ্যতামুলক করা হয়।

১৩. দ্বাদশ সংশোধনীর দ্বারা বিধান করা হয় যে, সংসদের এক অধিবেশনের সমাপ্তি ও পরবর্তী অধিবেশনের প্রথম বৈঠকের মধ্যে ৬০ দিনের বেশী বিরতি থাকবে না। এই সংশোধনীর অব্যবহিত পুর্বে বিধান ছিলো যে, প্রতি বছর সংসদের অন্ততঃ দু'টি অধিবেশন হবে। উল্লেখ্য যে, ১৯৭২ সালের মূল সংবিধানে অনুরুপ ঘন ঘন অধিবেশনের বিধান ছিলো। তাছাড়া, দ্বাদশ সংশোধনীর দ্বারা বিধান করা হয় যে, বিদেশের সংগে সম্পাদিত সকল চুক্তি সংসদে পেশ করতে হবে। তবে জাতীয় নিরাপত্তার সংগে সংশ্লিষ্ট কোনো চুক্তি কেবল মাত্র সংসদের গোপন বৈঠকে পেশ করা হবে। ইতোপূর্বে "জাতীয় স্বার্থ বিরোধী" হবে বলে মনে করলে রাষ্ট্রপতি কোনো চুক্তি সংসদে পেশ নাও করতে পারতেন।

১৪. দ্বাদশ সংশোধনীর দ্বারা বিধান করা হয় যে, সংবিধানে অনুচেছদ ৫৮(মন্ত্রীপরিষদ),৮০(রাষ্ট্রপতির আইন সংক্রান্ত ক্ষমতা),৯২ক(রাষ্ট্রপতির অর্থ সংক্রান্ত ক্ষমতা) সংশোধনের জন্য গৃহীত বিলের ক্ষেত্রে গণভোটের প্রয়োজন হবে না। কিন্ত পঞ্চম সংশোধনীর দ্বারা বিধান করা হয় যে, অনুরুপ সংশোধনীর ক্ষেত্রে গণভোটের প্রয়োজন হবে।

দ্বাদশ সংশোধনী বিলটি পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে বিশ্লেষণ করার জন্য একাদশ সংশোধনী বিলের বাছাই কমিটিতে প্রেরণ করা হয়। এই বিলের সাধারণ আলোচনায় সাতানব্বই জন সাংসদ অংশগ্রহণ করেন। তন্মধ্যে সরকার দলীয় আট জন এবং বিরোধী দলীয় উনানব্বই জন সাংসদ ছিলেন। বিরোধী দলীয় সাংসদদের মধ্যে আওয়ামীলীগ ৪৪ জন,জামাত-ই-ইসলামী ১৬ জন, বাংলাদেশ কম্যুনিষ্ট পার্টির ০৬ জন, জাসদ (সাজাহান সিরাজ) ০৫ জন, জাতীয় পার্টি ০৫ জন, স্বতন্ত্র ০৪ জন, বাকশাল ০৩ জন, বাংলাদেশ ওয়ার্কাস ও এন,ডি,পি ০২ জন করে, গণতন্ত্রী এবং ইসলামী ঐক্যজোটের একজন করে সাংসদ ছিলেন।

Dhaka University Institutional Repository

উপর্যুক্ত আলোচনা হতে দেখা যাচেছ যে, দ্বাদশ সংশোধনী বিলের ওপর সংসদে ব্যাপক আলোচনা হয়। তবে বিরোধী দলীয় সদস্যরা বেশী আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। সাংসদরা আলোচনা করতে গিয়ে সংশোধনীর অনেক বিষয়ের তীব্র বিরোধিতা করেন। সংসদ-সদস্য সুরঞ্জিত সেন গুপ্ত দেশের নির্বাহী ক্ষমতা প্রধানমন্ত্রীর পরিবর্তে রাষ্ট্রপতির হাতে ন্যাস্ত করার আহবান জানিয়ে সংসদে বলেন, "প্রধানমন্ত্রী কোনো একটা দল বিশেষেরই নয়, বরং গোটা জাতিরই হবেন। সেই প্রধানমন্ত্রীর কাছে যদি নির্বাহী ক্ষমতাটি এককভাবে রাখা হয় তাহলে আজকে এই দেশে একটি রাষ্ট্রপতির স্বৈরাচার থেকে একটি প্রধানমন্ত্রীর স্বৈরাচারের দেশে পরিণত হবে।" তিনি আরো বলেন, "আমার আশঙ্কা যে আজকের এই ধারাটি যদি পরিবর্তন করা না হয় তাহলে আমরা গণতন্ত্রে ফেরত যেতেই পারবোনা।We will Substitue Presidential autocracy by prime ministrial autocracy. সুতরাং গণতন্ত্রের স্বার্থে সংসদীয় গণতন্ত্রকে অর্থপূর্ণ এবং কার্যকরী করার জন্য পৃথিবীর অন্যান্য দেশের ন্যায় আমাদের দেশেও এটা করা হোক।"[৮৩] এম,পি জনাব শাহাদুজ্জামান বলেন, সংবিধানের ৫৬ অনুচেছদের (৩) দফা অনুসারে প্রধান বিচার পতি এবং অন্যান্য বিচারপতি নিয়োগের ক্ষেত্র ব্যতীত রাষ্ট্রপতি তার অন্যান্য সকল দায়িত্ব পালন প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ অনুযায়ী করবেন। এই দফাওয়ারি সংশোধনীর লক্ষ্য হলো বিচার ব্যবস্থাকে প্রশাসনের প্রভাব থেকে মুক্ত রাখার জন্য এবং ন্যায় বিচার নিশ্চিত করার স্বার্থে।[৮৪]

সংবিধানের দ্বাদশ সংশোধনী বিলের ওপর বিরোধী দল কর্তৃক আনীত তিনটি সংশোধনী সংসদে গৃহীত হয়। তন্মধ্যে আওয়ামীলীগ কর্তৃক দু'টি যেমন-(ক) বিলের তিন দফায় প্রস্তাবিত ৪৮(৩) অনুচেছদে প্রথম পংক্তিতে অবস্থিত "প্রধানমন্ত্রী" শব্দটির পর ও "প্রধান বিচারপতি" শব্দগুলো সন্নিবেশ করা হয়। (খ) বিলের ১৯ দফায় (১২০)দফায় ৫৬ সংখ্যাটির পূর্বে "," কমার পরিবর্তে "বা" শব্দটি প্রতিস্থাপিত করা হবে এবং "৫৮,৮০ বা ৯২ ক" সংখ্যাগুলো, কমা ও শব্দটি বিলুপ্ত হবে।

দ্বাদশ সংশোধনী বিলের ওপর সংশ্লিষ্ট সদস্যগণের জনমত যাচাইয়ের প্রস্তাব সংসদের কণ্ঠ ভোটে নাকচ হয়ে যাওয়ার পর বাছাই কমিটির রিপোর্টের ভিত্তিতে দু'বার বিভক্তি ভোট হয়। বিভক্তি ভোটে প্রথম বার বিলের পক্ষে ৩০৬ জন সাংসদ ভোট দেন এবং দ্বিতীয় বার ৩০৭ জন সাংসদ ভোট দেন। বিপক্ষে কোনো ভোট পড়েনি। এভাবে সংশোধনীটি সংশোধিত আকারে সর্বসম্মতিক্রমে সংসদে গৃহীত হয়। অবশেষে সংসদীয় সরকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে দ্বাদশ সংশোধনী বিলে রাষ্ট্রপতি সম্মতি দিবেন কিনা এ প্রশ্নে ১৫ সেপ্টেম্বর'৯১ গণভোট অনুষ্ঠিত হয়। গণভোটে সংখ্যাগরিষ্ঠ মতামত হ্যাঁ সুচকের পক্ষে আসে। ফলে দ্বাদশ সংশোধনী বিল কার্যকর হয়।

Dhaka University Institutional Repository

অনেক ত্যাগ তিতিক্ষার ফসল সংসদীয় পদ্ধতির সরকার ও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য একাদশ ও দ্বাদশ সংশোধনী বিল ঐক্যমতের ভিত্তিতে পাস হওয়ার পর এর ওপর সরকার দলীয় তিন জন সাংসদ এবং বিরোধী দলীয় আওয়ামীলীগের ০৪ জন সাংসদ অভিনন্দন জ্ঞাপন করে বিবৃতি প্রদান করেন।

শাসন বিভাগের ওপর নিয়ন্ত্রণ

আধুনিক গণতান্ত্রিক আইনসভার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ক্ষমতা হচ্ছে শাসন বিভাগকে নিয়ন্ত্রণ করা। শাসন বিভাগকে আইনসভা কতটুকু নিয়ন্ত্রণ করতে পারছে তার ওপর এর মর্যাদা ও কার্যকারিতা অনেকাংশ নির্ভর করে। আমরা দেখেছি, আইনসভা কর্তৃক শাসন বিভাগকে নিয়ন্ত্রণের যে সব পদ্ধতি রয়েছে, বাংলাদেশের সংবিধানেও সংসদের কার্যপ্রণালী বিধিতে সেগুলো স্বীকৃত। আমরা এ পর্যায়ে পঞ্চম পার্লামেন্ট কর্তৃক এসব পদ্ধতির প্রয়োগ সম্পর্কে পৃথক পৃথকভাবে আলোচনা করবো।

১. প্রশ্নোত্তর পদ্ধতি (কার্যপ্রণালী-বিধি ৪১-৫৮)

শাসনবিভাগ বা সরকারের ওপর পার্লামেন্টের নিয়ন্ত্রণ প্রয়োগের ক্ষেত্রে প্রশ্নোত্তর পদ্ধতি হচ্ছে সংসদ-সদস্যদের একটি শানিত অস্ত্র। প্রশ্ন জিজ্ঞাসার মাধ্যমে সাংসদরা বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের ত্রুটি-বিচ্যুতি উদঘাটন এবং নিজ নিজ এলাকার অভাব-অভিযোগের প্রতি সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারেন। প্রশ্নের উত্তর দানের মাধ্যমে শাসন বিভাগ পার্লামেন্টের কাছে জবাবদিহি করে থাকে।

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদে প্রতিদিন তার বৈঠকের প্রথম একঘন্টা প্রশ্ন ও উত্তরের জন্য নির্দিষ্ট রাখা হয়। সংসদে সাধারণত দু'ধরনের প্রশ্ন করা যায়; যথা-তারকা চিহ্নিত ও তারকা চিহ্নবিহীন প্রশ্ন। তারকা চিহ্নিত প্রশ্নের লিখিত ও মৌখিক উত্তর দেয়া হয় এবং তার ওপর সম্পূরক প্রশ্ন করা যায়। অন্যদিকে তারকা চিহ্ন বিহীন প্রশ্নের লিখিত জবাব দেয়া হয়। এর ওপর সম্পূরক প্রশ্ন করা যায় না। সাধারণত কম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে তারকা চিহ্নবিহীন প্রশ্ন করা হয়ে থাকে। আমরা দেখেছি, পঞ্চম পার্লামেন্ট মোট বাইশটি অধিবেশনে মিলিত হয়েছে। আর এই বাইশটি অধিবেশনেই উভয় প্রকার প্রশ্ন করা হয়েছে এবং সর্বমোট ৪৭৩৭০টি প্রশ্নের নোটিশ সংসদে জমা পড়ে।

Dhaka University Institutional Repository

তারকা চিহ্নিত প্রশ্ন ঃ পঞ্চম পার্লামেন্টে মোট ৩৭৯০৭টি তারকা চিহ্নিত প্রশ্নের নোটিশ আসে। তন্মধ্যে আলোচনা ও উত্তরদানের জন্য স্পীকার কর্তৃক ৯৩৯১টি প্রশ্ন গৃহীত হয়। গৃহীত ৯৩৯১টি প্রশ্নের মধ্যে ৮৬৯২টি সংসদে উপস্থাপিত বা উত্তর প্রদত্ত প্রশ্নের সংখ্যা (দেখুন সারণী-৫.৩)। তারকা চিহ্নিত প্রশ্নের প্রাপ্ত নোটিশের ৭৭০৩ টি প্রশ্ন বাতিল এবং ২০৮৩৪ টি প্রশ্ন তামাদি হয়ে যায়।

সংসদে উত্থাপিত প্রশ্নগুলোর মধ্যে অধিকাংশই ছিলো আইন শৃংখলা পরিস্থিতির অবনতি, নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের অভাব ও মূল্যবৃদ্ধি, কৃষিঋণ, সার কেলেংকারী, কৃষকদের পাঁচ হাজার টাকা সুদসহ পঁচিশ বিঘা জমির খাজনা মওকুফ, রাস্তা-ঘাট, সেতু ও কালভার্ট নির্মাণ, শিক্ষক, ছাত্র ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সমস্যা, জেল খানার সমস্যা, চোরাচালান ও মজুতদারী, হাসপতালের সমস্যা, ঔষধ সংকট, পরিবেশ ও বন সংরক্ষণ, পল্লী উন্নয়ন, লাইসেন্স ও পারমিট বন্টন, বেআইনী অস্ত্র উদ্ধার, বিদ্যুৎ সমস্যা, রিলিফ সামগ্রী বন্টন, বন্যা, জলোচ্ছ্বাস, ঘূর্ণিঝড়, নদী ভাংগন, নলকূপ স্থাপন, বন্যার্তদের ত্রাণ ও পুনর্বাসন, ধান-চাল ক্রয়-বিক্রয়, খাদ্যশস্য বিতরণ, আমদানী-রপ্তানী নীতি, ভূমি সংস্কার, পুশ ইন, পুশ ব্যাক, পররাষ্ট্র নীতি, অবৈধ বাড়ী দখল, শিল্প, নির্বাচন, পাটজাত দ্রব্য, বেকার সমস্যা, বেতন-ভাতা বৃদ্ধি, ফ্লাড এ্যাকশন প্ল্যান, মৎস্য ও পশু সম্পদ বিষয়ক, শ্রম ও জনশক্তি রপ্তানী, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে কর্মচারী ও কর্মকর্তা নিয়োগে দলীয়করণ নীতি ইত্যাদি সম্পর্কিত।

সাধারণত যে সব প্রচলিত বিষয় জনগণকে আলোড়িত করে এবং যে সব বিষয়ের সাথে জনগণের অভাব-অভিযোগ কিংবা ক্ষোভ জড়িত থাকে সে সব বিষয়ের ওপর অধিক প্রশ্ন উত্থাপনের মাধ্যমে সংসদ-সদস্যরা সরকারের ত্রুটি-বিচ্যুতি জনসমক্ষে তুলে ধরার চেষ্টা করেন। এ সংসদে আইন-শৃংখলার অবনতি, দুর্নীতি, চোরাচালান, নারী নির্যাতন বৃদ্ধি, কৃষকদের ঋণ প্রদান ও সার বিতরণ, কর্মচারী ও কর্মকর্তা নিয়োগে অনিয়ম, পুশ ব্যাক, পুশ ইন, রোহিংগা সমস্যা ইত্যাদি বিষয় নিয়ে জনগণের মধ্যে বেশ আলোচিত হয়। সরকারও এসব বিষয় নিয়ে বেশ বিব্রত ছিলো। বিশেষ করে আইন-শৃংখলা পরিস্থিতির অবনতি নিয়ে সরকার বেশ সমালোচিত হয়। যেমনঃ বিরোধী দলীয় সাংসদ মতিয়া চৌধুরী স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কাছে প্রশ্ন করেন, "স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী মহোদয় অনুগ্রহ করে বলবেন কি, ১৯৯২ সালের ১ জুন হতে ১৯৯৩ সালের ৩১ মার্চ পর্যন্ত পুলিশ বাহিনীর সদস্যরা গোপন অস্ত্র তৈরীর কারখানার সন্ধান পেয়েছে কিনা; পেলে, কতটি এবং এ ব্যাপারে এ পর্যন্ত কত জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে"?[৮৫] সাংসদ আবুল কালাম আজাদ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কাছে প্রশ্ন করেন, "১৯৮২ হতে ১৯৯২

Dhaka University Institutional Repository

সালের ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত দেশে চোরাচালানীদের নিকট হতে কি পরিমাণ হেরোইন আটক ও উদ্ধার করা হয়েছে"?[৮৬] সাংসদ মোঃ রহমত আলী স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রীকে প্রশ্ন করেন, " ইহা সত্য কিনা যে, ১৯৯২ সালে জাতীয় হৃদরোগ হাসপাতাল কর্মচারী নিয়োগের ক্ষেত্রে দুর্নীতি ও স্বজনপ্রীতি হয়েছে"?[৮৭] সরকার দলীয় সদস্যরাও এবিষয়ের ওপর প্রশ্ন করে সরকারকে বিচলিত করেন, যেমনঃ সরদার সাখাওয়াত হোসেন বকুল স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কাছে প্রশ্ন করেন, "১৯৯৪ সালের ১ জুলাই হতে ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত দেশে কতটি খুন ও ডাকাতি সংঘটিত হয়েছে"?[৮৮] সাংসদ মোঃ সিরাজুল ইসলাম প্রশ্ন করেন, "স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী মহোদয় অনুগ্রহ করে বলবেন কি ১৯৭২ হতে ১৯৯৪ সালের ৩১ অক্টোবর পর্যন্ত দেশে মোট কতজন নারী ধর্ষিত হয়েছে এবং কতটির বিচার হয়েছে"?[৮৯] তারকা চিহ্নিত প্রশ্নের ওপর সংসদ-সদস্যগণ বিভিন্ন সময়ে সম্পূরক প্রশ্নও করেছেন। বন্যা নিয়ন্ত্রণ প্রকল্পের ওপর সাংসদ আব্দুস শহীদ সেচ, বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও পানি সম্পদ প্রতিমন্ত্রীকে একটি সম্পূরক প্রশ্ন করে বলেন, "সারা বাংলাদেশে বন্যা নিয়ন্ত্রণের পরিকল্পনা চলছে, এমতাবস্থায় সাম্প্রতিক বন্যায় ক্ষতিগ্রস্থ মৌলভীবাজার জেলার মনু ও ধলাইয়ের বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য বর্তমান সরকারের কোনো পরিকল্পণা আছে কিনা"? অনেক সময় সরকার প্রশ্নের উত্তর দিতে না পেরে এড়িয়ে যায় কিংবা অন্যসময় দেয়া হবে বলে প্রশ্নটিকে অন্য তারিখে স্থানান্তরিত করা হয়। এরূপ এক প্রশ্নের জবাবে সাংসদ হাজী রাশেদ মোশারফ ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, "মাননীয় স্পীকার, প্রশ্নের উত্তর পাওয়া একজন সংসদ-সদস্যের বিশেষ অধিকার। সেটা স্থানান্তরিত হয়ে গেলে সদস্যের অধিকার ক্ষুণ্ন হয়ে যায়। এ ব্যাপারে ব্যবস্থা নেয়ার জন্য আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি"।[৯০]

তারকা চিহ্নবিহীন প্রশ্নঃ পঞ্চম পার্লামেন্টে তারকা চিহ্নবিহীন প্রশ্নের প্রাপ্ত নোটিশের সংখ্যা ছিলো ৯৪৬৩টি। তন্মধ্যে স্পীকার কর্তৃক ৩৩৬৩টি গৃহীত হয়। গৃহীত প্রশ্নের মধ্যে সংসদে উপস্থাপিত বা উত্তর প্রদত্ত প্রশ্নের সংখ্যা ৩০৫৭টি (দেখুন সারণী- ৫.৩)। তারকা চিহ্নবিহীন প্রশ্নের প্রাপ্ত নোটিশের ২৭৩৬ টি প্রশ্ন বাতিল ও ৩৪১৩টি প্রশ্ন তামাদি হয়ে যায়। তারকা চিহ্নবিহীন প্রশ্নের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলোঃ নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষের মূল্যবৃদ্ধি, আইন-শৃংখলা পরিস্থিতির অবনতি, কৃষি ঋণ, সার কেলেংকারী, চোরাচালান ও মজুতদারী, চিকিৎসা সমস্যা, জেলখানার সমস্যা, পল্লী উন্নয়ন, লাইসেন্স ও পারমিট বন্টন, ত্রাণ ও পুনর্বাসন, ঘূর্ণিঝড়, যোগাযোগ, সেতু, কালভর্ট, শিল্প, পাটজাত দ্রব্য, বেকার সমস্যা, ধান-চাল ক্রয়-বিক্রয়, মৎস্য ও পশুসম্পদ, পরিবেশ ও বন সংরক্ষণ, প্লট বিতরণ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, আমদানী-রপ্তানী, বিদ্যুৎ সমস্যা, পররাষ্ট্র নীতি ইত্যাদি।

Dhaka University Institutional Repository

তারকা চিহ্নবিহীন প্রশ্নের ক্ষেত্রেও আইন-শৃংখলা পরিস্থিতির অবনতি বিষয়টি নিয়েই সংসদে বেশি আলোচিত হয়। এছাড়াও রয়েছে, বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস, সার কেলেংকারী ইত্যাদি। তারকা চিহ্নবিহীন প্রশ্নে সাংসদ এম আব্দুর রহিম স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীকে প্রশ্ন করেন, "১৯৯৩ সালের ১ জানুয়ারী হতে এ পর্যন্ত দেশে কতটি খুন, ডাকাতি ও ছিনতাই সংঘটিত হয়েছে"?[৯১] সরকারী সদস্য হাজী রাশেদ মোশারফ বলেন, "মন্ত্রী মহোদয় অনুগ্রহ করে বলবেন কি, ১৯৯৩ সালের ১জুলাই হতে এ পর্যন্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সন্ত্রাসীদের হাতে কত ছাত্র নিহত হয়েছে এবং কতজন সন্ত্রাসীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে"?[৯২] সাংসদ নুরুল ইসলাম মনি ত্রাণ মন্ত্রীকে প্রশ্ন করেন, "আমেরিকান টাস্ক ফোর্স ঘূর্ণিদুর্গতদের ত্রাণের জন্য এ যাবৎ কি কি কাজ করেছে"?[৯৩]

২. স্বল্প কালীন নোটিশের প্রশ্ন (কার্যপ্রণালী-বিধি ৫৯)

সাধারণত প্রশ্ন উত্থাপন করার জন্য অন্যূন ১৫ দিনের নোটিশ দিতে হয়। তবে জনগুরুত্বসম্পূর্ণ কোনো বিষয় সম্পর্কে কম সময়ের নোটিশে প্রশ্ন করা যায়। জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালী-বিধিতে ইহা স্বল্পকালীন নোটিশের প্রশ্ন নামে অভিহিত। পঞ্চম পার্লামেন্টে মোট ২১৪টি স্বল্পকালীন নোটিশের প্রশ্ন জমা পড়ে। তার মধ্যে আলোচনা ও উত্তরদানের জন্য স্পীকার কর্তৃক ১০টি প্রশ্ন গৃহীত হয়। তবে ৫টি প্রশ্ন সংসদে উপস্থাপিত ও উত্তর দেয়া হয় (দেখুন সারণী- ৫.৩)। স্বল্পকালীন নোটিশের প্রশ্নগুলো ছিলো জলদস্যু কর্তৃক সামুদ্রিক জাহাজ আক্রান্ত, চুরি, ডাকাতি ইত্যাদি। সংসদ-সদস্য শেখ হারুনর রশিদ মিয়া স্পীকারকে প্রশ্ন করে বক্তৃতায় বলেন, বাংলদেশের দ্বিতীয় সামুদ্রিক বন্দর মঙ্গলা। সেই মঙ্গলা বন্দরে বিদেশ থেকে যে সমস্ত জাহাজ আসে তাতে যদি নিত্যনৈমত্তিক চুরি-ডাকাতি হতে থাকে, তাহলে বিদেশী জাহাজ মঙ্গলা বন্দরে আসবে না, মঙ্গলা বন্দরটি চিরদিনের জন্য বন্ধ হয়ে যাবে। তাই স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলতে চাই যে, এই ধরনের চুরি-ডাকাতি রাহাজানি যাতে আর ভবিষ্যতে না ঘটে, এ জন্য সরকার কি কি প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন সংসদে বলার জন্য অনুরোধ করছি।[৯৪] এ ব্যাপারে মন্ত্রী মহোদয় একমত পোষণ করে বলেন, এর সাথে জড়িত দুস্কৃতিকারীদের ধরে বিচার করা হচ্ছে এবং ভবিষ্যতেও করা হবে। অপরদিকে সমুদ্র পথে টহল দেয়ার ব্যবস্থা করছি।

৩. অর্ধ-ঘন্টা আলোচনা (কার্যপ্রণালী-বিধি ৬০)

কোনো জন-গুরুত্বসম্পন্ন বিষয় সম্পর্কে তারকাচিহ্নিত বা তারকাচিহ্নবিহীন প্রশ্ন করা হয়েছিলো কিন্তু উহার উত্তরে বর্ণিত কোনো বাস্তব ঘটনা সম্পর্কে বিশদ বিবরণ প্রয়োজন, এরূপ ক্ষেত্রে অর্ধ-ঘন্টা আলোচনা পদ্ধতির মাধ্যমে আলোচনা করা যায়। অর্থাৎ, কোনো প্রশ্নের উত্তর হতে উদ্ভূত জন-গুরুত্বসম্পন্ন বিষয়ের আলোচনা করাই এর লক্ষ্য।

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম পার্লামেন্টে অর্ধ-ঘন্টা আলোচনার জন্য মোট ১৪৩টি নোটিশ প্রদান করা হয়। তন্মধ্যে স্পীকার কর্তৃক গৃহীত হয় ১৪টি এবং সংসদে আলোচিত হয় ৩টি নোটিশ (দেখুন সারণী-৫.৩)। ১৪৩টি নোটিশের মধ্যে ১২৯টি নোটিশ বাতিল এবং ১১টি সময়াভাবে তামাদি হয়ে যায়। বিশেষ দ্রষ্টব্য যে, বিরোধী দল একাধিক্রমে সংসদ বর্জনের পর ১০টি নোটিশ জমা পড়ে। তন্মধ্যে দ'টি গৃহীত ও আলোচিত হয়।

অর্ধ-ঘন্টা আলোচনার জন্য নোটিশগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলোঃ চারটি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের টাকা আত্মসাৎ, বাণিজ্য ঘাটতি, বৈষম্যমূলক রিলিফের গম বরাদ্দ, কৃষক ঋণ, চিনি সমস্যা, বন ও পতিত জমি দখল, নদী ভাংগন, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি সংক্রান্ত।

অর্ধ-ঘন্টা আলোচনা জন্য গৃহীত ১৪টি প্রস্তাবের মধ্যে সরকার দলীয় সদস্যের ২টি, আওয়ামীলীগের ৪টি, জামাত-ই- ইসলামীর ৭টি এবং জাতীয় পার্টির সদস্যদের ১টি নোটিশ ছিলো।

সংসদে আলোচিত তিনটি অর্ধ-ঘন্টা নোটিশের দুইটি ছিলো সরকার দলীয় সদস্যদের এবং একটি জামাত-ই-ইসলামী সদস্যদের। অর্ধ-ঘন্টা আলোচনার নোটিশ তিনটি - (ক) এক বছরে দেশে ৬ হাজার ৩ শত ২৯ কোটি টাকা বাণিজ্য ঘাটতি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে মারাত্মক বিরূপ প্রতিক্রিয়া বয়ে আনবে।[৯৫] (খ) বাংলাদেশের চাহিদার তুলনায় ৪.৭৪ লক্ষ মেঃটন মাছ যাহা উৎপাদিত হয় তাহা আগামী দু'বছরের মধ্যে পূরণ করার জন্য যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ প্রসঙ্গে।[৯৬] (গ) চলতি বর্ষা মৌসুমে নদীর ভাংগনে বিলীন হওয়া গ্রামের সংখ্যা এবং উহা রোধকল্পে সরকারের ব্যবস্থা সম্পর্কে।[৯৭] তিনটি অর্ধ-ঘন্টা আলোচনাই ছিলো জাতীয় বিষয় সম্পর্কিত এবং তারকা চিহ্নিত প্রশ্ন হতে উদ্ভূত।

৪. মুলতবী প্রস্তাব (কার্যপ্রণালী-বিধি ৬২)

আইনসভার যে কোনো সদস্য কোনো সাম্প্রতিক ও জরুরী জন-গুরুত্বসম্পন্ন নির্দিষ্ট বিষয়ে আলোচনার উদ্দেশ্যে সভার কাজ মুলতবী করার জন্য প্রস্তাব করতে পারেন। উত্থাপিত প্রস্তাব বিধিসম্মত বলে স্পীকার কর্তৃক গৃহীত হলে তাঁর দেয়া নির্দিষ্ট দিনে সদস্যরা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সরকারের সমালোচনা করতে পারেন এবং মন্ত্রীগণ সে ব্যাপারে সরকার কর্তৃক গৃহীত ব্যবস্থার ব্যাখ্যা প্রদান করতে বাধ্য হন। এভাবে সরকার তার সম্পাদিত কাজের জন্য আইনসভার কাছে জবাবদিহি করে থাকে। এ ধরনের প্রস্তাবকে অন্যূন পঁচিশ জন সাংসদের সমর্থন করতে হয়।

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম পার্লামেন্টে মুলতবী প্রস্তাবের ১৮০৩ টি নোটিশ জমা পড়ে। তন্মধ্যে স্পীকার কর্তৃক বিধিসম্মত বলে তেইশটি প্রস্তাব গৃহীত হয় এবং সংসদে আলোচিত হয় বাইশটি প্রস্তাব (দেখুন সারণী-৫.৩)। আলোচিত বাইশটি প্রস্তাবের আঠারোটি প্রস্তাব ছিলো একই বিষয়ের ওপর। যা ৬২ বিধির নোটিশ, ৬৮ বিধির আওতায় গৃহীত ও আলোচিত হয় এবং চারটি ছিলো অন্যান্য বিষয়ের ওপর। গৃহীত একটি আলোচনা না হওয়ায় তামাদি হয়ে যায়। সংসদে গৃহীত তেইশটি প্রস্তাবের সবগুলোই ছিলো জাতীয় বিষয় সম্পর্কিত। এর মধ্যে আঠারটি প্রস্তাব ছিলো পূর্বের ন্যায় একই বিষয়ের ওপর। বিরোধী সদস্যরা প্রস্তাবগুলো উত্থাপন করে। এছাড়া, বাইশটি প্রস্তাব বিভিন্ন কমিটিতে প্রেরণ করা হয় এবং একটি সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়। সাংসদ শাজাহান চৌধুরী কর্তৃক উত্থাপিত প্রস্তবটি হলো সুন্দর বনে আড়াই হাজার বর্গ কিলোমিটারে সশস্ত্র ডাকাতদের একচ্ছত্র রাজত্বের ফলে কোটি কোটি টাকার চিংড়ী প্রকল্প বন্ধ হওয়ার উপক্রম প্রসংগে।[৯৮] কমিটিতে প্রেরিত দু'টি প্রস্তাব সরকার দলীয় সদস্য কর্তৃক আনীত। কমিটিতে প্রেরিত প্রস্তাবগুলোর একুশটি জাতীয় বিষয় সম্পর্কিত এবং একটি প্রস্তাব ছিলো আঞ্চলিক বিষয় সম্পর্কিত। উল্লেখ্য যে, মুলতবী প্রস্তাবের নোটিশ সমূহের মধ্যে ৫৮টি নোটিশ ছিলো দু'টি বিষয় অধ্যাপক গোলাম আযম ও গণআদালত এবং রোহিঙ্গা উদ্বাস্তু সংক্রান্ত।

পঞ্চম পার্লামেন্টে যে সকল মুলতবী প্রস্তাবের নোটিশ আসে তন্মধ্যে অধিকাংশই ছিলো, রোহিঙ্গা উদ্বাস্তু, গোলাম আযম ও গণআদালত, সেতু, কালভার্ট, ড্রেজিং, নদীখনন, কৃষকদের সুযোগ-সুবিধা, চিকিৎসা, আইন-শৃংখলা পরিস্থিতি, পোশাক শিল্প, নারী ও শিশু পাচার প্রতিরোধ, দ্রব্যমূল্য, শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের সুযোগ-সুবিধা ও সমস্যা ইত্যাদি। সংসদে আলোচিত মুলতবী প্রস্তাবগুলোর মধ্যে একটি মুলতবী প্রস্তাবের কয়েকটি বিবৃতি উল্লেখ করা হলো।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দু'দল ছাত্রের বন্দুক যুদ্ধের পরিস্থিতি প্রসংগে সাংসদ রাশেদ খান মেনন সংসদে মুলতবী প্রস্তাব এনে তাঁর দেয়া বিবৃতিতে বলেন, "গতকাল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ১২.৩০ মিনিট থেকে ৩.০০ টা পর্যন্ত কয়েক ঘন্টা বন্দুক যুদ্ধ চলছিলো, পুলিশ দাঁড়িয়ে আছে, নিহত হয়ে ছেলেরা পড়ে আছে। কিন্তু আমরা বুঝতে পারি নাই এদেশে কোনো সরকার আছে কি নাই। সরকার যদি থাকত তাহলে নিশ্চয়ই কোনো কার্যকর পদক্ষেপ সেখানে গ্রহণ করা হতো।"[৯৯] সাংসদ শেখ আনছার আলী বলেন, ষোল বছর এক ব্যক্তির শাসনের পরে একটা সংসদীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর যখন প্রকাশ্য দিবালোকে গুলি চলেছে, তখন চিন্তা করলাম গত বছরগুলোতে কী

Dhaka University Institutional Repository

আন্দোলন করলাম"?[১০০] সবশেষে সংসদ উপনেতা তাঁর বক্তব্যে বলেন, আলোচনার জন্য সংসদ মুলতবী রেখে সরকার এই প্রস্তাব আনন্দের সাথে গ্রহণ করেছে। শুধু এই একটি কথাই মস্ত বড় প্রমাণ যে, সরকার স্বীকার করে এই পরিস্থিতির গুরুত্ব এবং আমরা আলোচনার মাধ্যমে এর সমাধান বের করার জন্য আগ্রহী এবং উদগ্রীব। এই আন্তরিকতা সম্বন্ধে আমাদের বিরুদ্ধে কারও কোনো রকম সন্দেহ পোষণ করা সঠিক নয়।[১০১]

৫. জরুরী জন-গুরুত্বসম্পন্ন বিষয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা (কার্যপ্রণালী-বিধি ৬৮)

কোনো জরুরী জন-গুরুত্বসম্পন্ন বিষয়ের ওপর আলোচনা করার জন্য অন্যূন দু'দিনের নোটিশে আইনসভার যে কোনো সাংসদ প্রস্তাব উত্থাপন করতে পারেন। তবে এরূপ প্রস্তাবের জন্য উত্থাপনকারী ছাড়াও অতিরিক্ত পাঁচ জন সাংসদের সমর্থন প্রয়োজন হয়। এ ধরনের প্রস্তাব গৃহীত হলে সংসদে আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। এর মাধ্যমে সদস্যরা সরকারের কাজের সমালোচনা করে নির্দিষ্ট কোনো বিষয়ে তাঁদের মতামত জ্ঞাপন করতে পারেন। ফলে সরকার তার দায়িত্ব পালনের সময় সচেতন থাকে।

পঞ্চম পার্লামেন্টে জরুরী জন-গুরুত্বসম্পন্ন বিষয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনার জন্য ৮১১টি নোটিশ জমা দেয়া হয়। তন্মধ্যে ৮৫টি প্রস্তাব সংসদে আলোচনার জন্য গৃহীত হয়। তবে গৃহীত ৮৫টি প্রস্তাবের মধ্যে সংসদে ৩৯টির ওপর আলোচনা করা হয় (দেখুন সারণী-৫.৩)। বাকী ৭২৬টি প্রস্তাব বাতিল এবং ৪৬টি সময়াভাবে তামাদি হয়ে যায়। নোটিশ সমূহের মধ্যে ২৩টি ৬২ বিধির এবং ১টি ১৪৭বিধির আওতায় প্রাপ্ত। একটি সম্পর্কে ৭১ বিধির আওতায় সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী বিবৃতি প্রদান করেন।

জরুরী জন-গুরুত্বসম্পন্ন বিষয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনার জন্য স্পীকার কর্তৃক গৃহীত ৮৪টি প্রস্তাবের মধ্যে সরকার দলীয় ২২টি এবং বিরোধী দলগুলোর ৬২টি প্রস্তাব ছিলো। বিরোধী দলগুলোর ৬২টি প্রস্তাবের মধ্যে আওয়ামীলীগের ৩৫, জামাত-ই-ইসলামীর ১২, জাতীয় পার্টির ৬, ওয়ার্কাসের ৫, এন.ডি.পি ৩ এবং বাকশাল সংসদ-সদস্যদের ১টি সংক্ষিপ্ত প্রস্তাব ছিলো। সংক্ষিপ্ত আলোচনায় ৩৭৭ জন সাংসদ অংশগ্রহণ করেন।

সংক্ষিপ্ত আলোচনার জন্য সংসদে উত্থাপিত ও আলোচিত ৩৯টি প্রস্তাবের মধ্যে ৩০টি প্রস্তাব ছিলো জাতীয় বিষয় সম্পর্কিত, আটটি প্রস্তাব ছিলো আঞ্চলিক বিষয় সম্পর্কিত এবং একটি প্রস্তাব ছিলো ব্যক্তিগত সম্পর্কীয়।

Dhaka University Institutional Repository

উল্লেখ্য যে, জরুরী জন-গুরুত্বসম্পন্ন বিষয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনায় স্পীকার কর্তৃক গৃহীত ৮৪টি প্রস্তাবের মধ্যে ১৬টি প্রস্তাব গৃহীত এবং সংসদে উত্থাপিত ও আলোচিত ৩৯টি সংক্ষিপ্ত আলোচনা প্রস্তাবের মধ্যে ৯টি সংসদে আলোচনা করা হয় বিরোধী দলগুলো একাধিক্রমে সংসদ বর্জন ও পদত্যাগের পর।

সংক্ষিপ্ত আলোচনা প্রস্তাবগুলোর অধিকাংশই ছিলো-গাছ-পালা ও বনভূমি ধ্বংস, ইরাকও কুয়েত হতে ফেরত আসা বাংলাদেশী নাগরিকদের স্ব-স্ব কর্মক্ষেত্রে নিয়োগ, বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সমস্যা, বাবরী মসজিদ ধ্বংস, নদী ভাংগন ও গৃহহীনদের পুনর্বাসন, রোহিংগা সমস্যা, নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি, বিদ্যুৎ সমস্যা, কৃষি সমস্যা, ফারাক্কা সমস্যা, ঘূর্ণিঝড়, বন্যা, আইন-শৃঙ্খলার অবনতি, শিল্প সমস্যা ইত্যাদি।

সাংসদ শাজাহান খান উত্থাপিত ২০ ফেব্রুয়ারী ৯৩ কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে হামলা প্রসঙ্গে সংক্ষিপ্ত আলোচনায় [১০২] সংসদ-সদস্য আব্দুর রাজ্জাক বলেন, "গত ২১ ফেব্রুয়ারী শহীদ মিনারে যে ঘটনা ঘটেছে বাংগালী জাতির ইতিহাসে একটি কলংকময় ঘটনা। ১৯৫২ সাল থেকে ১৯৯২ সাল পর্যন্ত শহীদ মিনারে এ রকম ঘটনা কোনোদিন ঘটেনি। যে আন্দোলনের মাধ্যমেই বাংলাদেশে বাংগালী জাতীয়তাবাদ প্রতিষ্ঠা এবং বাংলাদেশে স্বাধীনতার আন্দোলন হয়েছিলো। সেই ভাষা আন্দোলনের শহীদদেরকে অবমাননা করা হয়েছে। এর মাধ্যমে সেই শহীদদেরকেই অপমান করে নাই, বাংগালী জাতি, বাংলার স্বাধীনতাকে ধুলায় লুণ্ঠিত করার জন্যেই আমি সবার সংগে স্বীকার করি এক পরিকল্পিত চক্রান্ত করা হয়েছে। এর দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি চাই।"[১০৩] বিরোধী দলীয় চীফ হুইপ মোঃ নাসিম বলেন, "শহীদ মিনার বাংগালী জাতি সত্তার সংগ্রাম প্রতিবাদ ও আত্মপরিচয়ের স্মৃতি চিহ্ন। এই শহীদ মিনারের বিরুদ্ধে অনেক আক্রমন হয়েছে। আজকের আলোচনায় আমরা অবশ্যই যারা ২০ তারিখের ঘটনার সংগে জড়িত তাদের শাস্তি ও নির্মূল চাই।"[১০৪] এ প্রসঙ্গে পূর্তমন্ত্রী ব্যারিষ্টার রফিকুল ইসলাম বক্তব্য দিতে গিয়ে বলেন, ২০ তারিখ রাতে আমাদের জাতীয় জীবনে একটি কলংকময় ঘটনা ঘটেছে। পবিত্রতম শহীদ মিনারে এই পাশবিক বর্বরোচিত হামলার জন্য আমি তীব্র নিন্দা জ্ঞাপন করছি। যারাই এই হামলার সংগে জড়িত হোক না কেন এবং যতবড় মাস্তানই তারা হোক না কেন তাদেরকে খুঁজে বের করে বাংলাদেশের পবিত্রতম মাটিতেই তাদের বিচার আমাদের করতে হবে।[১০৫]

Dhaka University Institutional Repository

৬. জরুরী জন-গুরুত্বসম্পন্ন বিষয়ে মনোযাগ আকর্ষণ (কার্যপ্রণালী-বিধি ৭১)

মনোযোগ আকর্ষণী প্রস্তাবের মাধ্যমে সংসদ-সদস্যরা চলতি কোনো জরুরী গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারেন। অনুরূপ প্রস্তাবে উত্থাপিত বিষয় সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীকে বিবৃতি দিতে হয়। এভাবে সরকারকে সংসদের কাছে জবাবদিহি করা যায়।

পঞ্চম পার্লামেন্টে ৫৮৮০টি মনোযোগ আকর্ষণ প্রস্তাবের নোটিশ আসে। তার মধ্যে স্পীকার কর্তৃক বিবৃতি দানের জন্য ৫৮১টি প্রস্তাব গৃহীত হয়। তবে গৃহীত প্রস্তাবের মধ্যে ৩৪০টি প্রস্তাব সংসদে উত্থাপিত হয় এবং এর ওপর সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীরা সংসদে বিবৃতি প্রদান করেন (দেখুন সারণী ৫.৩)। বাকী প্রস্তাবগুলোর ৫২৯৯ টি বাতিল এবং ২৬৮টি তামাদি হয়ে যায়।

পার্লামেন্টে আলোচনা ও বিবৃতি দানের জন্য গৃহীত ৫৮১টি মনোযোগ আকর্ষণী প্রস্তাবের মধ্যে সরকারী দলীয় সদস্যদের ছিলো ৩২১টি এবং বিরোধী দলীয় সদস্যদের ছিলো ২৬০টি প্রস্তাব। বিরোধী দলীয় প্রস্তাবগুলোর মধ্যে আওয়ামীলীগের ১৪১, জামাত-ই-ইসলামীর ৬০, জাতীয় পার্টির ২৩, স্বতন্ত্র ও ইসলামী ঐক্যজোটের ৭টি করে, ওয়ার্কাস ৯, জাতীয় গণতন্ত্রী পার্টি, গণতন্ত্রী, বাকশাল, ও বাংলাদেশ কম্যুনিষ্ট পার্টির যথাক্রমে ৩ এবং জাসদ (সাজাহান সিরাজ) ১টি মনোযোগ প্রস্তাব গৃহীত হয়। উল্লেখ্য যে, বিরোধী দলগুলোর একাধিক্রমে সংসদ বর্জন ও পদত্যাগের পর একতরফাভাবে সরকারী দলের ২০৫টি মনোযোগ আকর্ষণী প্রস্তাব গৃহীত হয়।

সংসদে উত্থাপিত মনোযোগ আকর্ষণ প্রস্তাবের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলো- আইন-শৃংখলা পরিস্থিতি, ছাত্র-শিক্ষক ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সমস্যা, চিকিৎসা, বন্যা,খড়া, নারী নির্যাতন বন্ধ ও তাদের কর্মসংস্থান, নদী ভাংগন, নদী খনন, রাস্তা-ঘাট, সেতু নির্মাণ, এনজিও, কুটির শিল্প, বৃহৎ শিল্প, চোরাচালান, বিদ্যুৎ, কৃষি, সেচ, শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচী, চিংড়ি প্রকল্প, ঢাকার দূষিত পরিবেশ ইত্যাদি।

মনোযোগ আকর্ষনী প্রস্তাব উত্থাপন করে সদস্যরা বিভিন্ন সমস্যা সংসদে তুলে ধরেন এবং সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীরা সরকারী দৃষ্টিকোণ হতে উত্থাপিত সমস্যা সম্পর্কে ব্যাখ্যা দেন এবং সমস্যা সমাধানকল্পে সরকারের গৃহীত ব্যবস্থাদি সংসদকে অবহিত করেন। কোনো কোনো ক্ষেত্রে মন্ত্রীরা প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়ার আশ্বাস প্রদান করেন। কার্যপ্রণালী বিধি অনুযায়ী মনোযোগ আকর্ষনী প্রস্তাবের ওপর মন্ত্রীর বিবৃতি প্রদানের পর সদস্যরা তাঁকে প্রশ্ন করতে পারেন। তবে যে সব প্রস্তাবের ওপর প্রশ্ন করা হয় তার অধিকাংশ ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীরা উত্তর এড়িয়ে যান।

Dhaka University Institutional Repository

সংসদে উত্থাপিত মনোযোগ আকর্ষণী প্রস্তাবগুলোর ওপর মন্ত্রীদের সন্তোষজনক বিবৃতির ওপর সংসদীয় পদ্ধতির সফলতা অনেকাংশে নির্ভর করে। এছাড়া মন্ত্রীদের বিবৃতিগুলো তথ্যভিত্তিক, নিখুঁত ও বাস্তবসম্মত হতে হয়। সংসদ-সদস্য অধ্যক্ষ এম, নজরুল ইসলাম একটি মনোযোগ আকর্ষণী প্রস্তাবে বলেন, "সরকার সম্প্রতি সুদসহ পাঁচ হাজার টাকার কৃষি ঋণ, লোন ও পঁচিশ বিঘা পর্যন্ত জমির খাজনা মাফ করলেও এই ঘোষণা সম্বলিত কোনো চিঠি কৃষি লোনদাতা ব্যাংকগুলোর শাখাতে এবং তহশীল অফিসগুলোতে এখনও পৌঁছে নাই। ফলে অনাদায়ী লোন ও জমির খাজনা পরিশোধের অজুহাতে নতুন কোনো কৃষি লোন দেয়া হচ্ছেনা। অথচ কৃষি কাজ শুরু করবার এখনই যথার্থ সময়। অবিলম্বে এ ব্যবস্থা কার্যকরী করার জন্য মাননীয় মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।"[১০৬] এর উত্তরে অর্থ মন্ত্রী তাঁর বক্তব্যে বলেন, পাঁচ হাজার টাকা সুদসহ কৃষি ঋণ মওকুফের যাবতীয় নীতিমালা, নির্দেশাবলী, শর্তানুযায়ী বাংলাদেশ ব্যাংক ১৬, ০৬, ৯১ তারিখে সার্কুলার নং কৃষি ঋণ বি/পরিচয় পত্র - ৬/৯১ জারি করেছে। ভূমি প্রতিমন্ত্রী ২৫ বিঘা জমির খাজনা মাফ করার প্রেক্ষিতে বলেন, মন্ত্রণালয় কর্তৃক ইহা বাস্তবায়নের জন্য ৪মে ৯১ তারিখে জেলা প্রশাসক সহ সংশ্লিষ্ট কর্ম-কর্তাদের নিকট আদেশ প্রেরণ করা হয়েছে।[১০৭] সাংসদ শেখ হারুনর রসিদ একটি জন-গুরুত্বসম্পন্ন মনোযোগ আকর্ষণী প্রস্তাবে বলেন, "সম্প্রতি সুন্দর বনে মানুষ খেকো রয়েল বেঙ্গল টাইগারের আক্রমনে গত ছয় মাসে পাঁচশত লোক মারা যায়। ফলে কর্মরত শ্রমিকরা জীবিকা অর্জনের জন্য প্রাণের ভয়ে বনে যেতে সাহস পাচ্ছে না। এরূপ পরিস্থিতিতে অবিলম্বে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ ও ক্ষতিপূরণ বাবদ প্রতি ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারকে দু'লক্ষ টাকা দেয়া প্রয়োজন।"[১০৮]এই প্রশ্নের প্রস্তাবে পরিবেশ ও বন প্রতিমন্ত্রী বলেন, পাঁচশত লোক মৃত্যু বরণ করেছে তাহা সত্য নয়; বিগত সাত মাসে বত্রিশ জন বাওয়ালী, জেলে ও মৌয়াল মৃত্যুবরন করেছে। ইহা সত্য যে, মৃত্যু ব্যক্তির পরিবারকে আর্থিক সহায়তার কোনো বিধান বা তহবিলের কোনো কার্যকরী ব্যবস্থা বন বিভাগের নাই।[১০৯]

৭. জরুরী জন-গুরুত্বসম্পন্ন বিষয়ে সদস্য কর্তৃক বিবৃতি (কার্যপ্রণালী-বিধি ৭১ক)

এই বিধি অনুযায়ী একজন সাংসদ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে দু'মিনিট করে বক্তব্য রাখতে পারবেন। এর জন্য বরাদ্দ সময় ত্রিশ মিনিটের বেশী হবে না এবং এ সময়ের মধ্যে যতজন সদস্যের বক্তব্য রাখা সম্ভব ততজনই বক্তব্য রাখতে পারবেন। এ বিধি অনুযায়ী কেবলমাত্র প্রত্যেক নোটিশ দাতা সদস্যই বিবৃতি প্রদান করেন।

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম সংসদে উপর্যুক্ত বিষয়ে সদস্য কর্তৃক মোট বিবৃতির সংখ্যা ছিলো ৭৯৯টি। এর মধ্যে বিরোধী দল সংসদ একাধিক্রমে বর্জন ও পদত্যাগের পূর্বে ৪৫৭টি বিবৃতি প্রদান করা হয়। তন্মধ্যে সরকার দলীয় সদস্যদের ৫৪টি, আওয়ামীলীগের ২১৯টি, জামাত-ই-ইসলামীর ১৩২টি, জাতীয় পার্টির ২৯টি, ইসলামী ঐক্য জোটের ১৬টি, বাংলাদেশ কম্যুনিষ্ট পার্টির ৩টি, স্বতন্ত্র ২টি, ওয়াকার্স এবং জাসদ (সাজাহান সিরাজ) সদস্যদের যথাক্রমে ১টি করে বিবৃতি ছিলো। বাকী ৩৪২টি বিবৃতি ছিলো সরকার দলীয় সদস্যদের বিরোধী দলের অনুপস্থিতিতে।

সদস্য কর্তৃক বিবৃতি প্রদানের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো হলো- নদীর ভাংগন রোধ, যোগাযোগ, বিদ্যুৎ, নদী খনন, ফারাক্কা সমস্যা, ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, আইন-শৃংখলার অবনতি, প্রবাসীদের সমস্যা, কৃষি ঋণ, মৎস্য, বনভূমি উজাড়, শিল্প, চিকিৎসা ইত্যাদি।

৮. বেসকারী সদস্যদের সিদ্ধান্ত-প্রস্তাব (কার্যপ্রণালী-বিধি ১৩০-১৪৪)

জনগণের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সরকারের করণীয় সম্পর্কে বেসরকারী সদস্যরা প্রস্তাব উত্থাপন করতে পারেন। এর উদ্দেশ্য হলো কোনো নির্দিষ্ট বিষয়ে পার্লামেন্টের মতামত জ্ঞাপন বা সুপারিশ প্রদান করা। একজন বেসরকারী সদস্য সিদ্ধান্ত-প্রস্তাব উত্থাপন করতে চাইলে তাঁকে অন্যূন দশ দিনের নোটিশ প্রধান করতে হবে এবং তিনি যে প্রস্তাবটি উত্থাপন করতে চাহেন, তাঁর প্রতিলিপি উক্ত নোটিশের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট করে দিবেন।

পঞ্চম পার্লামেন্টে বেসরকারী সংসদ-সদস্যরা সিদ্ধান্ত-প্রস্তাবের মোট ৫৫৩২৩ টি নোটিশ প্রদান করেন। তার মধ্যে ১৮৫০০টি প্রস্তাব ব্যালটে প্রদানের জন্য স্পীকার কর্তৃক গৃহীত হয়। তবে ব্যালটে স্থান লাভ করে ৩২৪ টি প্রস্তাব। তন্মধ্যে সংসদে উত্থাপিত হয় ১৮৮ টি প্রস্তাব কিন্তু আলোচিত হয় ১১১ টি প্রস্তাব। আলোচিত প্রস্তাবগুলোর মধ্যে সংসদে মাত্র ৫ টি প্রস্তাব গৃহীত হয় (দেখুন সারণী ৫.৩)। সিদ্ধান্ত-প্রস্তাব আলোচনায় ৬১২ জন সাংসদ অংশগ্রহণ করেন এবং পাঁচটি প্রস্তাব কমিটিতে প্রেরিত হয়। গৃহীত পাঁচটি প্রস্তাবের তিনটি সরকার দলীয় সদস্যদের, একটি জাতীয় পার্টির এবং একটি ছিলো স্বতন্ত্র সদস্যের। কমিটিতে প্রেরিত ছয়টি প্রস্তাবের চারটি আওয়ামীলীগ সদস্যদের, একটি সরকার দলীয় সদস্যের এবং একটি ছিলো জামাত-ই-ইসলামী সদস্যের।

Dhaka University Institutional Repository

জাতীয় সংসদে গৃহীত বেসরকারী পাঁচটি সিদ্ধান্ত-প্রস্তাব নিম্নে উল্লেখ করা হলো।

ক) পর্যায়ক্রমে দেশেরে প্রত্যেকটি হাসপাতালে মহিলাদের মৃতদেহ স্ব-স্ব ধর্মীয় মর্যাদায় পৃথকভাবে রাখার জন্য মর্গের ব্যবস্থা করার প্রস্তাব (BNP)।[১১০]

খ) উপকূলীয় এলাকায় জলদস্যু দমনে নৌ পুলিশ বাহিনী গঠন করার প্রস্তাব (স্বতন্ত্র)।[১১১]

গ) লক্ষ্মীপুর জেলা সদর হতে রামগতি সড়কটি পুরাতন থানা সদর রামগতি হাট পর্যন্ত পর্যায় ক্রমে সম্প্রসারণ করার প্রস্তাব (BNP)।[১১২]

ঘ) মৌলভীবাজার জেলার অধীন সড়ক ও জনপথ বিভাগের মালিকানাধীন জুড়ি-বড়লেখা-শাহবাজপুর সড়কের বড়লেখা শাহবাজপুর অংশ পর্যায়ক্রমে পাকা করার প্রস্তাব (জাতীয় পার্টি)।[১১৩]

ঙ) ময়মনসিংহ জিলার শম্ভুগঞ্জ সেতু হতে শহরের ভিতর দিয়ে অতিবাহিত ময়মনসিংহ-ঢাকা-হাইওয়ে বর্তমান যানজট ও দূর্ঘটনা এড়ানোর লক্ষ্যে একটি বাইপাস রাস্তা নির্মান করার প্রস্তাব (BNP)।[১১৪]

সংসদে আলোচিত হয়েছে অথচ গৃহীত হয়নি এরূপ উল্লেখযোগ্য বেসরকারী সিদ্ধান্ত-প্রস্তাবগুলো হলো ঃ কৃষি ঋণ সুদের হার কমানো ও মওকুফকরণ, বিভিন্ন প্রকল্প নির্মাণ, শিক্ষামূলক প্রতিষ্ঠানের সুযোগ-সুবিধা, যোগাযোগ ব্যবস্থা, চিকিৎসা, হাট-বাজারের ইজারাদারী প্রথা বন্ধকরণ, বিবাহ রেজিষ্ট্রার নিয়োগ, বিভাগ ঘোষণা, চামড়া রপ্তানী, নদীর ভাংগন রোদ ও ড্রেজিং করা, গ্যাস, জন্ম নিয়ন্ত্রণ বাধ্যতামূলক, সুদমুক্ত ব্যাংকিং, বিদ্যুৎ, থানা পৌরসভা ঘোষণা, আইন-শৃংখলার উন্নয়ন, কুটির শিল্প ও সামুদ্রিক বন্দর নির্মাণ ইত্যাদি।

বিরোধী দলীয় সাংসদ রহমত আলী শিক্ষার হার বৃদ্ধির জন্য প্রত্যেক গ্রামে একটি করে সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করার জন্য সিদ্ধান্ত-প্রস্তাব উত্থাপন করেন। শিক্ষার ওপর বিরোধী দলীয় সদস্যরা বিভিন্ন সমস্যা তুলে ধরেন। তাঁদের মতে, মেয়েদের স্কুলে না যাওয়া, গরীব কৃষকদের সন্তান ও মধ্যবিত্ত ঘরের অনেক সন্তানদের স্কুল ফাঁকি দেওয়ার প্রধান অন্তরায় বাড়ী থেকে দূরে অবস্থিত প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। এছাড়া, এক্ষেত্রে জনসংখ্যার ঘনত্বের কথাও উল্লেখ করা হয়েছে। এ সকল সমস্যা সমাধানের জন্য সাংসদরা সরকারী প্রাইমরী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠার ওপর অভিমত ব্যক্ত করেন। তাঁরা আরো বলেন, শিক্ষা জাতির মেরুদণ্ড তাই শিক্ষার উন্নয়ন ছাড়া দেশে গণতন্ত্রের প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেয়া সম্ভব নয়।[১১৫] বিরোধী দলের এই প্রস্তাবের সাথে শিক্ষামন্ত্রী একমত পোষণ করে বলেন যে, প্রাইমারী স্কুল, মাদ্রাসা, মক্তবের হিসাব মিলিয়ে দেশে এখন ৬৮ হাজারের বেশী

Dhaka University Institutional Repository

প্রাথমিক শিক্ষার প্রতিষ্ঠান ছাড়িয়ে যাবে। কাজেই আমরা একটি মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার কাজটি হাতে নিয়েছি।[১১৬] পরে সিদ্ধান্ত-প্রস্তাবটি সংসদ ভোটে বাতিল হয়ে যায়।

সংসদ সদস্য সরদার সাখাওয়াত হোসেন বকুল দেশের গ্রাম এলাকার সমস্ত বিদ্যুৎ গ্রাহকদের জেলা বিদ্যুৎ সরবরাহ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ৩১ ডিসেম্বর, ৯২ তারিখের মধ্যে মিটার সরবরাহ বাধ্যতামূলক করার ওপর সিদ্ধান্ত-প্রস্তাব উত্থাপন করেন। তাঁর মতে, আমার নিজস্ব এলাকার অভিজ্ঞতা থেকে বলতে চাই বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের লাইনম্যান গ্রামের নিরীহ জনসাধারণকে বিনা ইষ্টিমেটে, বিনা মিটার সরবরাহে লাইন দিয়ে থাকে। কিন্তু দেখা যায় বিদ্যুৎ বিলের খাতায় তাদের নাম নেই এবং অবৈধ বিদ্যুৎ ব্যবহার করে আসছে। এর মাশুল স্বরূপ এ ধরনের লোকদের তিন-চার মাস পর দিতে হয় ল্যাংগুয়েজ এভারেজ বিল নামে সাদা কাগজে সই করে ৮ থেকে ১০ হাজার টাকা। এখানেই শেষ নয়; টাকা দিলেও, না দিলেও পরে হাজির হতে হয় মালিবাগ বিদ্যুৎ আদালতে। এটা আর এক ভূতের আড্ডাখানা।[১১৭]এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করে মন্ত্রী বলেন, মিটার ছাড়া কোনো গ্রাহক বিদ্যুৎ সংযোগ কোনো কর্তৃপক্ষের মাধ্যমেই পায়না। অবশ্য অবৈধ গ্রাহকরা কিছু অসাধু কর্মকর্তাদের কাছ থেকে এভাবে বিদ্যুৎ নিয়ে থাকে এবং শাস্তি পায়। তবে ঐ সব অসাধু কর্মকর্তাদের কাছ থেকে কিছু সাধারণ লোকেরাও হয়রানির স্বীকার হচ্ছে। এজন্য এই অসাধুতা দূর করবার জন্য কঠোর ব্যবস্থা নেয়া হবে। পরে সিদ্ধান্ত-প্রস্তাবটি উক্ত সাংসদ সংসদ ভোটে প্রত্যাহার করে নেন।[১১৮]

৯. প্রস্তাব (সাধারণ) (কার্যপ্রণালী-বিধি ১৪৭)

জনস্বার্থ সম্পর্কিত কোনো বিষয় সম্পর্কে আলোচনার জন্য আইনসভার যে কোনো সদস্য প্রস্তাব (সাধারণ) নোটিশ সংসদ অফিসে প্রেরণ করতে পারেন। স্পীকারের অনুমতিক্রমে উত্থাপিত কোনো প্রস্তাব আলোচনার জন্য স্পীকার সংসদ নেতার পরামর্শক্রমে সময় নির্ধারণ করে দেন এবং উক্ত সময়ে আলোচনা করা হয়।

পঞ্চম জাতীয় সংসদে ৩৭৭ টি প্রস্তাব (সাধারণ) নোটিশ আসে। তন্মধ্যে স্পীকার কর্তৃক গৃহীত ৩৩ টির মধ্যে সংসদে উত্থাপিত ও আলোচিত হয় ২৬ টি প্রস্তাব (দেখুন সারণী-৫.৩) অবশিষ্ট ৩৪৫ টি বাতিল এবং ২ টি সময়াভাবে তামাদি হয়ে যায়। গৃহীত একটি প্রস্তাব ৬৮ বিধির আওতায় আলোচিত হয় এবং একটি কমিটিতে প্রেরিত হয়।[১১৯] স্পীকার কর্তৃক গৃহীত ২ টি প্রস্তাব সংশ্লিষ্ট সদস্য কর্তৃক প্রত্যাহৃত হয়।

Dhaka University Institutional Repository

স্পীকার কর্তৃক গৃহীত ৩৩ টি প্রস্তাবের মধ্যে সরকার দলীয় সদস্যদের ৯টি এবং বিরোধী দলীয় সদস্যদের ২৪টি প্রস্তাব ছিলো। বিরোধী দলীয় ২৪টি প্রস্তাবের মধ্যে আওয়ামীলীগ সদস্যদের ৭, জামাত-ই-ইসলামীর ১২, জাতীয় পার্টি ও স্বতন্ত্রের ২টি করে এবং ইসলামী ঐক্য জোট সদস্যদের ১টি প্রস্তাব ছিলো। বিশেষ দ্রষ্টব্য যে, সরকার দলীয় সদস্যদের ৬টি প্রস্তাব (সাধারণ) নোটিশ আসে বিরোধী দলের একাধিক্রমে সংসদ বর্জন ও পদত্যাগের পর। তন্মধ্যে স্পীকার কর্তৃক সংসদে পাঁচটি গৃহীত এবং দু'টি আলোচিত হয়।

প্রস্তাব (সাধারণ) এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলো অপারেশন পুশ ব্যাক, ডঃ আহমদ শরীফের ধর্ম অবমাননা, বাবরী মসজিদ, হেবরণ শহরের মসজিদে হত্যাকান্ড, সড়ক দূর্ঘটনা, বিরোধী দলের হরতাল সংক্রান্ত ইত্যাদি।

সংসদে আলোচনার পর নিস্পত্তি করা হয় দু'টি সাধারণ প্রস্তাব। প্রস্তাব দু'টি নিম্নে উল্লেখ করা হলো।

ক) সারা দেশব্যাপী সড়ক দূর্ঘটনার সংখ্যা আশংকাজনক ভাবে বৃদ্ধি পাওয়ার বিষয়ে কার্যপ্রণালী-বিধির ১৪৭ বিধি মোতাবেক প্রস্তাব (সাধারণ) আলোচনা।[১২০]

খ) ১৮ জানুয়ারী, ১৯৯৫ তারিখে সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট ডিভিশন ১৪৭ জন সংসদ-সদস্যের পদত্যাগ সংক্রান্ত দু'টি রীট মামলার পৃথক দু'টি রুল নীশি জারী করার বিষয়ে কার্যপ্রণালী-বিধির ১৪৭ বিধি মোতাবেক প্রস্তাব (সাধারণ) আলোচনা।[১২১]

১০. বিশেষ অধিকার প্রস্তাব (কার্যপ্রণালী-বিধি ১৬৪)

কোনো সদস্যের বা সংসদের বা সংসদের কোনো কমিটির বিশেষ অধিকার ক্ষুণ্ন হয়েছে বলে যে কোনো সদস্য বৈঠক আরম্ভ হবার পূর্বে বিশেষ অধিকারের প্রশ্ন সংসদে উত্থাপন করতে পারেন। এরূপ ক্ষেত্রে সচিবের নিকট লিখিতভাবে নোটিশ প্রদান করতে হয়। তবে শর্ত থাকে যে, স্পীকার বিষয়টিকে জরুরী মনে করলে বৈঠক চলাকালে প্রশ্নকাল সমাপ্তির পরে যে কোনো সময় তিনি বিশেষ অধিকারের প্রশ্ন উত্থাপনের অনুমতি দিতে পারেন।

পঞ্চম পার্লামেন্টে ১০৭৮ টি বিশেষ অধিকার প্রস্তাবের নোটিশ প্রদান করা হয়। তার মধ্যে স্পীকার কর্তৃক গৃহীত হয় ২০৩টি। গৃহীত নোটিশ সমূহের ২০১টি নোটিশ বিভিন্ন কমিটিতে প্রেরণ করা হয়। বাকী ৮৭৫টি বিশেষ অধিকার প্রস্তাবের নোটিশ বাতিল করা হয়।

Dhaka University Institutional Repository

স্পীকার কর্তৃক গৃহীত বিশেষ অধিকার প্রস্তাবের নোটিশ সমূহের মধ্যে সরকার দলীয় সদস্যদের ৩৭টি এবং বিরোধী দলীয় সদস্যদের ১৬৬টি নোটিশ ছিলো। বিরোধী দলীয় সদস্যদের নোটিশ সমূহের মধ্যে আওয়ামীলীগ সদস্যদের ১১৩, জাতীয় পার্টি ১৭, জামাত-ই-ইসলামী ১৭, বাংলাদেশ কম্যুনিষ্ট পার্টি ৭, স্বতন্ত্র ৫, বাকশাল ও গণতন্ত্রীর ২টি করে, এন, ডি, পি, জাসদ এবং বাংলাদেশ ওয়ার্কাস সদস্যদের ১টি করে বিশেষ অধিকার প্রস্তাবের নোটিশ ছিলো। বিশেষ দ্রষ্টব্য যে, বিশেষ অধিকার প্রস্তাবে সরকার দলীয় সদস্যদের ১৪টি নোটিশ ছিলো সংসদ থেকে বিরোধী দলীয় সদস্যদের একাধিক্রমে বর্জন ও পদত্যাগের পর।

বিশেষ অধিকার প্রস্তাবের নোটিশ সমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলো মহিলা আসন, ব্যাংকের ঋণ গ্রহণ, কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচী বাস্তবায়ন প্রকল্প, ওয়ারেন্ট অব প্রিসিডেন্স, ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস, বন্যা, ত্রাণ মন্ত্রণালয় ও রেডিও গ্রামকে উপেক্ষা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সমস্যা, চোরাচালান প্রতিরোধ, কমিটির সভাপতি, সংসদ-সদস্যদের শুল্ক মুক্ত গাড়ী কেনার অনুমতি না দেয়া, প্রধানমন্ত্রীর ভাষণ সংক্রান্ত ইত্যাদি।

বিশেষ অধিকার কমিটিতে প্রেরিত গুরুত্বপূর্ণ তিনটি বিশেষ অধিকার প্রস্তাব নিম্নে উল্লেখ করা হলো।

ক) জনগণের সরাসরি ভোটে নির্বাচিত সদস্যগণের তুলনায় মহিলা সদস্যরা সংসদ-সদস্য কর্তৃক নির্বাচিত হওয়া সত্ত্বেও মহিলা সদস্যগণকে ১০টি এলাকার কর্মকান্ডে কর্তৃত্ব প্রদান করে একটি সরকারী আদেশ জারী করা হয়। তাতে মাননীয় সংসদ-সদস্যদের অধিকার ক্ষুণ্ন হয়েছে বলে ১৬৮ বিধিতে নোটিশ প্রদান করেন।[১২২]

খ) বর্ষা মৌসুমে কাজের বিনিময়ে খাদ্য (টি, আর) কর্মসূচী বাস্তবায়ন প্রকল্প প্রণয়নে ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও মাননীয় সংসদ-সদস্যদের পরামর্শ গ্রহণ না করায় বিশেষ অধিকার ক্ষুণ্ন। এর ওপর কমিটির রিপোর্ট সংসদে উপস্থাপিত হওয়ার পর সংসদে গৃহীত হয়।[১২৩]

গ) The Members of Parliament (Remuneration and Allowances) Order, 1973. (As modified up to date) এর Article 3(c) অনুযায়ী জাতীয় সংসদের সদস্য হিসাবে শুল্ক করমুক্ত একটি করে গাড়ী/জীপ আমদানী করার অধিকারী হলেও আমদানী করতে অনুমতি না দেয়ায় বিশেষ অধিকার ক্ষুণ্ন।[১২৪]

Dhaka University Institutional Repository

১১. বৈধতার প্রশ্ন (কার্যপ্রণালী-বিধি ৩০১

সংসদে বিবেচনাধীন বিষয়ের ওপর অর্থাৎ সংসদের কার্যাবলী নিয়ন্ত্রণকারী সংবিধানের অনুচ্ছেদ সমূহের ব্যাখ্যা ও কার্যকারিতা সম্পর্কে বৈধতার প্রশ্ন উত্থাপন করা যায়। তবে শর্ত থাকে যে, কোনো বৈধতার প্রশ্ন যদি সংসদের শৃঙ্খলা রক্ষা বা সংসদের কাজের ব্যবস্থাপনার সাথে সম্বন্ধযুক্ত হয়, তা হলে স্পীকার কোনো সদস্যকে কার্যসূচীর এক দফা শেষ হওয়া ও অন্য দফা আরম্ভ হওয়ার মধ্যবর্তী সময়ে অনুরূপ বৈধতার প্রশ্ন উত্থাপনের অনুমতি দিতে পারবেন। এর ওপর বিতর্ক হয় না; তবে স্পীকার সঙ্গত মনে করলে তাঁর সিদ্ধান্ত প্রদানের পূর্বে সদস্যদের বক্তব্য শুনতে পারবেন। বৈধতার প্রশ্ন কোনো বিশেষ অধিকার প্রশ্ন নহে।

পঞ্চম পার্লামেন্টে সংসদে উত্থাপিত ৪০টি বৈধতার প্রশ্নের ওপর ২৩৮ জন সাংসদ আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। বৈধতার প্রশ্নে স্পীকারের রুলিং ছিলো ৫টি এবং ২টি বৈধতার প্রশ্ন বিশেষ অধিকার সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটিতে প্রেরিত হয়।

সংসদে সালাহউদ্দিন কাদের চৌধুরী বাবরী মসজিদে ধ্বংসের মুলতবী প্রস্তাবের ওপর বৈধতার প্রশ্ন উত্থাপন করে বলেন যে, "যাঁরা এর ওপর মুলতবী প্রস্তাব দিয়েছেন তা আপনি কিভাবে সাধারণ আলোচনায় রূপান্তরিত করেছেন"।[১২৫] কর্ণেল (অবঃ) শওকত আলী একই ভাবে মুলতবী প্রস্তাবে সাধারণ আলোচনার সুযোগ দেয়ার ওপর বৈধতার প্রশ্ন করে বলেন, আগামীকাল মুলতবী প্রস্তাবের ওপর আর সিদ্ধান্ত দেয়ার প্রয়োজন হবে না। কারন আজকে বিষয়টি শেষ হয়ে যাচ্ছে।[১২৬] এর ওপর স্পীকার বলেন, "উক্ত বিষয় যদি মুলতবী প্রস্তাব আকারে আনা হয় তাহলে মাত্র দু'ঘন্টা আলোচনার সুযোগ পাওয়া যাবে। এই অল্প সময়ের মধ্যে আলোচনা করা যাবে না বলে আমরা আলোচনাটি ১৪৭ বিধিতে দু'দিনে পাঁচ ঘন্টা আলোচনা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি"।[১২৭]

সাধারণ আলোচনা

১৯৯১-৯৫ সংসদে মোট বারোটি বিষয়ের ওপর বারোটি সাধারণ আলোচনা হয়। বিষয়গুলো হলো- কারা পরিস্থিতি, ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাস, শিক্ষাঙ্গণ পরিস্থিতি, বাংলাদেশ মায়ানমার সীমান্ত পরিস্থিতি, পরিবহন, ধর্মঘট, পররাষ্ট্র নীতি, দেশের আইন-শৃংখলা পরিস্থিতি, মন্ত্রীসভার বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব, গোলাম আযমের বাংলাদেশে অবস্থান ও গণআদালত, পুশইন, ঢাকার লালবাগে হত্যাকান্ড, হেবরন মসজিদে নামাজরত মুসল্লীদের ওপর ইহুদীদের গুলিতে ৬৩ জন মুসলমানের মৃত্যু। এসব আলোচনায় মোট ৩৫২ জন সাংসদ অংশগ্রহণ করেন।

সাধারণ আলোচনায় লালবাগের হত্যাকান্ড, হেবরন মসজিদে মুসল্লীদের মৃত্যু, পুশ ইন এই তিনটি বিষয়ের ওপর তিনটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। পুশ ইন প্রস্তাবে সংসদ ভারতের আচরণ ও কার্যক্রমে গভীর উদ্বেগ ও ক্ষোভ প্রকাশ করে এবং তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে বলে যে, ভারত এ ধরনের যাবতীয় কার্যকলাপ অবিলম্বে বন্ধ করবে বলে আশা করছে।[১২৮] ঢাকায় লালবাগে সংঘটিত হত্যাকান্ডের ওপর গৃহীত প্রস্তাবে সংসদ নৃশংস হত্যাকান্ডের তীব্র নিন্দা জ্ঞাপন করে এবং এ ধরনের ঘটনার পুনরাবৃত্তি রোধকল্পে সকল ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি আহবান জানায়। সংসদ সর্বসম্মতিক্রমে আহত ও নিহতদের প্রতি পূর্ণসহানুভূতি প্রকাশ পূর্বক তাদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা গ্রহণের আহবান জানায়।[১২৯] হেবরন মসজিদে নামাজরত মুসল্লীদের ওপর ইহুদীদের গুলিতে ৬৩ জন মুসলমানের মৃত্যু সম্পর্কিত বিষয়ে গৃহীত প্রস্তাবটিতে বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ ও বাংলাদেশের জনগণ এই জঘন্য হত্যাযজ্ঞের তীব্র নিন্দা জ্ঞাপন ও গভীর শোক প্রকাশ করে এবং আল্লাহ্ পাকের নিকট শহীদদের রুহের মাগফেরাত কামনা করে। সংসদ এই হত্যাযজ্ঞের সাথে জড়িত খুনীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দাবি করে। ভবিষ্যতে এধরনের হত্যাকান্ড প্যালেষ্টাইনের মুসলিম জনগণের ওপর আর যেন সংগঠিত না হয় তৎজন্য ইসরাইল সরকারকে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য সংসদ জোর দাবি জানায়। সংসদের এই প্রস্তাব পি.এল. ও. চেয়ারম্যান ইয়াসির আরাফাত, ও. আই. সি. জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনের নেতৃবর্গ ও জাতিসংঘের মহাসচিব বরাবর জরুরী ভিত্তিতে প্রেরণ করা হোক।[১৩০]

পঞ্চম পার্লামেন্টে কার্যপ্রণালী-বিধি ৩০০ অনুযায়ী ১২৬টি বিবৃতি প্রদান করা হয়। তার মধ্যে সংসদ নেত্রীর ৯টি, বিরোধী দলীয় নেত্রীর ১টি এবং বাকীগুলো সংসদ উপনেতা, স্পীকার, ডেপুটি স্পীকার, মন্ত্রী ও প্রতিমন্ত্রীগণের বিবৃতি। যে সকল বিষয়ের ওপর বিবৃতি প্রদান করা হয় তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলো- ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার, উপকূলীয় অঞ্চলে ঘূর্ণিঝড়ের পূর্বাভাস, ঘূর্ণিঝড়ে বিধ্বস্ত এলাকায় সাহায্য সহযোগিতা, সাংবাদিকের ধর্মঘট, বাস দূর্ঘটনা, বন্যা, পত্রিকায় খবর, কৃষকদের অনশন, নদীভাংগন, পত্রিকা বন্ধ, উপনির্বাচন, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সমস্যা, হত্যা, সন্ত্রাস , আইন-শৃংখলার অবনতি, সংসদ-সদস্যদের বৈঠকে অনুপস্থিতি, দুর্নীতি, ঘোড়াশাল সার কারখানায় গ্যাস বিস্ফোরণে মারাত্মক দূর্ঘটনা, রোহিংগা সমস্যা, সাংবাদিক আহত, পরিবহন ধর্মঘট, তিনবিঘা করিডোর, পতাকা পদদলিত, মসজিদে অগ্নিসংযোগ, হেয়ার রোডের বাড়ী নির্মাণ, গাড়ী ভাংচুর, প্লট বরাদ্দ, আদমজী পাটকলে শ্রমিক সংঘর্ষ ইত্যাদি। আওয়ামীলীগের বিশিষ্ট নেতা ও সংসদ-সদস্য সামসুদ্দিন মোল্লার মৃত্যুতে বিরোধী দলীয় নেত্রী মাত্র একটি বিবৃতি প্রদান করেন। বিবৃতি প্রদান করতে গিয়ে ঘূর্ণিঝড়ের আলোচনাকে কেন্দ্র করে একবার বিরোধী দলের সদস্যরা ওয়াক আউট করেন।

Dhaka University Institutional Repository

সারণী - ৫.৩

পঞ্চম সংসদে আইনসভা কর্তৃক শাসন বিভাগ নিয়ন্ত্রণমূলক কার্যকলাপের খতিয়ান

প্রশ্ন/প্রস্তাব	প্রদত্ত নোটিশের সংখ্যা	স্পীকার কর্তৃক গৃহীত	সংসদে উত্থাপিত	সংসদে আলোচিত	সংসদে গৃহীত
তারকা চিহ্নিত প্রশ্ন	৩৭৯০৭	৯৩৯১	৮৬৯২	৮৬৯২	০০
তারকা চিহ্নবিহীন প্রশ্ন	৯৪৬৩	৩৩৬৩	৩০৫৭	৩০৫৭	০০
স্বল্পকালীন নোটিশের প্রশ্ন	২১৪	১০	৫	৫	০০
অর্ধ-ঘন্টা আলোচনা	১৪৩	১৪	৩	৩	০০
মুলতবী প্রস্তাব	১৮০৩	২৩	২২	২২	০০
সংক্ষিপ্ত আলোচনার প্রস্তাব	৮১১	৮৫	৩৯	৩৯	০০
মনোযোগ আকর্ষণ প্রস্তাব	৫৮৮০	৫৮১	৩৪০	৩৪০	০০
বেসরকারী সদস্যদের সিদ্ধান্ত -প্রস্তাব	৫৫৩২৩	১৮৫০০	১৮৮	১১১	০৫
প্রস্তাব (সাধারণ)	৩৭৭	৩২	২৬	২৬	০০
অনাস্থা প্রস্তাব	১	১	১	১	০০

উৎস ঃ বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ, বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের কার্যবাহের সারাংশ, ১৯৯১-১৯৯৫, ২২ খন্ড।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্যনির্দেশ ও টীকা

১. এরূপ পাঁচটি বিল হলোঃ (ক)The presidents (Remuneration and Privileges) (Amendment) Bill, 1992, (Act No.14 of 1992); (খ) The Prime Minister's (Remuneration and Privileges) (Amendment) Bill, 1992 (Act No. 15 of 1992) ; (গ) The Speaker and Deputy Speaker (Remuneration and Privileges) (Amendment) Bill, 1992 (Act No. 16 of 1992); (ঘ) The Ministers, Ministers of State and Deputy Ministers (Remuneration and Privileges) (Amendment) Bill, 1992 (Act No. 17 of 1992) (ঙ) The Members of Parliament (Remuneration and Allowances) (Amendment) Bill, 1992. (Act No. 18 of 1992)। বিশেষ দ্রষ্টব্য যে, এই বিলগুলো বিশেষ কমিটির রিপোর্টের ভিত্তিতে গৃহীত হয়।

২. অধ্যাদেশের ওপর ওয়াক আউট সংক্রান্ত বিলগুলো হলোঃ (ক) The Dhaka City Corporation (Amendment) Bill, 1992 (Act No. 4 of 1992); (খ) The Chittagong City Corporation (Amendment) Bill, 1992 (Act No. 5 of 1992); (গ) The Khulna City Corporation (Amendment) Bill, 1992 (Act No. 6 of 1992); (ঘ) The Rajshahi City Corporation (Amendment) Bill, 1992 (Act No. 7 of 1992). (ঙ) The Local Government (Upazila Parishad and Upazila Administration Reorganisation) (Repeal) Bill, 1992 (Act No. 2 of 1992); (চ) The Paurashava (Amendment) Bill, 1992 (Act No. 9 of 1992); (ছ) বিনিয়োগ বোর্ড (সংশোধন) বিল, ১৯৯২ (১৯৯২ সনের ১নং আইন); (জ) The local Government (Union Parishads) Bill, 1992 (১৯৯২ সনের ১০নং আইন); (ঝ) The Co-Operative Socities (Amendment) Bill, 1992 (১৯৯২ সনের ১১নং আইন); (ঞ) পানি সম্পদ পরিকল্পনা বিল, ১৯৯২ (১৯৯২ সনের ১২নং আইন); (ট) The Pennal Code (Amendment) Bill, 1991 (Act No. 15 of 1991); (ঠ) মূল্য সংযোজন কর বিল, ১৯৯১ (১৯৯১ সালের ২২নং আইন); (ড) The Presidential Security Force (Amendment) Bill, 1992 (Act No. 24 of 1992); (ঢ) সন্ত্রাসমূলক অপরাধ দমন বিল, ১৯৯২ (১৯৯২ সনের ৪৪নং আইন); (ন) আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিল, ১৯৯৩ (১৯৯৩ সনের ২৭নং আইন)।

Dhaka University Institutional Repository

৩. বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ, বিতর্ক, খন্ড ৭, সংখ্যা ১২, ২৭ অক্টোবর, ১৯৯২, পৃষ্ঠা ঃ ৮০।

৪. বিতর্ক, খন্ড ৭, সংখ্যা ১১, ২৬ অক্টোবর, ১৯৯২, পৃষ্ঠাঃ ৬৭।

৫. বিতর্ক, খন্ড ৪, সংখ্যা ১১, ২৬ জানুয়ারী, ১৯৯২, পৃষ্ঠাঃ ১৫৪।

৬. বিতর্ক, খন্ড ৪, সংখ্যা, ১৩,২৮ জানুয়ারী,১৯৯২, পৃষ্ঠাঃ ৯৩।

৭. পর্যাপ্ত আলোচিত কয়েকটি বিল হচ্ছে ঃ The Presidential Security Force (Amendment) Bill, 1992 (Act No. 24 of 1992), রাজশাহী মহানগরী পুলিশ বিল, ১৯৯২ (১৯৯২ সনের ২৩নং আইন), The Bangladesh Export Processing Zone's Authority (Amendment) Bill, 1992 (Act No. 30 of 1992), বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় বিল, ১৯৯২ (১৯৯২ সনের ৩৪নং আইন), The Industrial Relations (Amendment) Bill, 1993 (Act No. 22 of 1993), মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ (সংশোধন) বিল, ১৯৯৩ (১৯৯৩ সনের ৩০নং আইন)।

৮. বিতর্ক, খন্ড ৪, সংখ্যা ১২, ২৭ জানুয়ারী, ১৯৯৫ , পৃষ্ঠাঃ ৬৯।

৯. বিতর্ক, খন্ড ৮, সংখ্যা ৮, ২ ফেব্রুয়ারী, ১৯৯৩, পৃষ্ঠাঃ ৭৬।

১০. বিতর্ক, খন্ড ৩, সংখ্যা ১০, ৩০ অক্টোবর, ১৯৯১, পৃষ্ঠাঃ ৮৮।

১১. সি এ সি, সংসদীয় সমীক্ষা, ৩ নভেম্বর, ১৯৯৫, পৃষ্ঠাঃ ৭।

১২. বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ, জাতীয় সংসদের কার্যবাহের সারাংশ, ৩,৮,১০ খন্ড।

১৩. কার্যবাহের সারাংশ, ৪ খন্ড।

১৪. বাছাই কমিটিতে প্রেরিত সরকারী বিল দু'টো হচ্ছে ঃ সংবিধান (একাদশ সংশোধন) বিল, এবং সংবিধান (দ্বাদশ সংশোধন) বিল, ১৯৯১।

১৫. বাছাই কমিটিতে প্রেরিত বেসরকারী বিল পাঁচটি হচ্ছে ঃ (ক) সংবিধান (সংশোধন) বিল, ১৯৯১ (সংবিধানের ১১, ৪৮, ৪৯, ৫০, ৫১, ৫২, ৫৩, ৫৪, ৫৫, ৫৬, ৫৭, ৫৮, ৫৯, ৬০, ৬৬, ৭২, ৭৩ক, ৮৮, ৯২ক, ১১৯, ১২২, ১২৩, ১২৪, ১২৫, ১৪১ক, ১৪২, ১৪৫ক, ১৪৭, ১৪৮,এবং ১৫২ অনুচ্ছেদের সংশোধন); (খ) সংবিধান (সংশোধন) বিল, ১৯৯১ (সংবিধানের একাদশ অনুচ্ছেদের সংশোধন); (গ) সংবিধান (সংশোধন) বিল, ১৯৯১ (সংবিধানের ২৬ ও ১৪২ অনুচ্ছেদের সংশোধন) (ঘ) সংবিধান (সংশোধন) বিল, ১৯৯১ (সংবিধানের ৩৩ অনুচ্ছেদের সংশোধন); (ঙ) সংবিধান (সংশোধন) বিল, ১৯৯১ (সংবিধানের ১৪৫ ক অনুচ্ছেদের সংশোধন)।

১৬. বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ, বুলেটিন, ২ খন্ড, ১২ জুন হতে ১৩ আগষ্ট, ১৯৯১।

১৭. বিতর্ক, খন্ড ২, সংখ্যা ৯, ২৯ জুন, ১৯৯১, পৃষ্ঠাঃ ১৭৫।

১৮. বিতর্ক, খন্ড ২, সংখ্যা ৩, ১৫ জুন, ১৯৯১, পৃষ্ঠা ঃ ৭২-৭৩।

Dhaka University Institutional Repository

১৯. বিতর্ক, খন্ড ২, সংখ্যা ৪, ১৬ জুন, ১৯৯১, পৃষ্ঠা ঃ ৫৭-৫৮।

২০. ঐ, পৃষ্ঠা ঃ ৮৯-৯১।

২১. বিতর্ক, খন্ড ২, সংখ্যা ১০, ৩০ জুন, ১৯৯১, পৃষ্ঠা ঃ ৮৬।

২২. বুলেটিন, খন্ড ২, সংখ্যা ১০, ৩০ জুন, ১৯৯১।

২৩. বিতর্ক, খন্ড ২, সংখ্যা ৯, ২৯ জুন, ১৯৯১, পৃষ্ঠাঃ ১৮৫।

২৪. ঐ।

২৫. বুলেটিন, ৬ খন্ড, ১৮ জুন হতে ২৭ জুলাই, ১৯৯২।

২৬. বিতর্ক, খন্ড ৬, সংখ্যা ৩, ২৩ জুন, ১৯৯২, পৃষ্ঠা ঃ ৬৪।

২৭. ঐ, পৃষ্ঠা ঃ ৬৫।

২৮. ঐ, পৃষ্ঠা ঃ ৫৮।

২৯. বিতর্ক, খন্ড ৬, সংখ্যা ২০, ১৮ জুলাই, ১৯৯২, পৃষ্ঠা ঃ ৩৮।

৩০. বিতর্ক, খন্ড ৬, সংখ্যা ১৩, ৭ জুলাই, ১৯৯২, পৃষ্ঠা ঃ ৭১।

৩১. বিতর্ক, খন্ড ৬, সংখ্যা ২৮, পৃষ্ঠা ঃ ১১৯-১২১।

৩২. বিতর্ক, খন্ড ৬, সংখ্যা ২২, ২০ জুলাই, ১৯৯২, পৃষ্ঠা ঃ ১৬৫।

৩৩. বিতর্ক, খন্ড ৬, সংখ্যা ২৩, ২১ জুলাই, ১৯৯২, পৃষ্ঠা ঃ ৭৬।

৩৪. বুলেটিন, খন্ড ১০, ১০ জুন হতে ৩০ জুন, ১৯৯৩।

৩৫. বিতর্ক, খন্ড ১০, সংখ্যা ৭, ১৪ জুন, ১৯৯৩, পৃষ্ঠা ঃ ৩৯।

৩৬. ঐ, পৃষ্ঠা ঃ ৪০।

৩৭. ঐ, পৃষ্ঠা ঃ ৪৯।

৩৮. ঐ, পৃষ্ঠা ঃ ৫০।

৩৯. ঐ, পৃষ্ঠা ঃ ৫০-৫১।

৪০. ঐ, পৃষ্ঠা ঃ ৭৬।

৪১. বিতর্ক, খন্ড ১০, সংখ্যা ১১, ১৯ জুন, ১৯৯৩, পৃষ্ঠা ঃ ১৬৭-৬৮।

৪২. বিতর্ক, খন্ড ১০, সংখ্যা ৮, ১০ জুন, ১৯৯৩, পৃষ্ঠা ঃ ৬৪।

৪৩. বিতর্ক, খন্ড ১০, সংখ্যা ১৫, ২৩ জুন, ১৯৯৩, পৃষ্ঠা ঃ ১০৯।

৪৪. ঐ, পৃষ্ঠা ঃ ১১১।

৪৫. বুলেটিন, ১৫ খন্ড, ৯ জুন থেকে ২৯ জুন, ১৯৯৪।

৪৬. বিতর্ক, খন্ড ১৫, সংখ্যা ৭, ১৪ জুন, ১৯৯৪, পৃষ্ঠা ঃ ৬৯-৭১।

৪৭. বিতর্ক, খন্ড ১৫, সংখ্যা ৬, ১৩ জুন, ১৯৯৪, পৃষ্ঠা ঃ ৯৫।

৪৮. বিতর্ক, খন্ড ১৫, সংখ্যা ৭, ১৪ জুন, ১৯৯৪, পৃষ্ঠা ঃ ৬৭।

Dhaka University Institutional Repository

৪৯. বিতর্ক, খন্ড ১৫, সংখ্যা ৮, ১৫ জুন, ১৯৯৪, পৃষ্ঠা ঃ ১৪৯।

৫০. বিতর্ক, খন্ড ১৫, সংখ্যা ১৫,২৭ জুন, ১৯৯৪, পৃষ্ঠা ঃ ৭৬।

৫১. বিতর্ক, খন্ড ১৫, সংখ্যা ১৪, ২৬ জুন, ১৯৯৪, পৃষ্ঠা ঃ ৮৬।

৫২. বিতর্ক, খন্ড ১৫, সংখ্যা ১৬, ২৮ জুন, ১৯৯৪, পৃষ্ঠা ঃ ৪৩।

৫৩. ঐ, পৃষ্ঠা ঃ ১৪১।

৫৪. ঐ, পৃষ্ঠা ঃ ১৪০।

৫৫. বিতর্ক, খন্ড ২০, সংখ্যা ৮, ২৭ জুন ১৯৯৫, পৃষ্ঠা ঃ ১৮।

৫৬. ঐ, পৃষ্ঠা ঃ ৩৯।

৫৭. বিতর্ক, খন্ড ২০, সংখ্যা ৭, ২৬ জুন, ১৯৯৫, পৃষ্ঠা ঃ ৭৫।

৫৮. বিতর্ক, খন্ড ২০, সংখ্যা ১০, ২৯ জুন, ১৯৯৫, পৃষ্ঠা ঃ ৯৪।

৫৯. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান, (ঢাকাঃ ডেপুটি কন্ট্রোলার, গর্ভনমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস, তেজগাঁও, ১০ অক্টোবর, ১৯৯১ পর্যন্ত সংশোধিত), অনুচ্ছেদ ৪৮ (১)।

৬০. ঐ, অনুচ্ছেদ ঃ ৪৮ (২)।

৬১. ঐ, অনুচ্ছেদ ঃ ৪৮ (৩)।

৬২. ঐ, অনুচ্ছেদ ঃ ৪৮ (৫)।

৬৩. ঐ, অনুচ্ছেদ ঃ ৫০ (১)।

৬৪. ঐ, অনুচ্ছেদ ঃ ৫২ (২)।

৬৫. ঐ, অনুচ্ছেদ ঃ ৫২ (১)।

৬৬. ঐ, অনুচ্ছেদ ঃ ৫৩ (১)।

৬৭. ঐ, অনুচ্ছেদ ঃ ৫২ (৪)।

৬৮. ঐ, অনুচ্ছেদ ঃ ৫৪।

৬৯. ঐ, অনুচ্ছেদ ঃ ৫৫ (১)।

৭০. ঐ, অনুচ্ছেদ ঃ ৫৫ (২)।

৭১. ঐ, অনুচ্ছেদ ঃ ৫৫ (৪)।

৭২. ঐ, অনুচ্ছেদ ঃ ৫৬ (১)।

৭৩. ঐ, অনুচ্ছেদ ঃ ৫৬ (৩)।

৭৪. ঐ, অনুচ্ছেদ ঃ ৫৬ (২)।

৭৫. ঐ, অনুচ্ছেদ ঃ ৫৬ (৩)।

৭৬. ঐ, অনুচ্ছেদ ঃ ৫৫ (৩)।

৭৭. ঐ, অনুচ্ছেদ ঃ ৫৭ (২)।

Dhaka University Institutional Repository

৭৮. ঐ, অনুচ্ছেদ ঃ ৫৭ (৩)।

৭৯. ঐ, অনুচ্ছেদ ঃ ৫৮ (২)।

৮০. ঐ, অনুচ্ছেদ ঃ ৫৮ (৪)।

৮১. ঐ, অনুচ্ছেদ ঃ ৭০।

৮২. ঐ, অনুচ্ছেদ ঃ ৭২ (১)।

৮৩. বিতর্ক, খন্ড ২, সংখ্যা ৩৭, ৬ আগষ্ট, ১৯৯১, পৃষ্ঠা ঃ ২১।

৮৪. ঐ, পৃষ্ঠা ঃ ২৩।

৮৫. বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ, প্রশ্ন ও উত্তর, ১০ খন্ড, ৬ জুন ১৯৯৩, পৃষ্ঠা ঃ ৪।

৮৬. ঐ, ৭ জুন, ১৯৯৩, পৃষ্ঠা ঃ ১।

৮৭. ঐ, ৬ জুন, ১৯৯৩, পৃষ্ঠা ঃ ৪।

৮৮. প্রশ্ন ও উত্তর, খন্ড ১৭, ২৭ নভেম্বর, ১৯৯৪, পৃষ্ঠা ঃ ১।

৮৯. ঐ।

৯০. বিতর্ক, খন্ড ২, সংখ্যা ১৭, ৯ জুলাই, ১৯৯১, পৃষ্ঠা ঃ ১।

৯১. প্রশ্ন ও উত্তর, ১০ খন্ড, ৭ জুন, ১৯৯৩, পৃষ্ঠা ঃ ১।

৯২. প্রশ্ন ও উত্তর ,খন্ড ১৩, ৯ ফেব্রুয়ারী, ১৯৯৪, পৃষ্ঠা ঃ ৩।

৯৩. বিতর্ক, খন্ড ২, সংখ্যা ১৮, ১০ জুলাই, ১৯৯১, পৃষ্ঠা ঃ ৬৫।

৯৪. বিতর্ক, খন্ড ২, সংখ্যা ২৪, ১৮ জুলাই, ১৯৯১, পৃষ্ঠা ঃ ৫১।

৯৫. কার্যবাহের সারাংশ, খন্ড ৪, পরিশিষ্ট (ট)।

৯৬. কার্যবাহের সারাংশ, খন্ড ৩, পরিশিষ্ট (ঝ)।

৯৭. কার্যবাহের সারাংশ, খন্ড ২১, পরিশিষ্ট (জ)।

৯৮. কার্যবাহের সারাংশ, খন্ড ১৩, পরিশিষ্ট (ছ)।

৯৯. বিতর্ক, খন্ড ৩, সংখ্যা ৮, ২৮ অক্টোবর, ১৯৯১, পৃষ্ঠা ঃ ৪৯।

১০০. ঐ, পৃষ্ঠা ঃ ৫৬।

১০১. ঐ, পৃষ্ঠা ঃ ৮৮।

১০২. কার্যবাহের সারাংশ, খন্ড ৮, পরিশিষ্ট (খ)।

১০৩. বিতর্ক, খন্ড ৮, সংখ্যা ২১,২৪ ফেব্রুয়ারী, ১৯৯৩, পৃষ্ঠা ঃ ৬৩-৬৪।

১০৪. ঐ, পৃষ্ঠা ঃ ৬৯।

১০৫. ঐ, পৃষ্ঠা ঃ ৬৭।

১০৬. বিতর্ক, খন্ড ২, সংখ্যা ১৩, ৩ জুলাই, ১৯৯১, পৃষ্ঠা ঃ ১০০।

১০৭. ঐ, পৃষ্ঠা ঃ ১০২।

Dhaka University Institutional Repository

১০৮. বিতর্ক, খন্ড ২, সংখ্যা ১১, ১ জুলাই, ১৯৯১, পৃষ্ঠা ঃ ৫৬।

১০৯. ঐ, পৃষ্ঠা ঃ ৫৭।

১১০. কার্যবাহের সারাংশ, খন্ড ৪, ৯ জানুয়ারী, ১৯৯২, পরিশিষ্ট (ঙ)।

১১১. ঐ।

১১২. কার্যবাহের সারাংশ, খন্ড ৬, ২ জুলাই, ১৯৯২, পরিশিষ্ট (ঙ)।

১১৩. ঐ।

১১৪. কার্যবাহের সারাংশ, খন্ড ১৮, ৬ ফেব্রুয়ারী, ১৯৯৫, পরিশিষ্ট (ঙ)।

১১৫. বিতর্ক, খন্ড ৪, সংখ্যা ১৯, ৬ ফেব্রুয়ারী, ১৯৯২, পৃষ্ঠা ঃ ৪৭-৪৮।

১১৬. ঐ, পৃষ্ঠা ঃ ৫৮-৫৯।

১১৭. বিতর্ক, খন্ড ৭, সংখ্যা ৪, ১৫ অক্টোবর, ১৯৯২, পৃষ্ঠা ঃ ৫৪-৫৫।

১১৮. ঐ, পৃষ্ঠা ঃ ৫৯।

১১৯. কার্যপ্রণালী-বিধি, বিধি ৬৮ এর আওতায় গৃহীত প্রস্তাবটি হচ্ছেঃ বর্তমান সরকারের ৪ বছর ৫ মাস শাসনামলে বিরোধী দলের ৫৮ দিন হরতাল পালনের ফলে নাগরিক অধিকার ক্ষুণ্ন হওয়া সম্পর্কে। নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটিতে প্রেরিত প্রস্তাবটি হচ্ছে ঃ মুক্তিযুদ্ধকালীন সময়ে শত্রুবাহিনীর কবল থেকে উদ্ধারকৃত এস, এস, লাইটেনিং আমেরিকান জাহাজ বাংলার নৌ কমান্ডো কর্তৃক মংলাবন্দরে ডুবিয়ে দেয়া এবং ১৯৭৩ সালে ডুবিয়ে দেয়া ভাংগা কার্গো জাহাজটি বরাদ্দ দেয়া প্রসংগে।

১২০. কার্যবাহের সারাংশ, খন্ড ১৮, পরিশিষ্ট (ঝ)।

১২১. ঐ।

১২২. কার্যবাহের সারাংশ, খন্ড ২, পরিশিষ্ট (জ)।

১২৩. কার্যবাহের সারাংশ, খন্ড ৩, পরিশিষ্ট (ক)।

১২৪. কার্যবাহের সারাংশ, খন্ড ৮, পরিশিষ্ট (চ)।

১২৫. বিতর্ক, খন্ড ৮, সংখ্যা ২, ১৭ জানুয়ারী, ১৯৯৩, পৃষ্ঠা ঃ ৬০।

১২৬. ঐ, পৃষ্ঠা ঃ ৬০।

১২৭. ঐ, পৃষ্ঠা ঃ ৬২।

১২৮. কার্যবাহের সারাংশ, খন্ড ৭, পৃষ্ঠা ঃ ৩।

১২৯. কার্যবাহের সারাংশ, খন্ড ১৩, পৃষ্ঠা ঃ ৪।

১৩০. ঐ।

Dhaka University Institutional Repository

ষষ্ঠ অধ্যায়

সংসদীয় গণতন্ত্র ও কার্যক্রমের মূল্যায়ন (১৯৯১-১৯৯৫)

গণতন্ত্র নন্দিত এবং নিন্দিত উভয়ই। তবে নিন্দাবাদের তুলনায় এর প্রশংসার দিকটিই বেশী পরিদৃষ্ট হয়। গণতন্ত্রের প্রতি মানুষের এই দুর্বলতার কারণ অনেক। এ সবের মধ্যে তিনটি কারণকে বিশেষভাবে উল্লেখ করা যায়। প্রথমত, গণতন্ত্র শাসন কাঠামোতে জনগণের প্রতিনিধিত্বের কথা বলে; দ্বিতীয়ত, শাসিতের কাছে শাসকবর্গকে দায়িত্বশীল (Responsible), সংবেদনশীল (Responsive) ও দায়বদ্ধ (Accountable) রাখতে চায়; এবং তৃতীয়ত, এতে আইনের শাসন, ব্যক্তি স্বাধীনতা ও মৌলিক অধিকারের স্বীকৃতি দেয়া হয়। উল্লেখ্য যে, একটি সরকার কতোটুকু গণতান্ত্রিক, তা নিরূপন করার জন্যে এসব বিষয়কে চলক (variable) হিসেবেও ব্যবহার করা হয়। অর্থাৎ উপরোক্ত বিষয়সমূহের কোন্‌টি কি পরিমাণে কোন অবস্থায় উপস্থিত, তার ভিত্তিতে উদ্দিষ্ট ব্যবস্থাটি কতোটুকু গণতান্ত্রিক তার মাত্রা নির্ধারিত হয়। একথা বলাই বাহুল্য যে, কোনো গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাই একেবারে নিখুঁত ও সর্বাঙ্গ সুন্দর নয়। কোনোটি অপেক্ষাকৃত বেশী গণতান্ত্রিক। আবার কোনোটি অপেক্ষাকৃত কম। তাছাড়া গণতন্ত্রের সত্যিকার রূপ কি তা নিয়েও রয়েছে বিতর্ক।[১]

গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার যে তিনটি প্রধান বৈশিষ্ট্যসূচক চলকের কথা ওপরে উল্লেখ করা হয়েছে, তার কোনোটির আপেক্ষিক গুরুত্বই কোনো অংশে কম নয়। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে সক্রিয়, সচল, কার্যক্রম ও ফলপ্রসূ করবার জন্যে সবকটি বৈশিষ্ট্যের উপস্থিতিই জরুরী। তবে এসবের মধ্যেও 'ওয়েটেজ' বা আনুপাতিক গুরুত্বের দিক থেকে বিবেচনা করলে দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্যকে অর্থাৎ সরকারের দায়িত্বশীলতাকে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। বস্তুতঃ শাসিতের কাছে শাসকবর্গকে দায়িত্বশীল, তাদের প্রয়োজনের প্রতি সংবেদনশীল এবং জনগণের কাছে জবাবদিহি করতে বাধ্য রাখার বিষয়টি এতোই গুরুত্বপূর্ণ যে, একে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রাণসত্তা বললেও অত্যুক্তি হবে না। কেননা গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার অন্যান্য বহিরাঙ্গ তথা কাঠামোগত বিন্যাস যতই সুন্দর ও কাম্য মনের হোকনা কেন, এ ব্যবস্থা থেকে কাংখিত ফল লাভ করতে হলে শাসন ব্যবস্থায় সরকারের দায়িত্বশীলতা ও দায়বদ্ধতা অপরিহার্য। শাসকবর্গের দায়িত্বশীলতা যে ব্যবস্থায় অনুপস্থিত তাকে আর যাই হোক গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা বলার সুযোগ নেই। সে ধরনের ব্যবস্থা গণতন্ত্রের নামে প্রহসন ছাড়া আর কিছু নয়।[২]

Dhaka University Institutional Repository

গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সরকার গঠন ও পরিচালনার ক্ষেত্রে দু'টো পদ্ধতি চালু রয়েছে। সংসদীয় ও রাষ্ট্রপতি পদ্ধতি, উভয় পদ্ধতিতেই সরকারকে দায়িত্বশীল রাখবার জন্যে কিছু উপায়ের কথা বলা হয়। এসবের মধ্যে কোনোটি অধিকতর দায়িত্বশীলতা নিশ্চিত করে তা নিয়ে অবশ্য বিতর্ক রয়েছে। তবে জনগণের নির্বাচিত আইনসভার কাছে নির্বাহী বিভাগকে সরাসরি এবং সামষ্টিক ভাবে দায়বদ্ধ রাখার বিধান সংসদীয় ব্যবস্থারই একক ও অনন্য বৈশিষ্ট্য। সে কারণে সাধারণভাবে দায়িত্বশীল সরকার বলতে সংসদীয় সরকারকেই বুঝানো হয়ে থাকে। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, সংসদীয় সরকার প্রতিষ্ঠার অর্থই কি দায়িত্বশীল সরকার প্রতিষ্ঠা?[৩]

অষ্টাদশ শতকের প্রথম বৃটেনে পার্লামেন্টারি সরকার প্রবর্তিত হয়। পরে অষ্ট্রেলিয়া, কানাডা, ডেনমার্ক, ফ্রান্স, ভারত, জাপান, নরওয়ে, সুইডেন প্রভৃতি রাষ্ট্রে এ ধরনের সরকার প্রবর্তিত হয়।[৪]

সংসদীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা কার্যকর করা কষ্টসাধ্য ও সময় সাপেক্ষ বলেও আধুনিক বিশ্বে এটি অধিকতর গ্রহণযোগ্য সরকার পদ্ধতি। পশ্চিমা ধাঁচে বা বৃটিশ মডেলের অনুকরণে পৃথিবীর অনেক দেশে, বিশেষ করে তৃতীয় বিশ্বের নতুন স্বাধীনতা প্রাপ্ত দেশগুলোতে এ ধরনের ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে।[৫]

যে শাসন ব্যবস্থায় আইন বিভাগ ও শাসন বিভাগের সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ট এবং শাসন বিভাগের স্থায়িত্ব ও কার্যকারিতা আইন বিভাগের ওপর নির্ভরশীল তাকে সংসদীয় সরকার বলা হয়। কিন্তু ব্যাপক অর্থে সংসদীয় সরকারের উপরোক্ত সংজ্ঞা প্রদান করা সত্ত্বেও বর্তমানে এরুপ শাসন ব্যবস্থায় সংসদের প্রাধান্যের পরিবর্তে মন্ত্রীপরিষদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তাই অনেকে এরুপ শাসন ব্যবস্থাকে মন্ত্রীপরিষদ শাসিত সরকার বলে অভিহিত করেন। অনেক সময় আবার এরূপ শাসন ব্যবস্থাকে দায়িত্বশীল শাসন ব্যবস্থা বা সংসদ পরিচালিত শাসন ব্যবস্থা বলা হয়।[৬]

এ ব্যবস্থায় বিরোধী দল সরকারীভাবে স্বীকৃত। এ ব্যবস্থায় একজন নিয়মতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রধান থাকেন, যেমন- বৃটেনের রাজা-রানী বা ভারতের প্রেসিডেন্ট। আইনসভার সংখ্যাগরিষ্ঠ দল সরকার গঠন করে এবং আইন সভার সমর্থনের ওপর সরকারের অস্তিত্ব নির্ভর করে। এই পদ্ধতিতে সরকার আস্থা হারালে জোরপূর্বক দেশ শাসন করতে পারে না। সেজন্য অত্যন্ত সতর্কভাবে ক্ষমতাসীন দলকে কাজ চালিয়ে যেতে হয়। মন্ত্রীসভা সমষ্টিগতভাবে এবং ব্যক্তিগতভাবে আইনসভার নিকট দায়ী।[৭]

Dhaka University Institutional Repository

পার্লামেন্টারি বা মন্ত্রীপরিষদ শাসিত সরকারের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে জে. ডব্লিউ. গার্ণার (J.W. Garner) বলেছেন, "Cabinet Government is that system in which the real executive the cabinet or ministry is immediately and legally responsible to the legislature or one branch of it (usually the more popular chamber) for its political politics and acts are immediately or ultimately responsible to the electorate; while the titular or nominal executive the chief of the state occupies a position of irresponsibility".[৮] (ইহা হলো এমন এক ধরনের শাসন ব্যবস্থা যেখানে প্রকৃত শাসক বা মন্ত্রীপরিষদ তার রাজনৈতিক কার্যাবলীর জন্য প্রত্যক্ষ ও আইন সঙ্গতভাবে আইনসভা বা ইহার একটি কক্ষের (সাধারণত জনপ্রিয় কক্ষ) নিকট দায়ী থাকে এবং শেষ পর্যন্ত নির্বাচকমন্ডলীর নিকট দায়ী থাকে। এখানে নাম সর্বস্ব শাসক অর্থাৎ রাষ্ট্র প্রধানের পদটি দায়িত্বপূর্ণ নহে)।

সংসদীয় সরকারের কার্যক্রম (১৯৯১-১৯৯৫)

"স্বৈরতন্ত্র নিপাত যাক, গণতন্ত্র মুক্তিপাক"। এই অভিপ্রায়ে পাকিস্তানী স্বৈরাচারী শাসন-শোষণ ও অত্যাচার থেকে মুক্তি লাভ করার জন্য ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর যেমন ছিলো বাংগালীদের একটি গৌরবময় বিজয় তদ্রুপ স্বৈরাচারী এরশাদের বিরুদ্ধে '৯০-এর গণঅভ্যুত্থান ছিলো আর একটি বিজয়। জনগণের চরম আত্মত্যাগ ও রক্ত বিসর্জনের মধ্য দিয়ে বহুদিনের প্রতীক্ষিত নিরপেক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে বি.এন.পি. ক্ষমতায় গিয়েছিলো। কিন্তু সেকথা বি.এন.পি ও তার নেত্রী বেগম খালেদা জিয়া ভুলে গেলেও জনগণের ভুলে যাওয়ার কথা নয়। তবে তখন দেশের শাসন পদ্ধতি একনায়কতান্ত্রিক ছিলো। অর্থাৎ দেশের সকল ক্ষমতা রাষ্ট্রপতির হাতেই কেন্দ্রীভূত ছিলো। সেই শাসন পদ্ধতির অধীনেই বি.এন.পি. স্বাধীনতার শত্রু স্বৈরতান্ত্রিক শাসনে বিশ্বাসী জামাতের সমর্থন নিয়ে ক্ষমতায় যায়। অথচ তাদের সুযোগ ছিলো আন্দোলনের মধ্য দিয়ে গড়ে ওঠা জনগণের আশা-আকাঙ্খার প্রতীক তিনদলীয় জোটের অন্যান্য শরীকের সমর্থন নিয়ে ক্ষমতায় যাওয়া। কিন্তু ক্ষমতায় গিয়েই বি.এন.পি. তিন জোটের মৌলিক দলিলের নীতিকে ভঙ্গ করে সংসদের প্রথম অধিবেশনে মন্ত্রীপরিষদ শাসিত শাসনের পরিবর্তে রাষ্ট্রপতি শাসিত শাসনব্যবস্থা প্রবর্তনের দাবি করে। তাঁরা যুক্তি দেখান যে, '৯১ এর নির্বাচনে জনগণ সংসদীয় পদ্ধতি প্রত্যাখ্যান করেছে এবং বলেন যে, বাংলাদেশের জন্য রাষ্ট্রপতি পদ্ধতিই উপযোগী। একজন প্রতিমন্ত্রী বলেন, তিন জোটের যুক্ত ঘোষণায় সংসদীয় পদ্ধতির কথা বলা হয়নি এবং তিনি দাবি করেন যে, বর্তমান সংসদই সার্বভৌম। অবশ্য সরকারী দলের চীফ হুইপ আশা ব্যক্ত করেন যে, যথাসময়ে সরকার পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা করা হবে।[৯]

Dhaka University Institutional Repository

উপর্যুক্ত বক্তব্য থেকে প্রতীয়মান হয় যে, সরকার পদ্ধতি সম্পর্কে বি.এন.পি'র মধ্যে যথেষ্ট মতপার্থক্য ছিলো। ১৮মে তারিখে অনুষ্ঠিত বি.এন.পি সংসদীয় দলের সভায় সরকার পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা হয়, কিন্তু কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়নি। এভাবে দলের ভিতর ও বাইরে সরকার পদ্ধতি সম্পর্কে যখন তুমুল বিতর্ক চলে তখন প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ নীরব ভূমিকা পালন করেন এবং বিভ্রান্তি গুজবকে প্রশ্রয় দেন। অনেকে মনে করেন যে, দলের নিম্নতর পর্যায়ের নেতাদের একটি বড় অংশ সংসদীয় পদ্ধতির সরকারের পক্ষে থাকলেও বেগম খালেদা জিয়াসহ উচ্চ পর্যায়ের কিছু নেতা রাষ্ট্রপতি পদ্ধতি বহাল রাখার পক্ষপাতী ছিলেন এবং বি.এন.পি রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের দিকে অগ্রসর হচ্ছিল।[১০]

এমনকি, বি.এন.পি সরকারের সহযোগী জামাত ইসলামী সংসদীয় দলের নেতা মতিউর রহমান নিযামী বলেন, 'আমরা বুঝতে অক্ষম সারাজাতি যেখানে সংসদীয় গণতন্ত্র চায় সেখানে বি.এন.পি'র আপত্তি কেন?'[১১]

ইতোমধ্যে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতির সঙ্গে প্রধানমন্ত্রীর সম্পর্কের অবনতি ঘটে। বি.এন.পি মন্ত্রীপরিষদ গঠনের পর থেকেই পূর্ণ ক্ষমতা লাভের উদ্দেশ্যে স্পীকারের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তরের জন্য অস্থায়ী রাষ্ট্রপতির প্রতি চাপ দিতে থাকে। বি.এন.পি অস্থায়ী রাষ্ট্রপতিকে ন্যায়পালের পদ দেবার প্রস্তাব দেয় বলে জানা যায়।[১২]

কিন্তু বিচারপতি সাহাবুদ্দীন সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন এবং একাধিকবার জানিয়ে দেন যে, বিদ্যমান সংবিধান অনুযায়ী স্পীকারের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তর সম্ভব নয়। তিনি বলেন, 'তিন জোটের যুক্ত ঘোষণা বা রূপরেখা অনুযায়ী সার্বভৌম সংসদের নিকট আমার ক্ষমতা হস্তান্তরের কথা ছিলো। এই রূপরেখার সাংবিধানিক মূল্য না থাকতে পারে, তবে এর রাজনৈতিক গুরুত্ব রয়েছে যথেষ্ট।' এ ব্যাপারে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে দ্রুত সিদ্ধান্ত নেবার জন্য তিনি সংসদ-সদস্যদের প্রতি আহবান জানান।[১৩]

অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি প্রতিরক্ষা, স্বরাষ্ট্র ও সংস্থাপন মন্ত্রণালয় ছাড়া সকল মন্ত্রণালয় মন্ত্রীদের হাতে অর্পণ করেন। ৬ এপ্রিল তারিখে তিনি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বও প্রধানমন্ত্রীর হাতে ছেড়ে দেন। সংবিধান অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি সকল নির্বাহী ক্ষমতা প্রয়োগ এবং মন্ত্রীপরিষদের সভায় সভাপতিত্ব করতে পারেন। তথাপি অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি প্রথম দিকে মন্ত্রীপরিষদের সভায় সভাপতিত্ব করার দায়িত্ব প্রধান

Dhaka University Institutional Repository

মন্ত্রীকে প্রদান করেন এবং সংবিধানের আওতায় মন্ত্রীপরিষদকে যথেষ্ট ক্ষমতা ও স্বাধীনতা দেন। কিন্তু এই দ্বৈত শাসন এক বিব্রতকর পরিস্থিতির সৃষ্টি করে। মন্ত্রীপরিষদ দলীয় দৃষ্টিকোণ থেকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে থাকলে তা অস্থায়ী রাষ্ট্রপতির নিরপেক্ষতা ও মর্যাদা ক্ষুণ্ন করে। এমতাবস্থায় বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদ নিজেই মন্ত্রীপরিষদের সভায় সভাপতিত্ব করার ক্ষমতাসহ কিছু কিছু সাংবিধানিক ক্ষমতা প্রয়োগ করতে শুরু করেন। ফলে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর মধ্যে সম্পর্ক এমন এক পর্যায়ে পৌঁছে যে, সকল সংসদীয় ঐতিহ্য ও সৌজন্য বিসর্জন দিয়ে প্রধানমন্ত্রী সংসদে রাষ্ট্রপতির ভাষণ সম্পর্কে ধন্যবাদ সূচক প্রস্তাবের ওপর সমাপনী বক্তৃতা দান থেকে বিরত থাকেন। এমনকি তিনি রাষ্ট্রপতির ভাষণের ওপর আলোচনার সমাপনী বৈঠকে অনুপস্থিত থকেন।[১৪]

এই প্রেক্ষিতে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি ৫ জুন ১৯৯১ জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ দেন। (অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি মন্ত্রীপরিষদ ভেঙ্গে না দিলেও বি.এন.পি-কে সতর্ক করে দেন)। তিনি জাতির উদ্দেশ্যে তাঁর ভাষণে বলেন, "বর্তমান সংবিধান মতে সকল ক্ষমতা রাষ্ট্রপতির হাতে। প্রধানমন্ত্রীসহ অন্যান্য মন্ত্রী রাষ্ট্রপতির উপদেষ্টা মাত্র। তা সত্ত্বেও গণতন্ত্রের স্বার্থে তিনি মন্ত্রীপরিষদের কাজে হস্তক্ষেপ করতে চাননি। তিনি আরো বলেন যে, সংসদ তার পুরো পাঁচ বছর মেয়াদ পর্যন্ত বহাল থাকুক এবং বর্তমান সরকারও স্থিতিশীল হোক এটাই তাঁর কামনা। কিন্তু সরকার পদ্ধতি নিয়ে রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে গভীর মতবিরোধ স্থিতিশীলতার পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়াতে পারে। তিনি বলেন, 'গত আড়াই মাসের শাসন ব্যবস্থায় আমি দেখতে পাচ্ছি কোনো কোনো ব্যাপারে মন্ত্রীসভা দলীয় দৃষ্টিকোণ থেকে সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন। কিন্তু সংবিধান অনুযায়ী আমার ক্ষমতার প্রয়োগ ও হস্তক্ষেপ গণতান্ত্রিক নীতির পরিপন্থী বলে সমালোচিত হতে পারে। এ অবস্থায় আমি নিজেই সরে আসা সমীচীন মনে করি।"

তবে তিনি আবার স্মরণ করিয়ে দেন যে, বর্তমান সংবিধান অনুযায়ী তিনি স্পীকারের নিকট পদত্যাগ করতে পারেন না এবং নতুন রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হয়ে কার্যভর গ্রহণ করলেই তাঁর কার্যকাল শেষ হবে। অতএব অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি পদ থেকে তাঁকে অব্যাহতি দেয়ার জন্য প্রয়োজনীয় সাংবিধানিক সংশোধনী গ্রহণ ও সরকার পদ্ধতির প্রশ্নটি অতি সত্ত্বর মীমাংসার আহবান জানান। তিনি বলেন, "দেশে শাসন করছে কে? প্রধানমন্ত্রী না অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি? কেহ কেহ বলেছে দ্বৈত শাসনের ভূত জাতির ওপরে চেপে বসেছে। তাই আমি খুব বিব্রতকর অবস্থায় রয়েছি। এই সমস্যা সমাধানের জন্য সংসদকে অনুরোধ করছি।"[১৫]

Dhaka University Institutional Repository

অস্থায়ী রাষ্ট্রপতির ভাষণ থেকে এটা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, বিচারপতি সাহাবুদ্দীন তাঁর দায়িত্ব থেকে অতিসত্ত্বর অব্যাহতি পেতে চান, কিন্তু সাংবিধানিক ব্যবস্থা ছাড়া অন্য কোনো চাপের মুখে তিনি পদত্যাগ করবেন না এবং প্রয়োজন বোধে তিনি রাষ্ট্রপতির সকল সাংবিধানিক ক্ষমতা প্রয়োগ করবেন। কিন্তু সংবিধান সংশোধনের জন্য যে দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের সমর্থনের প্রয়োজন তা বি.এন.পি'র ছিলো না। একমাত্র তিন জোটের রূপরেখা অনুযায়ী সংসদীয় পদ্ধতির সরকার প্রবর্তনের শর্তে বিরোধী দলগুলো সংবিধান সংশোধনের প্রশ্নে বি.এন.পি'কে সমর্থন দিতে প্রস্তুত ছিলো। তাছাড়া দেশের বুদ্ধিজীবী ও পেশাজীবী সংগঠনগুলোও সংসদীয় পদ্ধতি প্রবর্তনের জন্য চাপ দিয়ে আসছিলো। এই অবস্থায় বি.এন.পি রাষ্ট্রপতি পদ্ধতি বহাল রাখতে চাইলে তাকে বড় ধরনের ঝুঁকির সম্মুখীন হতে হতো। বিদ্যমান সংবিধান অনুযায়ী ১৩ অক্টোবর তারিখের মধ্যে নির্বাচন অনুষ্ঠান বাধ্যতামূলক ছিলো। রাষ্ট্রপতি তাঁর প্রশাসনের নিরপেক্ষতা ও অবাধ নির্বাচনের স্বার্থে মন্ত্রীপরিষদ ভেঙ্গে দিতে পারতেন। সুতরাং বি.এন.পি'কে ক্ষমতা ছেড়ে দিয়ে এবং একই সঙ্গে তিন জোটের যৌথ ঘোষণা বা প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করার অভিযোগ কাঁধে নিয়ে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে নামতে হতো। অনুরূপ অবস্থায় নির্বাচনের ফলাফল কি দাঁড়াত তা কেউ নিশ্চিত করে বলতে পারে না। এরূপ পরিস্থিতিতে বি.এন.পি শেষ পর্যন্ত সংসদের কাছে যৌথভাবে সংসদীয় পদ্ধতির সরকার ব্যবস্থা কায়েম করতে বাধ্য হয়।

উপর্যুক্ত আলোচনা হতে ইহা প্রতীয়মান হয় যে, বি.এন.পি তথা "আপোষহীন" নেত্রীর ক্ষমতা গ্রহণের শুরুই ছিলো জনগণের সাথে প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের প্রথম পদক্ষেপ। গণতন্ত্র পিপাসু সাধারণ জনগণ চরম আত্মত্যাগ ও রক্তের বিনিময়ে স্বৈরাচারী রাষ্ট্রপতি সরকারের পরিবর্তে গণতন্ত্র কায়েম করতে গিয়ে একটি নিরপেক্ষ অবাধ নির্বাচনের মাধ্যমে বি.এন.পি'কে ক্ষমতাসীন করলো। অথচ বি.এন.পি ক্ষমতা গ্রহণ করবার পূর্বে সেই একই ভাবে রাষ্ট্রপতি সরকার প্রবর্তনের জন্যে টালবাহানা শুরু করলো। নব্য উপনিবেশবাদের মত বি.এন.পি'র এই চক্রান্তের সাথে এরশাদ সরকারের কোনো তফাৎ ছিলো না। নচেৎ তিন-জোট রূপরেখার মূলনীতি ভংগ করে রাষ্ট্রপতি শাসন প্রবর্তন কেন করতে চেয়েছিলো? অবশ্য জনগণের চাপে লোক দেখানো সংসদীয় সরকার কায়েম করলেও বাস্তবে বি.এন.পির শাসনামল ছিলো গণতান্ত্রিক, না অগণতান্ত্রিক তা পরিশিষ্ট আলোচনা থেকেই সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে।

পদ্ধতির পরিবর্তন হলো বটে। কিন্তু চরিত্র চর্চা যাদের স্বৈরতান্ত্রিক তারা সংসদীয় গণতান্ত্রিক পদ্ধতির সাথে খাপ খাওয়াবে কি করে? ফলে শুরু থেকেই একটা চেষ্টা চলে সংসদের বাকী অংশকে

Dhaka University Institutional Repository

বাদ দিয়ে রীতি-নীতি সব উপেক্ষা করে প্রধানমন্ত্রী চরিত্রটিকে স্বৈরাচারীতে রূপান্তর করার যে চরিত্রটি অলঙ্কিত (নাকি কলঙ্কিত) করেছিলেন আন্দোলনের 'আপোষহীন' নেত্রী বেগম খালেদা জিয়া। সংসদের আস্থাভাজন ব্যক্তি হিসেবে তাঁর নীতি নির্ধারণ থেকে শুরু করে সকল কর্মকান্ডের হিসেব-নিকেষ হবে সংসদীয় পদ্ধতি। যা খালেদা জিয়া কায়েম করবেন, এটা ছিলো সকলের কাম্য। কিন্তু তা না করে তিনি সংসদকে উপেক্ষা করতে থাকেন। অনুপস্থিত থাকেন দিনের পর দিন। যাও থাকেন তাও আবার নীতি নির্ধারণ বা গৃহীত নীতির ভালমন্দ কোনো ব্যাপারে কথা বলেন না, জবাব দেন না, আর যাও বা দেন তাও শুধু বিরোধী দলকে কটাক্ষ করতে সংসদীয় রীতি-নীতি শিষ্টাচারের ধার ধারেন না। অন্য দিকে তিনি রাষ্ট্রীয় ও জাতীয় সব সিদ্ধান্তই গ্রহণ করেন সংসদের বাইরে। এমনিভাবে দিন চালিয়ে এক সময় কিভাবে সংসদকে অকার্যকর করে তুলে এক দলীয় সংসদে রূপান্তর করা হয় সেগুলো সকলেরই জানা। এগুলো বার বার বিরোধী দলীয় নেতৃবৃন্দ জনগণকে অবহিত করেছেন আন্দোলনের বিভিন্ন পর্যায়ে।[১৬]

প্রশ্ন হলো এই যে, স্বৈরাচারী কায়দায় দেশ চালানোর ব্যবস্থা করলেন, "আপোষহীন নেত্রী" তা কারস্বার্থে একানব্বইয়ের নির্বাচনের পূর্বের সময়টি পর্যালোচনা করলেই তার উত্তর পেতে খুব কষ্ট হয় না। খালেদার নেতৃত্বে বি.এন.পি. যখন রাজপথে আন্দোলন করে তখন তাঁর আশ-পাশের নেতাদের চেহারা সকলের সামনেই ছিলো স্পষ্ট। বি.এন.পি'র তখন সাংগঠনিক অবস্থা দেশব্যাপীই খুব নাজুক ছিলো। কিন্তু বি.এন.পি'র মনোনয়ন দেয়া কালীন সময় এমন সব নেতার উদয় হলেন যাদেরকে এর আগে দেখা যায়নি রাজনীতির সাথে সংশ্লিষ্ট থাকতে। আসলে এরা স্বৈরতান্ত্রিক শাসনের ফসল। '৭৫-উত্তর সময়ে জনগণের কাছে, রাষ্ট্রের কাছে জবাবদিহিহীন একটি অব্যবস্থার মধ্য দিয়েই এদের উত্থান হয়। জনগণের ট্যাক্সের পয়সায় গড়ে ওঠা রাষ্ট্রীয় সম্পদ আত্মসাৎ, ব্যাংকের ঋণ জনগণের অজান্তে জনগণকে জিম্মি করে আনা বৈদেশিক ঋণ, দারিদ্র বিমোচনের নামে প্রকল্প সাহায্য গম ইত্যাদির অবাধ লুন্ঠন, এসবের প্রক্রিয়ায় লাইসেন্স, পারমিট ঠিকাদারী ব্যবসা, আদম ব্যবসা ইত্যাদির মাধ্যমে রাতারাতি ধনী ধনাঢ্য বনে যায় একটা শ্রেণী। আর তারা তাদের এই অগাধ ধন সম্পত্তি রক্ষা এবং তার আরো বৃদ্ধির সুযোগ সন্ধানে রাতারাতি রাজনীতিক বনে যায়। দরিদ্র জনসাধারণের দারিদ্রের সুযোগ নিতে এরা বি.এন.পি'র এম.পি'র টিকিট পেতে ছুটে আসে এবং পেয়েও যায়। যারা রাজনীতির সাথে সম্পৃক্ত ছিলো না, জনগণের সুখ-দুঃখ নির্যাতনের মর্মবেদনা অনুভব করেনি কোনোদিন। এরা ছিলো জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন। সব সময় শুধু নিজেদের স্বার্থ চিন্তা করেছে। সুবিধাভোগী এই লোকজন বিগত সব ক'টি স্বৈরাচারের আমলে অবাধে লুটপাট করেছে। আর পুঁজিবাদী সমাজের অমোঘ নিয়মে শ্রম-শোষণের মাধ্যমে পুঁজির রূপান্তর ঘটিয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

উদ্ধৃত্ত কালো টাকা আরো বেশী পরিমাণে ভাসমান পুঁজি হিসেবে বিনিয়োগ করেছে শ্রম-শোষণের জন্য। আর তাই দেখা যায় বি.এন.পি'র আমলে রাতারাতি শত শত গার্মেন্টস গজিয়ে উঠেছে। এক থেকে শুরু করে একেক জন দশটি পনেরটি গার্মেন্টস ইন্ডাষ্ট্রিজের মালিক হয়েছে। আর অত্যন্ত সস্তায় মেয়েদের ঘাম রক্তের বিনিময়ে তাদের শ্রমকে শোষণ করেছে। শুধু তাই নয়, এসব গার্মেন্টেসের নামে লাখ লাখ টাকা রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক থেকে তুলে নিয়েছে। অন্যদিকে রাষ্ট্রকে ইন্সুরেন্স দেয়ার সুযোগ থেকে বঞ্চিত করার জন্য নিজেরাই ইন্সুরেন্স কোম্পানি খুলে বসেছে। বাইংহাউজ, আদম ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান, আমদানী-রপ্তানী প্রতিষ্ঠান থেকে শুরু করে বিভিন্ন ধরনের বিলাস বহুল বিপণিবিতান আর হোটেল ব্যবসায়ী কালো টাকা বিনিয়োগ করেছে। যা নাকি সবই ভাসমান পুঁজি। রাষ্ট্র বা জাতির সাধারণ মানুষের মৌলিক চাহিদা মেটানোর জন্য উৎপাদনের সাথে এই পুঁজির কোনোই সম্পর্ক নেই।[১৭]

দৈনিক পত্রিকাগুলো থেকে দুর্নীতির কয়েকটি শিরোনাম উল্লেখ করা হলোঃ

- দুর্নীতি, অনিয়ম, সোনালী ব্যাংকের কোটি কোটি টাকা ক্ষতি।[১৮]
- বেসরকারী খাতের নামে ২শ'৫০ কোটি টাকার শিল্প কারখানা ৫৩ কোটি টাকায় বিক্রি করে দেয়া হচ্ছে এনিয়ে অর্থ মন্ত্রণালয়ে তুলকালাম বিতর্ক হয়েছে। সৎ ও দায়িত্বশীল কর্মকর্তারা মনে করেন, এই প্রক্রিয়া দেশকে ধ্বংস করে দেবে। ইতোমধ্যে শতকরা ৭০ ভাগ বেসরকারী শিল্প কারখানা বন্ধ হয়ে গেছে বলে এক পরিসংখ্যানে দেখা গেছে।[১৯]
- চট্টগ্রাম বন্দরের সাড়ে ৩শ' কোটি টাকা আত্মসাতের চাঞ্চল্যকর তথ্য ফাঁস। ৮ কর্মকর্তা জড়িত।[২০]
- কুমিল্লায় খাস জমি-সম্পত্তি নিয়ে হরিলুট করেছে বি.এন.পি'র নেতা কর্মীরা, কর্মকর্তারাও সুযোগ নিয়েছে।[২১]
- রেলের চার কোটি টাকার মালামাল উধাও।[২২]
- শাসকদলের প্রিয়ভাজনদের তুষ্ট করতে সরকারের ৪০ কোটি টাকা গচ্চা।[২৩]
- যমুনা সারখানা থেকে ৩২ হাজার টন সার লোপাট। কারখানার ভেতর বাইরে কিছু লোক 'তালুক' তৈরী করেছে।[২৪]
- সরকারী খাদ্যগুদামে 'পথখাতের' গোঁজামিল একশ' কোটি টাকার খাদ্যশস্য উধাও।[২৫]

Dhaka University Institutional Repository

এমনিভাবে কালো টাকার মালিকেরা রাজনীতি ও রাষ্ট্রীয় নীতিকে জিম্মি করে ফেলে। তারা রাষ্ট্রীয় নীতি নির্ধারকদের নিজেদের স্বার্থে এবং নিজেদের পুঁজিকে নিরাপদ ও আরো ফুলে ফেঁপে তোলার পথকে সুগম করার কাজে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতাকে নগ্নভাবে ব্যবহার করতে থাকে। আর তাই ইটালীর মাফিয়া গোষ্ঠীর পটভূমির সাথে মিল রেখে আমাদের দেশের রাজনীতিকেও কালো টাকা আর বে-আইনী অস্ত্রের কাছে জিম্মি করে তোলে।[২৬]

গণতন্ত্রের তথাকথিত অনুসারী খালেদা জিয়া ও তাঁর সরকার কিন্তু ঐ চক্রের বেড়াজাল থেকে আর বেড়িয়ে আসতে পারেনি বরং তাদেরই অনুসৃত পথে গণতন্ত্রের নিয়ম-নীতির ধারে কাছে দিয়ে না গিয়ে এ চক্রের সাথে গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে ব্যবহার করা শুরু করে। তবে ধাধাঁর মুখে সরাসরি পথ এড়িয়ে অন্য পথে এগোয় আর এগোতে গিয়েই এক এক করে সবক'টি গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে নগ্নভাবে দলীয়করণ করে ফেলা হয়। মাগুড়া উপ-নির্বাচনের মাধ্যমে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নিরপেক্ষ প্রতিষ্ঠান নির্বাচন কমিশনের করুন অবস্থা জনগণ প্রথম প্রত্যক্ষ করেন। এমনিভাবে অন্য একটি প্রতিষ্ঠান হাইকোর্ট, তার বিচারপতি নিয়োগের ক্ষেত্রে কলঙ্কজনক ঘটনাও প্রত্যক্ষ করতে হয়েছে। এমনিভাবে সাংবাদিক ফেডারেশন, আইনজীবী, শিক্ষক, মুক্তিযোদ্ধা, মেডিকেল এসোসিয়েশন, বণিক সমিতি, পরিবহন শ্রমিক ও মালিক সংগঠন ইত্যাদি প্রতিটি ক্ষেত্রেই অযাচিতভাবে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা কালো টাকা আর অবৈধ অস্ত্রের জোরে নিজেদের পছন্দ মাফিক লোকজনদেরকে দিয়ে দ্বিধাবিভক্ত করা হয়েছে। আর রাষ্ট্রীয় প্রচার মাধ্যমে রেডিও-টেলিভিশনের কথা নাই বা বলা হলো। এসবের মাধ্যমে হাতে গোণা কিছু সংখ্যাক লোকজনদেরকে আশ-পাশে রেখে গড়ে ওঠা একটি কোটারী গোষ্ঠীই দেশ ও জাতির হর্তাকর্তা বিধাতা হয়ে ওঠে। ফলশ্রুতিতে আইনের শাসন ভেঙ্গে পড়ে। নিরীহ লোকজন চুরি, ডাকাতি, রাহাজানি, খুন-খারাবী, ধর্ষণ, আর সন্ত্রাসীর শিকারে পরিণত হয়েও প্রতিকারের কোনো পথ খুঁজে পায় না। ব্যবসা-বাণিজ্য সবই এই চক্রের হাতে কুক্ষিগত হয়ে যায়। ফলে বাড়তে থাকে শিক্ষিত বেকার। সে চক্রের সমর্থক না হলে চাকরী থাক দুরে ভাল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি এমনকি হলগুলোতে সীট পর্যন্ত পাওয়া যায়না। ঘুষ দুর্নীতিতো প্রশাসনের প্রতিটি স্তরের রন্ধ্রে রন্ধ্রে ছড়িয়ে পড়ে। অন্যদিকে প্রধানমন্ত্রী ও তাঁর ছেলে-সন্তানসহ নিকট আত্মীয় স্বজন থেকে শুরু করে মন্ত্রী, এম.পি. নেতা-উপনেতাদের অর্থবিত্ত সম্পদের পাহাড় ফুলে ফেঁপে উঠতে থাকে। এ সবের প্রতিবাদ করার মতো শক্তি ছিলো একমাত্র বিরোধী দল ও সংসদের পবিত্র অঙ্গনে। কিন্তু সেখানেও সংখ্যা গরিষ্ঠতার জোরে বিরোধী দলের কণ্ঠকে রোধ করা হয়। এজন্য জাতির আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান সংসদের অভিভাবক স্পীকারের পদটিকেও সম্পূর্ণভাবে দলীয়করণের মাধ্যমে সংসদের কার্যকারিতাকেই অচল করে দেয়া হয়।[২৭]

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম পার্লামেন্টের অগণতান্ত্রিক কার্যকলাপের আরো কয়েকটি দৃষ্টান্তমূলক উদাহরণ দেয়া হলোঃ

- কৃষি মন্ত্রীর ছেলে, বেগম জিয়ার ছেলে ও মেজর (অবঃ) ইস্কান্দার এর সহায়তায় গত বছর বোম্বের একটি শক্তিশালী সার ব্যবসায়ী চক্র বিপুল পরিমাণ সার ভারতে কিনে নিয়ে যায়। সে সব টাকা নাকি এখন বোম্বের স্টক এক্সচেঞ্জ মার্কেটিংয়ে লগ্নি করা হয়েছে।[২৮]
- চট্টগ্রাম ইউরিয়া সার কারখানা থেকে ১২টি ভূয়া প্রতিষ্ঠানের নামে প্রায় ৬ হাজার টন সার উত্তোলন করে তা কালো বাজারে বিক্রি করে দেয়া হয়েছে। চট্টগ্রামের গোয়েন্দা পুলিশ ২ দিন অভিযান চালিয়ে কালোবাজারী চক্রের রিং লিডারের সন্ধান লাভ করেছে। ইনি হচ্ছেন সীতাকুন্ড থানা বি.এন.পি'র নেতা রিফাত পাশা চৌধুরী। পুলিশ তার মাঝিরঘাট ষ্ট্যান্ড রোডস্থ আর,কে এন্টারপ্রাইজে হানা দিয়ে দেড় কোটি টাকা মূল্যের ১১শ' মেঃ টন সার উত্তোলনের কাগজপত্র উদ্ধার করে।[২৯]
- বিচারপতি আব্দুর রউফ এর বিরুদ্ধে হাইকোর্ট ও আপীল বিভাগে দুটি রীট মামলা থাকা অবস্থায় তাঁকে সুপ্রীম কোর্টের আপীল বিভাগে সরকার নিয়োগ দিয়েছে। এই নিয়োগকে আইনজীবী সমন্বয় পরিষদের সভাপতি শামসুল হক চৌধুরী বিচার ব্যবস্থা ও আইনের শাসনের পরিপন্থী হিসেবে অভিহিত করেছেন। উল্লেখ্য সংবিধানের ১১৮ অনুচ্ছেদ ৩ (ক) বিধানমতে প্রধান নির্বাচন কমিশনার প্রজাতন্ত্রের অন্য কোনো দায়িত্বে নিয়োজিত হতে পারে না। অথচ তাঁকে প্রথমে হাইকোর্টে পরে সুপ্রীম কোর্টের আপীল বিভাগে নিয়োগ দেয়া হয়েছে। এর বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে দু'টি রীট মামলা করা হয়।[৩০]
- বি.এন.পি সরকারের শাসনামলে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অধীনে বি.সি.এস (পুলিশ) বি.সি.এস (আনসার) এবং বহিরাগমন ও পার্সপোর্ট অধিদপ্তরের নিয়োগ, পদোন্নতি ও সিনিয়র স্কেল প্রদান এসব বিষয়ে কোনো নিয়মনীতি মানা হয়নি। এসব কিছু হয়েছে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আব্দুল মতিন চৌধুরীর ইচ্ছা মাফিক। সরকারী কর্ম-কমিশনের ১৯৯৪ সালের বার্ষিক প্রতিবেদনে এসব অনিয়মের কথা বিস্তারিতভাবে উল্লেখ রয়েছে।[৩১]

বি.এন.পির দ্বিতীয় অঙ্গীকার ছিলো বিচার বিভাগের স্বাধীনতা ও নিরপেক্ষতা এবং আইনের শাসন নিশ্চিত করা। সর্বপ্রকার কালাকানুন বাতিল করে জনগণের মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করা। অথচ বিচার বিভাগের স্বাধীনতা নিশ্চিত করার জন্য প্রশাসনকে বিচার বিভাগ থেকে আলাদা করা হয়নি। এ সম্পর্কে সংসদে বিরোধী দল কর্তৃক আনীত বিল সরকার পাস করতে দেয়নি। দেশের

Dhaka University Institutional Repository

বিচার ব্যবস্থার কথা সাবেক বিচারপতিরা যখন জনসমক্ষে স্বীকার করেন তখন পরিস্থিতির ভয়াবহতা সহজেই অনুমেয়। দেশে আইনের শাসন ও মৌলিক অধিকার পুরোপুরি প্রতিষ্ঠিত হয়নি। সরকারী হস্তক্ষেপের কারণে আইন ও প্রশাসন স্বাভাবিকভাবে কাজ করতে পারছে না।

সর্বপ্রকার কালাকানুন বাতিলের অঙ্গীকার করেও সরকার বিশেষ ক্ষমতা আইনের কোনো কালাকানুনই বাতিল করেনি। কালাকানুন বলবৎ থাকায় সরকার রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের ওপর নির্যাতন ও প্রভাবশালী ব্যক্তিরা তাঁদের প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার সুযোগ পাচ্ছে। কালাকানুনের কারণে মানুষ গণতন্ত্রের সকল সুফল ভোগ করতে পারছে না। এদিকে সরকার এখন আর বিশেষ ক্ষমতা আইনকে কালাকানুন মনে করেন না।[৩২]

সংবাদপত্রের স্বাধীনতা নিশ্চিতকরণ এবং গণপ্রচার মাধ্যম সমূহকে নিরপেক্ষ রাখার উদ্দেশ্যে স্বায়ত্তশাসিত সংস্থায় পরিণত করার অঙ্গিকার ছিলো বি, এন, পি'র। কিন্তু এক্ষেত্রে বি, এন, পি সরকার অঙ্গিকার ভঙ্গ করেছে। বিশেষ করে রেডিও টিভির মত গুরুত্বপূর্ণ গণমাধ্যম সমূহকে নিরপেক্ষ স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে পরিণত করার অঙ্গিকার ভঙ্গ করে সরকার এ প্রতিষ্ঠান দু'টিকে পূর্ববর্তী সরকারের মত সরকার প্রধানের ব্যক্তিগত প্রচার মাধ্যমে পরিণত করেছে। সংবাদ পত্রের স্বাধীনতা থাকলেও নিউজ প্রিন্ট, কোঠা ও বিজ্ঞাপন বন্টনে বৈষম্যমূলক নীতির কারণে সংবাদ পত্রগুলোর পক্ষে সব সময় স্বাধীনভাবে মতামত প্রকাশ সম্ভব হয়নি।[৩৩] বাংলাদেশ টেলিভিশন কর্তৃক প্রচারিত সংবাদ ও তথ্য রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নিরপেক্ষ নয় বলে জাপান সরকার বিটিভি'র ৩টি বড় প্রকল্পে প্রায় ১৫০ কোটি টাকা আর্থিক সহায়তা দান বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। গত ৮ অক্টোবর '৯৫ জাপান সরকার কর্তৃক বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগকে লেখা চিঠিতে এই সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। [৩৪] গণতান্ত্রিক পরিবেশ নিশ্চিত এবং সব দলের মতামত প্রকাশে স্বাধীনতার অঙ্গীকার বি, এন, পি পূরণ করেনি। ক্ষমতায় থাকা অবস্থায় তারা বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সহস্রাধিক জনসভা পণ্ড করে দিয়েছে। ২৬ মার্চ' ৯৩ গণআন্দোলনের প্রথম বাহিনীতে পুলিশ নারকীয় তাণ্ডব চালিয়ে সভা পণ্ড করেছে। শহীদ জননী জাহানারা ইমামকে পেটানো হয়েছে, তা নজির বিহীন। তাদের শাসনামলে গণতান্ত্রিক পরিবেশ বাস্তবে ছিলোনা। যেটুকু ছিলো তা বি, এন, পি'র নেতা কর্মীদের মুখে মুখে।[৩৫]

বাংলাদেশের সংবিধানে আইন সংক্রান্ত কাজের জন্য সংসদীয় কমিটিসমূহ গঠনের বিধান রয়েছে। সংবিধানের ৭৬ নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী সংসদকে সংসদীয় বিধি (Rules of procedure) অনুসারে পাবলিক একাউন্টস কমিটিসহ অন্যান্য স্ট্যান্ডিং কমিটি গঠনের ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ক্ষমতা

Dhaka University Institutional Repository

প্রদান করা হয়েছিলো। এভাবে জাতীয় সংসদে অতিরিক্ত কমিটিসমূহ গঠন করা হয়েছিলো। যার উদ্দেশ্য ছিলোঃ খসড়া বিল বিবেচনা করা; সংসদীয় প্রস্তাবসমূহ পরীক্ষা করা; আইন প্রয়োগের জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপের পর্যালোচনা ও প্রস্তাব রাখা; এবং প্রশাসন ও মন্ত্রণালয়গুলোর কর্মকান্ডের পরীক্ষা ও প্রয়োজনীয় অনুসন্ধান চালানো। উপরোক্ত কমিটিসমূহ তাদের ওপর অর্পিত কাজের জন্য সাক্ষী প্রদান করতে এবং প্রয়োজনীয় দলিল বা তথ্য সরবরাহ করতে বাধ্য করার ক্ষেত্রে সংসদ কর্তৃক ক্ষমতা প্রাপ্ত।

কিন্তু কমিটির রিপোর্ট এবং সুপারিশ সরকার কর্তৃক গৃহীত হলেও বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই কমিটিসমূহের পরামর্শ কদাচিৎ বাস্তবায়িত হয়। এ প্রসঙ্গে পাবলিক একাউন্টস কমিটির উদাহরণ প্রণিধান যোগ্য। ১৯৯৩ সালের জুলাই মাসে পাবলিক একাউন্টস কমিটির ৩য় রিপোর্টে [৩৬]উল্লেখ করা হয় যে, অনেক ক্ষেত্রেই এর সুপারিশগুলোকে গুরুত্ব দেয়া হয়না এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে একদম বাস্তবায়িত হয়নি। অধিকন্তু মন্ত্রণালয়সমূহ অডিট আপত্তি নিরসনসহ অতিরিক্ত ব্যয় অনুমোদনে অনীহা প্রদর্শন করে এবং এভাবে অর্থনৈতিক অব্যবস্থা বন্ধ করতে কমিটির নির্দেশ বা সুপারিশ গুরুত্বহীন হয়ে পড়ে। উক্ত রিপোর্টে আরো উল্লেখ করা হয় যে, শুধু অতীতের হিসেব এবং প্রতিবেদন পরীক্ষা করা বা সুপারিশ করা অর্থহীন কাজ ছাড়া আর কিছু নয়। এসব কারণে বলা যেতে পারে যে, যুক্তরাজ্য বা ভারতের প্রতিপক্ষের ন্যায় বাংলাদেশের পাবলিক একাউন্টস কমিটি যথেষ্ট কার্যকর হতে পারেনি এবং এর মাধ্যমে সরকারের স্বচ্ছতা বা জবাবদিহিতা সুনিশ্চিত হয়নি। কমিটির রিপোর্টের গুরুত্বহীনতার আর একটি উদাহরণ দেয়া যেতে পারে, সরকারী প্রতিষ্ঠান কমিটি কর্তৃক ইতোমধ্যে সরকারী সংস্থাগুলোর অব্যবস্থা ও অসঙ্গতি সম্বলিত দু'টি রিপোর্ট পেশ করা সত্ত্বেও দুর্নীতিসহ অন্যান্য অনিয়ম দূর করার ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষের পদক্ষেপ গ্রহণ পরিলক্ষিত হয়নি।[৩৭] কমিটিসমূহের রিপোর্ট এবং সুপারিশ কদাচিৎ বাস্তবায়নে সরকারের স্বচ্ছতা বা জবাবদিহিতার ওপর প্রাথমিক সাক্ষাৎকারের জরিপে বিভিন্ন শ্রেণীর উত্তরদাতাদের দেয়া তথ্য বিশ্লেষণ করে যে তথ্য বের হয়ে আসছে, তা হচ্ছে, হ্যাঁ বলেছেন ২.৬৬%, না ২৫.৩৩%, অধিকাংশ ৬.৬৬%, আংশিক ৬০% এবং মোটামুটি বলেছেন ৫.৩৩% (দেখুন সারণী ৬.১)।

সারণী-৬.১

কমিটিসমূহের রিপোর্ট এবং সুপারিশ কদাচিৎ বাস্তবায়নে সরকারের স্বচ্ছতা বা জবাবদিহিতার ওপর মতামত

উত্তরের ধরন	গণসংখ্যা				
	সংসদ-সদস্য	শিক্ষক	ছাত্র	মোট	শতকরা
সম্পূর্ণ	২	-	-	২	২.৬৬
মোটেই না	৬	৯	৪	১৯	২৫.৩৩
অধিকাংশ	-	-	৫	৫	৬.৬৬
আংশিক	১৪	১৫	১৬	৪৫	৬০
মোটামুটি	৩	১	-	৪	৫.৩৩

নির্বাহী বিভাগের দায়িত্বশীলতা নিশ্চিত করতে এবং সংসদকে কার্যকর রাখার জন্য সংসদীয় কমিটিগুলোর তড়িৎ দায়িত্ব পালনসহ রিপোর্ট প্রদান বিশেষভাবে প্রয়োজনীয়। কিন্তু পঞ্চম জাতীয় সংসদের গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি কমিটি ঐকমত্যের অভাবে দীর্ঘদিন ধরে অকার্যকর ছিলো। কৃষি মন্ত্রীর দুর্নীতি সংক্রান্ত তদন্ত কমিটি স্পীকারের নেতৃত্বে গঠিত হয় এবং এক ডজনেরও অধিকবার বৈঠক করেও এর টার্মস অব রেফারেন্স প্রণয়ন করতে ব্যর্থ হয়েছে। অন্য আর একটি কমিটিতে জেলা পরিষদের কাঠামো সম্পর্কে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ সম্ভবপর হয়নি। [৩৮] ইনডেমেনিটি অধ্যাদেশ (রিপিল) বিলের ওপর গঠিত বিশেষ কমিটি চূড়ান্ত রিপোর্ট প্রস্তুত করতে পারেনি। সংসদীয় ব্যবস্থার উপযোগী নতুন বিধিমালা প্রণয়নে গঠিত সংশ্লিষ্ট কমিটি বিভিন্ন বৈঠক করেও ঐকমত্যে পৌছতে ব্যর্থ হয়েছে।[৩৯] অথচ সাক্ষাত প্রার্থীদের শতকরা ১০০%-ই ইনডেমেনিটি অধ্যাদেশ আইন বাতিলের পক্ষে ছিলেন। তাঁদের মতে "সকল হত্যার-ই বিচার হওয়া উচিৎ"। উল্লেখযোগ্য এসব সংসদীয় কমিটিসমূহের অকার্যকারিতার নেতিবাচক প্রভাব সার্বিকভাবে কমিটি ব্যবস্থার ওপর পড়ে এবং সংসদ কর্তৃক সরকারের জবাবদিহিতা অর্জনের প্রক্রিয়া অনুপস্থিত থেকে যায়।

সরকার বাজার অর্থনীতির কথা বললেও বি, এন, পি'র শাসনামলে বাজার অর্থনীতির ধারা প্রতিষ্ঠিত হয়নি। ব্যবসা-বাণিজ্যে সরকারী হস্তক্ষেপ ঘটেছে প্রতিনিয়ত। কে কোন্ ব্যবসা পাবে, কাকে কি কাজ দেয়া হবে তা অনেকাংশ সরকারী দলের সিদ্ধান্তের ওপর নির্ভরশীল ছিলো। সর্বনিম্ন দরপত্র দাতাকে কাজ না দিয়ে অনেক সময় পছন্দসই ব্যক্তিদেরকে কাজ দেয়া হয়েছে।[৪০]

Dhaka University Institutional Repository

বি, এন, পি সরকার ক্ষমতায় যাওয়ার আগে কৃষকদের বলেছিলেন, ন্যায্যমূল্যে সার, বীজ ও নলকূপ সরবরাহ করবেন। ক্ষমতাসীন বি, এন, পি'র কাছ থেকে কৃষকরা সার পায়নি। পেয়েছে গুলি, টিয়ার গ্যাস ও লাঠি। ১৭ জন কৃষককে গুলি করে মারা হয়েছে সার চাওয়ার অপরাধে।[৪১]

সংসদের মূল দায়িত্ব দেশের আইনসভা হিসেবে কাজ করা। কিন্তু আমাদের দেশে অধিকাংশ আইন অধ্যাদেশের মাধ্যমে পাস করে তাকে সংসদে হালাল করে নেয়া হয়েছে। গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে আইন পাস হয় সংসদে এবং সেখানে তা আলোচিত হয়। সংসদীয় গণতন্ত্রে অনেক গুরুত্বপূর্ণ আইন বাছাই কমিটির কাছে যায় ও সেই সম্বন্ধে অনেক সময় জনমত সংগ্রহ করা হয়। আমাদের আইন প্রণয়নের বেলায় তা বলতে গেলে ঘটেইনি। সত্যিকারের বলতে গণতন্ত্রে কোনো আইন অধ্যাদেশের মাধ্যমে জারি করা মোটেই উচিত নয়। অথচ এই অপকর্মটি করার ব্যাপারে আমরা দ্বিধা করিনা। যতদিন না আইন পাসের ক্ষমতা পুরোপুরিভাবে সংসদের কাছে আসবে, ততদিন সংসদীয় গণতন্ত্র গ্র্যাজুয়েশন লাভ করবেনা।[৪২] পঞ্চম সংসদে প্রায় এক-তৃতীয়াংশ অধ্যাদেশ সংক্রান্ত আইন পাস কি গণতান্ত্রিক? এর ওপর বিভিন্ন শ্রেণীর উত্তর দাতাদের মধ্যে ২৪% হ্যাঁ বাচক, ৬৫.৩৩% নেতি বাচক এবং ১০.৬৬% কোনো তথ্য দেয়নি (দেখুন সারণী ৬.২)।

সারণী ৬.২

পঞ্চম সংসদে প্রায় এক-তৃতীয়াংশ অধ্যাদেশ সংক্রান্ত আইন পাস কি গণতান্ত্রিক?

এর ওপর মতামত

উত্তরের ধরন	গণসংখ্যা				
	সংসদ-সদস্য	শিক্ষক	ছাত্র	মোট	শতকরা
হ্যাঁ	৯	৬	৩	১৮	২৪
না	১৬	১৯	১৪	৪৯	৬৫.৩৩
জানি না	-	-	৮	৮	১০৬৬

১৯৯৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে বৃটিশ হাউজ অব লর্ডস এর সদস্য লর্ড ওয়েদাবিল বাংলাদেশ সফরে এসেছিলেন। লর্ড হবার পূর্বে তিনি পাঁচ বছর হাউজ অব কমন্সের স্পীকার ছিলেন। লর্ড ওয়েদাবিল ছিলেন রক্ষণশীল দলের সদস্য কিন্তু স্পীকার হিসেবে নির্বাচিত হওয়ার পর তিনি এক দিনের জন্যও পার্টির মিটিং-এ যোগদান করেননি। কারণ তা সংসদীয় গণতন্ত্রের ঐতিহ্যের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। আমাদের পঞ্চম সংসদের স্পীকার এই ঐতিহ্য পালন করেননি। ফলে আমাদের সংসদীয় গণতন্ত্রের ধারা ক্ষুণ্ন হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

লর্ড ওয়েদাবিল আর একটি বক্তব্য রেখেছিলেন। তিনি বলেছিলেন যে, বৃটিশ সংসদে দেশের প্রধানমন্ত্রী সপ্তাহে দু'বার সংসদে প্রশ্নের উত্তর দেন। আমাদের প্রধানমন্ত্রী এই নীতি পালন করেননি। অথচ সংসদীয় গণতন্ত্রে প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রীমন্ডলীর সঙ্গে সংসদের একটি ঘনিষ্ঠ বন্ধন আছে। প্রশ্ন-উত্তরে অংশগ্রহণ করে বৃটেনের প্রধানমন্ত্রী নিজেকে সংসদের সঙ্গে একাত্মতা করেন। এই ব্যাপারটা আমাদের বেলায় ঘটেনি। কেবল প্রশ্ন উত্তরের বেলায় কেন, প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া সংসদে কোনো তাৎপর্যপূর্ন ভূমিকা রাখেননি। প্রধানমন্ত্রী যখন জনগণের সামনে উপস্থিত হতেন, তখন তাঁর গণতান্ত্রিক আদল ধরা পড়তো। কিন্তু সরকার চালানোর সময় ও সংসদের নেতৃত্ব দেবার সময় সেই আদল দেখা যায়নি। ব্যাপরটা মূলতঃ অনাভ্যাসের। এই অভ্যাস গড়ে তোলার প্রয়াস প্রয়োজন ছিলো। অবশ্য সংসদে তিনি নিজে যা পারেননি তা তিনি অন্যদের দ্বারা করিয়েছেন। তবে ব্যাপারটা অনেক সময় নৈতিকতা ও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ হয়নি।[৪৩]

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে সংসদকে পাশ কাটিয়ে অধ্যাদেশ আকারে আইন জারির প্রবণতা নিয়ে সংসদের প্রথম অধিবেশন থেকে দ্বাদশ অধিবেশন পর্যন্ত বিরোধী দল ছিলো সমালোচনা মূখর। পঞ্চম সংসদে বাইশটি অধিবেশনে পাশ হয়েছে ১৭৩ টি বিল। তন্মধ্যে ৫৭ টি অধ্যাদেশ বিল এবং ১ টি বেসরকারী বিল পাস হয়।[৪৪] বাইশটি অধিবেশনের মধ্যে প্রধান মন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া সতের বার কথা বলেছেন। আর তেরটি অধিবেশনের মধ্যে শেখ হাসিনা মোট পঁয়ত্রিশ বার কথা বলেছেন। তেরটি অধিবেশনের মধ্যে একটি অধিবেশনে শেখ হাসিনা উপস্থিত ছিলেন না।[৪৫] পঞ্চম সংসদে বিরোধী দলের সদস্যরা মোট বাষট্টি বার ওয়াক আউট করেন।[৪৬] কারণে অকারণে এত অধিক সংখ্যক ওয়াক আউট সংসদের কাজে ব্যাঘাত ঘটেছে।

বি, এন, পি'র পাঁচ বছরের শাসনে পররাষ্ট্র নীতিতে সাফল্যের বিন্দুমাত্র চিহ্ন খুঁজে পাওয়া যায়নি। তিন বিঘা করিডোর পাওয়াটাকে ফলাও করে প্রচার করা হলেও, এখন দহগ্রাম আঙ্গর পোতাবাসী হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছে তারা কতটুকু স্বাধীন। আসলেই তারা বুঝতে পেরেছে তিন বিঘা পায়নি। ফারাক্কা সমস্যা নিয়ে সরকার বরাবর হৈ চৈ করেছে। বেগম জিয়া জাতিসংঘে ও কমনওয়েলথে ফারাক্কা সমস্যা তুলে ধরেছেন। এ নিয়ে কতবার বৈঠক হয়েছে তা কেবল মাত্র মন্ত্রণালয়ই বলতে পারবে। এসব কিছু কিন্তু গঙ্গার পানির হিস্যা পাবার কোনো বাস্তব উদ্যোগ নয়। সরকারের দায়িত্ব শুধু সমস্যা নিয়ে চিৎকার করা নয়; মেধা এবং কূটনৈতিক চাতুর্য দিয়ে সমস্যার সমাধান করা। কিন্তু বাংলাদেশ সরকার ফারাক্কা সমস্যা নিয়ে যা করেছে তাতে সমস্যা আরো জটিল হয়েছে। বাহ্যিক দিক থেকে দু'দেশের মধ্যে সম্পর্ক তেমন একটা ভাল না হলেও বাস্তবে কিন্তু

Dhaka University Institutional Repository

এদেশে ভারতের বাজারে পরিণত হয়েছে। দেশের সম্ভাবনাময় শিল্পগুলো ভারতের বাণিজ্য আগ্রাসনের কারণে মুখ থুবড়ে পড়েছে। পাকিস্তানের কাছে পাওনা আদায়, আটকে পড়া পাকিস্তানীদের ফিরিয়ে নেয়া, এ দু'টি মারাত্মক এবং জটিল সমস্যাও বি, এন, পি সরকার সমাধান করতে পারেনি। রহিঙ্গা সমস্যা পররাষ্ট্র নীতির সীমাহীন ব্যর্থতা গোটা জাতিকে পীড়িত করেছে। সংবাদ পত্রের স্বাধীনতা নিশ্চিত করার যে অঙ্গিকার বি, এন, পি করেছিলো তা গাল ভরা বুলিতে রূপান্তরিত হয়েছে। যদিও বিশেষ ক্ষমতা আইনের আওতায় পত্রিকা বন্ধের বিধান অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সাহাবুদ্দীন আহমেদ কেড়ে নিয়েছেন। কিন্তু এ শিল্প নানা ভাবে হয়রানি আর শৃংখলে আবদ্ধ। সরকারী বিজ্ঞাপনকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। দলীয় পত্রিকাকে বেশী বিজ্ঞাপন দিয়ে সৎ, বস্তুনিষ্ঠ এবং নিরপেক্ষ সাংবাদিকতাকে নিরুৎসাহিত করা হয়েছে। একুশে জুন'৯২ এদেশে সংবাদ পত্রের ইতিহাসে এক কলঙ্ক জনক অধ্যায় রচনা করেছে বি,এন,পি সরকার। ঐদিন প্রেস ক্লাবে ঢুকে যে ভাবে পুলিশ সাংবাদিকদের নির্যাতন করেছে তা সভ্য সমাজে এক নজির বিহীন ঘটনা। এই ব্যাপারে তদন্তের জন্য একটি কমিশন গঠন করা হলেও কোনো রিপোর্ট প্রকাশিত হয়নি। কিংবা দোষী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হয়নি। সাংবাদিকদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করা হয়েছে। যা প্রকারন্তে সংবাদ পত্রের স্বাধীনতার বিরূদ্ধে কাজ করেছে। রেডিও টেলিভিশনকে স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরিত করার অঙ্গিকার থাকলেও বি, এন, পি সরকার বেশী করে এটাকে দলীয়করণ করেছে। একবার তথ্যমন্ত্রী ব্যারিস্টার নাজমুল হুদা গর্বের সাথে সংসদে বলেছেন রেডিও টেলিভিশন আমাদের। তারা আমাদের কথা বলবে, আমাদের কথা মত চলবে। বিরোধী দল থেকে রেডিও টেলিভিশনের স্বায়ত্তশাসন করার একটি প্রস্তাবিত বিল সরকার নাকোচ করে দেয়। তবে প্রশ্ন হচ্ছে, বিগত পাঁচ বছর বিশেষ করে চলমান আন্দোলনের দু'বছর ধরে ক্ষমতায় থেকে যে সব দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি, নির্লজ্জ দলীয়করণ আর সার, খাদ্য, শ্রমিক কর্মচারীদের দাবিসহ সরকারের দলত্যাগ ও অবৈধ নির্বাচন বাতিল, তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি দমানোর জন্য নির্বিচারে যে হত্যাকাণ্ড চালানো হয়েছে, সংবিধানে নিজেদের ক্ষমতা টিকিয়ে রাখার বর্ম হিসেবে যে ভাবে ব্যবহার করা হয়েছে, সচিবালয়ের কর্মচারীকে রাস্তায় নামতে বাধ্য করার পরিস্থিতি যে ভাবে সৃষ্টি করা হয়েছে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সন্ত্রাস সৃষ্টির মাধ্যমে পরিকল্পিত ভাবে শিক্ষার ক্ষেত্রে যে চরম নৈরাজ্য সৃষ্টি করা হয়েছে, এসবের দায়-দায়িত্ব বি, এন, পি সরকার এড়াতে পারেনি।[৪৭] আর যদি তিনি মনে করেন লাঠি, টিয়ার গ্যাসের দাপটে আর ভোটার বিহীন একটি নির্বাচনের প্রহসন করে একটি তত্ত্বাবধায়ক বিল পাসের প্রতিশ্রুতি দিয়ে তিনি ক্ষমতায় এসেছিলেন তাহলে বলতে হবে তিনি প্রতিশ্রুতি পূরণ করেছেন। তিনি দেশের অর্থনীতিকে ধবংস করে গোটা দেশকে পঙ্গু করে শতাধিক লোকের রক্ত ঝড়িয়ে নিশ্চই প্রতিশ্রুতি পালন করেছেন।[৪৮]

Dhaka University Institutional Repository

সরকারের পতনের পরও অবৈধ উপার্জিত কালো টাকা আর অস্ত্রের জোরে বিভ্রান্তি সৃষ্টির জন্য মরিয়া হয়ে অপকর্ম চালানো হয়েছে। ঢাকা কেন্দ্রীক সমাবেশের আয়োজন করে গোলযোগ সৃষ্টি হতে পারে তেমনি উস্কানিমূলক বক্তৃতা প্রদান করা হয়েছে যাতে তাদের অপকর্মের কলঙ্কময় ইতিহাস চাপা পড়ে যায়। জনগণের দৃষ্টিকে অন্যত্র সরানো যায়। কে না জানে যে, জনগণের দাবির মুখেই বিগত সরকার পদত্যাগ করতে এবং তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবি মেনে নিতে বাধ্য হয়।[৪৯]

তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ধারনা

রক্তপাতহীন যুদ্ধের নাম রাজনীতি। রক্তাক্ত রজনীতির নাম যুদ্ধ।[৫০] বিশ্বের মানব ইতিহাসে এ যাবত যে সকল সমাজ সংঘাত হয়েছে তা কখনও রাজনৈতিক যুদ্ধ কিংবা যুদ্ধময় রাজনীতির পরিণতি। কখনও জাতি স্বার্থে, গোষ্ঠীস্বার্থে আগ্রাসনের জন্যে। কখনও আদর্শিক প্রভাব বিস্তারের প্রশ্নে আবার কখনও অধিকার আদায় অথবা নিপীড়ন, আধিপত্য, বঞ্চনার প্রতিবাদে ছিলো এই সব যুদ্ধ। হাজার বছরের বাঙ্গালি জাতি বিকাশের ইতিহাসে ব'দ্বীপের এই ভূ-খণ্ডেও শ্রেণী সংঘাত, স্বাধীকার আদায়ের উত্থান, মুক্তি সংগ্রামের রাজনীতির ইতিহাসে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আন্দোলন ও ইহার প্রতিষ্ঠা যুক্ত করেছে নতুন মাত্রা।

এরশাদ বিরোধী আন্দোলনের এক পর্যায়ে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবিটি প্রথম বাংলাদেশের রাজনীতিতে উঠে আসে। প্রথম কে তুলছিলো এরকম দাবি তা নিয়ে তৎকালীন পাঁচদল এবং জামাত ইসলামীর মধ্যে একটা বিতর্ক আছে। সে যাই হোক, ঘটনাক্রমে এই ইস্যু এরশাদ বিরোধী আন্দোলনের মূল শ্লোগান হয়ে উঠেছিলো '৯০তে। তীব্র আন্দোলনের চাপে যথারীতি এরশাদের পতন হয়। সাংবিধানিক ধাপ অনুসরণ করে এরশাদ ক্ষমতা থেকে সরে আসেন। তৎকালীন তিন জোটের প্রতিনিধি হিসেবে প্রধান বিচারপতি সাহাবুদ্দীন অস্থায়ী রাষ্ট্রপ্রতির দায়িত্ব নেন। তাঁরই নেতৃত্বে যে নির্দলীয় নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠিত হয় সেই অন্তবর্তীকালীন সরকারের অধীনেই '৯১ এর ফেব্রুয়ারীতে দেশে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। বি, এন, পি সংখ্যাগরিষ্ঠ আসন এবং জামাতের প্রয়োজনীয় সমর্থন নিয়ে সরকার গঠন করে। কালক্রমে বি, এন, পি সরকারের আমলেই আবারও সেই তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ইস্যুটি ধীরে ধীরে সামনে চলে আসে।[৫১] অবশ্য পঞ্চম সংসদের শুরুর দিকেই '৯২ সালে জামাতে ইসলামী সংসদে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের একটি সংশোধনী বিল পেশ করে রাখে। কারণ তাদের জানা ছিলো এই ইস্যু আবার আসবে। '৯৪ সালে এসে যখন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ইস্যু আরো প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে আওয়ামীলীগের আবদুর রহীম এবং জাতীয় পার্টির মওদুদ আহমেদও অনুরূপ একটি করে বিল সংসদে জমা দেন।[৫২]

Dhaka University Institutional Repository

সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন ও সংকট শুরু

১৯৯৪ সালের ৩০ জানুয়ারী দেশে ৪টি সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনে বি, এন, পি ঢাকা ও চট্টগ্রাম হেরে যায়। এ পর্যন্ত নির্বাচন কমিশনের প্রতি মানুষের আস্থা ছিলো। কিন্তু সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে ঢাকা ও চট্টগ্রামে হেরে যাওয়ায় বি, এন, পি শঙ্কিত হয়ে ওঠে। তারা সরকারী ক্ষমতার অপব্যবহার করে। পরবর্তী নির্বাচনগুলোতে যে কোনো প্রকারে জয় লাভের চিন্তা ভাবনা করতে থাকে। এ চিন্তা ভাবনার নগ্ন বহিঃপ্রকাশ ঘটে মাগুরা উপ-নির্বাচনে। এ মাগুরা উপ-নির্বাচনকে কেন্দ্র করেই দেশে রাজনৈতিক সংকট ঘনীভূত হতে থাকে।[৫৩]

তৎপূর্বে ইসরাইল অধিকৃত হেবরন মসজিদে নামাজ পড়া অবস্থায় গুলি করে ৬৩ জন ফিলিস্তিনিকে হত্যা করার ঘটনাটি নিয়ে বিরোধী দল ১ মার্চ '৯৪ এর সংসদ অধিবেশনে আলোচনার দাবি তোলার পর বিরোধী দল ও সরকারী দল বিতর্কে অবতীর্ণ হয়, এক পর্যায়ে তথ্য মন্ত্রী ব্যারিস্টার নাজমুল হুদা বিরোধী দলকে "হঠাৎ মুসলমান" বলে কটাক্ষ করলে সংসদে অচলাবস্থা দেখা দেয়। তুমুল প্রতিবাদের মুখে তথ্য মন্ত্রী তাঁর মন্তব্যের জন্য দুঃখ প্রকাশ এবং তা প্রত্যহার করলেও বিরোধী দলীয় নেত্রী শেখ হাসিনার দাবি অনুযায়ী তিনি নিঃশর্ত ক্ষমা প্রার্থনা না করায় বিরোধী দল সংসদ থেকে একযোগে ওয়াক আউট করে। এর পর বিরোধী দল আর সংসদে ফিরে যায়নি।[৫৪]

এই সংসদ বর্জন চলাকালীন অবস্থাতেই মাগুরা- ২আসনে ২০ মার্চ তারিখে উপ-নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এই নির্বাচনে সরকার নজির বিহীন কারচুপির আশ্রয় নিয়েছে, যাতে বিরোধী দল একযোগে ভোট ডাকাতি, সন্ত্রাস ও কারচুপির অভিযোগ উত্থাপন করে। জাতীয় সংবাদ পত্রেও মানবাধিকার সংস্থার রির্পোটেও নজির বিহীন ভোট ডাকাতির খবর আসে, বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় নির্বাচন ৮৮'র এরশাদের ভোট ডাকাতিকেও হার মানিয়েছে বলে খবর প্রচার করেছে। কারণ ৮৮'র ভোট ডাকাতিতে সর্বোচ্চ ৬৫% ভোট পড়েছিলো অথচ মাগুড়া নির্বাচনে সর্বোচ্চ ভোট পড়েছে ৭২%। সব কয়টি বিরোধী দল এ নির্বাচনের ফলাফলকে প্রত্যাখান করে। এ নির্বাচনের পরিণতিই বিরোধী দলের তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে জাতীয় নির্বাচনের দাবিকে আন্দোলনে রূপদান করে। তাঁরা দাবি করে যে, বি.এন.পি'র অধীনে ভবিষ্যতে কোনো নির্বাচন সুষ্ঠু হওয়ার সম্ভাবনা নেই। সুতরাং তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য সংবিধান সংশোধনের বিল বি.এন.পিকেই সংসদে উত্থাপন করতে হবে। বিল না আসা পর্যন্ত সংসদে ফিরে যাবে না বলে বিরোধী দলগুলো অংগীকার ব্যক্ত করে।[৫৫] পঞ্চম সংসদের উপনির্বাচনগুলো অবাধ, নিরপেক্ষ এবং সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়েছিলো কিনা। এর ওপর জরিপ করতে

গিয়ে দেখা যায় যে, বিভিন্ন শ্রেণীর উত্তরদাতাদের মধ্যে ৯.৩৩% ইতিবাচক, ২৫.৩৩% নেতিবাচক, ৯.৩৩% অধিকাংশ, ৪৫.৩৩% আংশিক এবং ৮% মোটামুটি তথ্য দিয়াছেন (দেখুন সারণী ৬.৩)।

সারণী ৬.৩

পঞ্চম সংসদে উপনির্বাচনগুলোর অবাধ, নিরপেক্ষ এবং সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন সংক্রান্ত মতামত।

উওরের ধরন	গণসংখ্যা				
	সংসদ-সদস্য	শিক্ষক	ছাত্র	মোট	শতকরা
হ্যাঁ	৫	-	২	৭	৯.৩৩
না	৫	৮	৬	১৯	২৫.৩৩
অধিকাংশ	২	-	৫	৭	৯.৩৩
আংশিক	১১	১৫	৮	৩৪	৪৫.৩৩
মোটামুটি	২	১	৩	৬	৮
জানি না	-	১	১	২	২.৬৬

৬ জুন বিরোধী দলবিহীন বাজেট অধিবেশন বসে। ২৭ জুন সংসদ ভবনে এক যৌথ সাংবাদিক সম্মেলনে আওয়ামীলীগ, জাতীয় পার্টি ও জামাত ইসলামী তত্ত্বাবধায়ক সরকারের রূপরেখা ঘোষণা করে। প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া উক্ত রূপরেখাকে অসাংবিধানিক ও অবৈধ ঘোষণা করেন। ফলে রাজনৈতিক অচলাবস্থা বাড়তে থাকে।[৫৬]

সংকটের শুরু এবং দেশী-বিদেশী উদ্যোগ

সেই সংকটের শুরু। একই সঙ্গে সংকট নিরসনের উদ্যোগের চেষ্টাও শুরু। মে '৯৪ তেই প্রথমে স্পীকার শেখ রাজ্জাক আলী একটা উদ্যোগ নেন। তৎকালীন উপনেতা আবদুস সামাদ আজাদের সঙ্গে আলোচনাকালে বিরোধী দল সরকারকে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের একটি সংশোধনী বিল আনতে বলে। সরকার এতে সায় না দেয়ায় উদ্যোগটি ব্যর্থ হয়ে যায়। এরপর জুন, জুলাই, '৯৪তে সংসদ উপনেতা বদরুদ্দোজা চৌধুরী বিরোধী দলের সঙ্গে কথা বলার উদ্যোগ নেন। একই কারণে ব্যর্থ হয় আলোচনা এবং চিঠিপত্রের সংলাপ। [৫৭] তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সমস্যা সমাধানে ভূমিকা প্রদানের ক্ষেত্রে বিদেশীদের মধ্যে অষ্ট্রেলিয়ার সাবেক বিচারপতি স্যার নিনিয়ানের নাম উল্লেখযোগ্য। এছাড়াও রয়েছেন, কমনওয়েলথ মহাসচিব চীফ এমেকা এ্যানিয়াওকু, মার্কিন রাষ্ট্রদূত ডেভিড মেরিল, বৃটিশ হাই কমিশনার জে. ফাউলারসহ আর ক'জন। বিশেষ করে স্যার নিনিয়ানসহ অপরাপর সকলেই উল্লেখ্য সমস্যা সমাধানের জন্য সরকারী ও বিরোধী দলীয় নেত্রীর সাথে ব্যাপক আলাপ-আলোচনা ও চেষ্টা তদবির করেন। কিন্তু সকল চেষ্টাই উভয় নেত্রীর অনমনীয় মনোভাবের কাছে ব্যর্থতায় পর্যবেশিত হয়।

বিরোধীদের পদত্যাগ

৬ ডিসেম্বর আওয়ামীলীগ, জাতীয় পার্টি এবং জামাত - ই - ইসলামী পৃথক পৃথক সমাবেশ থেকে সরকারের পদত্যাগ ও তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবিতে ২৭ ডিসেম্বর পর্যন্ত সময় দিয়ে ২৮ ডিসেম্বর একযোগে সংসদ থেকে পদত্যাগের ঘোষণা দেয়। কিন্তু সরকার তার অবস্থানে অনঢ় থাকায় ২৮ ডিসেম্বর বিরোধী দলীয় ১৪৭ জন এমপি পদত্যাগ পত্র পেশ করেন। বিরোধী দলগুলোর পদত্যাগই কি ছিলো একমাত্র পথ? এর ওপর জরিপে বিভিন্ন শ্রেণীর উত্তরদাতাদের মধ্যে ৪৪% ইতিবাচক মতামত প্রদান করেন এবং ৫৬% নেতিবাচক তথ্য দেন (দেখুন সারণী ৬.৪)।

সারণী ৬.৪

সংসদ থেকে বিরোধী দলগুলোর পদত্যাগই ছিলো একমাত্র পথ - এর ওপর মতামত

উত্তরের ধরন	গণসংখ্যা				
	সংসদ-সদস্য	শিক্ষক	ছাত্র	মোট	শতকরা
হ্যাঁ	১৪	৯	১০	৩৩	৪৪
না	১১	১৬	১৫	৪২	৫৬

২৩ ফেব্রুয়ারী স্পীকার পদত্যাগ পত্র গ্রহণযোগ্য নয় বলে রুলিং দেন। ফলে বিরোধী শিবিরে তীব্র অসন্তোষ দেখা দেয়। এর পূর্বে প্রধানমন্ত্রী ২৯ ডিসেম্বর মুন্সীগঞ্জ এক জনসভায় বক্তৃতায় বলেন, তিনি নির্বাচনের ৩০ দিন আগে পদত্যাগ করবেন।

তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠনে ভিন্ন প্রস্তাব

এদিকে ৯৫'র ১০ জানুয়ারী 'বঙ্গবন্ধু প্রত্যাবর্তন' দিবসের একটি বক্তৃতায় শেখ হাসিনা বলেন, রাষ্ট্রপতির অধীনে নির্দলীয় উপদেষ্টামন্ডলী নিয়োগ করে একটি তত্ত্বাবধায়ক সরকার হতে পারে। সরকার বিরোধী দলীয় নেত্রীর সেই প্রস্তাবের কোনো জবাব দেয়নি। তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রতিষ্ঠার মূল দাবি থেকে শেখ হাসিনা খানিকটা সরে আসার প্রস্তাব দিলেও সরকার গ্রহণ করেনি। সরকার যে অবস্থানটি বার বার ঘোষণা করেছে সেটি হলো বর্তমান সংবিধানের ভিতরই কিছু করতে হবে। কিভাবে বর্তমান সরকার পদত্যাগের পর ৩০ দিন একটি সরকার চলবে তা আলোচনা হতে পারে।

ইতোমধ্যে ১৯৯৫ সালের ১৯ জুন পর্যন্ত বিরোধী এমপিদের সংসদে ৯০টি কার্যদিবস একাধিক্রমে অনুপস্থিতি পূর্ণ হয়। ২৭ জুলাই তারিখে পদত্যাগী সাংসদদের আসন শূন্য হওয়ার পক্ষে সুপ্রীমকোর্ট মতামত দেয়। ৩১ জুলাই ৮৭ জন বিরোধী সাংসদদের আসন সংসদ সচিবালয় থেকে

শূন্য ঘোষণা করা হয় এবং ৫৫ জন বয়কট কালে হাজিরা খাতায় স্বাক্ষর করেছিলেন বলে তাঁদেরকে সংসদ সচিবালয় থেকে চিঠি দিয়ে জানতে চাওয়া হয় যে, যেদিন তাঁরা হাজিরা খাতায় স্বাক্ষর করেছিলেন সেদিন তাঁরা বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন কিনা। কিন্তু সাংসদগণ চিঠির কোনো উত্তর দেননি। অবশেষে ৭ আগষ্ট উক্ত ৫৫ জনের আসনও শুন্য ঘোষণা করা হয়।[৫৮] বিরোধী দলের আসন শুন্য হওয়ার পর সরকারী দলের সংসদ ভেঙ্গে দেয়া সম্পর্কে বিভিন্ন শ্রেণীর সাক্ষাৎ প্রার্থীদের মধ্যে ৬৮% ইতিবাচক তথ্য এবং ৩২% নেতিবাচক তথ্য প্রদান করেন (দেখুন সারণী-৬.৫)।

সারণী-৬.৫

সরকারী দলের সংসদ ভেঙ্গে দেয়া সম্পর্কে মতামত

উত্তরের ধরন	গণসংখ্যা				
	সংসদ-সদস্য	শিক্ষক	ছাত্র	মোট	শতকরা
হ্যাঁ	১৭	১৯	১৫	৫১	৬৮
না	৮	৬	১০	২৪	৩২

নির্বাচন কমিশন ১৪২টি শূন্য আসনে ১৭ সেপ্টেম্বর তারিখে উপ-নির্বাচনের ঘোষণা দেয়। পরে বন্যাজনিত কারণে উপ-নির্বাচন পিছিয়ে ১৫ ডিসেম্বর ধার্য করা হয়। কিন্তু বিরোধী দলগুলো নির্বাচন বর্জনের ঘোষণা দেয়। তারা সরকারের পদত্যাগ, সংসদ বাতিল এবং নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচনের দাবিতে ২ সেপ্টেম্বর থেকে ৩২ ঘন্টা হরতাল পালন করে।[৫৯] ৬ সেপ্টেম্বর '৯৫তে আওয়ামীলীগ নেত্রী শেখ হাসিনা সাংবাদিক সম্মেলনে সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বে নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠন করার দাবি জানান এবং অবিলম্বে নতুন নির্বাচন দিতে বলেন। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী উক্ত প্রস্তাবকে আবারো অসাংবিধানিক, অযৌক্তিক বলে উড়িয়ে দিলেন। এই ভিত্তিতে হরতালসহ বিভিন্ন আন্দোলনের কর্মসূচী চলতে থাকে।

শেষ পরিস্থিতি ও ১৫ ফেব্রুয়ারীর নির্বাচন

অক্টোবরের দ্বিতীয় সপ্তাহে মার্কিন রাষ্ট্রদূত ডেভিড মেরিল রাজনৈতিক নেতৃবর্গের সঙ্গে বৈঠকে নতুন করে সমঝোতা তাগিদ দেন। সরকার ও বিরোধী দলে আনুষ্ঠানিক যোগাযোগ ও ব্যর্থ সংলাপ সব সময়েই চলেছে, পাশা-পাশি ৫বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী নাগরিক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া এবং বিরোধী দলীয় নেত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে দেখা করেন[৬০]। তাঁদের বিবেচনা ছিলো বর্তমান সংবিধানের ভিতরই বিরোধী দলের নির্দলীয় নিরপেক্ষ দাবিটিকে প্রতিষ্ঠা করার সম্ভাবনা বের করা, কিন্তু সমস্ত প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। এরপরে ৯৬ ঘন্টা হরতাল হলো; ১৬ নভেম্বর থেকে একাধারে ৭দিন হরতাল পালিত হলো।

Dhaka University Institutional Repository

হরতাল আর অবরোধের ফলে দেশের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতি চরম দুরবস্থার সম্মুখীন হলো। সরকার উপনির্বাচনে না গিয়ে ২৪ নভেম্বর জাতীয় সংসদ ভেংগে দেয়। ১৮ জানুয়ারী সাধারণ নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করা হয়। পরে তৃতীয় বারের মতো এ তারিখ পরিবর্তন করে নতুন তারিখ দেয়া হয় ১৯৯৬ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারী।

বিরোধী দলগুলোর কোনো দাবির প্রতি সরকার কর্ণপাত না করায় সকল বিরোধী দল নির্বাচন বর্জনের ঘোষণা দেয়। একদিনের মধ্যে হঠাৎ তৈরী করা কতিপয় অখ্যাত দল নিয়ে বি.এন.পি. এরশাদীয় কায়দায় নির্বাচন করার উদ্যোগ নেয়। বিরোধী দলগুলোর প্রতিরোধের মুখে ১৫ ফেব্রুয়ারী ৬ষ্ঠ জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। দেশব্যাপী সহিংসতায় কমপক্ষে ১৫ জন নিহত হয়। বিদেশী সাংবাদিকদের মতে এ নির্বাচনে ৫%-৬% এর বেশী ভোটার উপস্থিত হতে দেখা যায়নি। ষষ্ঠ পার্লামেন্ট নির্বাচনের নিরপেক্ষতা সম্পর্কে বিভিন্ন শ্রেণীর উত্তরদাতাদের একটি জরিপে ৮৪% নেতিবাচক, ১২% আংশিক, ৪% মোটামুটি এবং হ্যাঁ-এর পক্ষে কোনো তথ্য পাওয়া যায়নি (দেখুন সারণী ৬.৬)।

সারণী-৬.৬

ষষ্ঠ পার্লামেন্ট নির্বাচন কি অবাধ ও নিরপেক্ষ ছিলো ? এর ওপর মতামত

উত্তরের ধরন	গণসংখ্যা				
	সংসদ-সদস্য	শিক্ষক	ছাত্র	মোট	শতকরা
হ্যাঁ	-	-	-	-	-
না	১৬	২৪	২৩	৬৩	৮৪
আংশিক	৭	১	১	৯	১২
মোটামুটি	২	-	১	৩	৪
অধিকাংশ	-	-	-	-	-

নির্বাচনের ফলাফল বিরোধী দলগুলোকে আরও প্রতিবাদমুখর করে তোলে। সারা দেশ রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলায় নিপাতিত হয়। ২৪, ২৫ ও ২৬ ফেব্রুয়ারী দেশব্যাপী অসহযোগ পালিত হয়। ৬ষ্ঠ সংসদকে অবৈধ ঘোষণা করা হয়। এরপরে তত্ত্বাবধায়ক আন্দোলনের সাথে যুক্ত হয় ষষ্ঠ সংসদ বাতিলের আন্দোলন। ৫ মার্চ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কাছে সরকার পক্ষ থেকে লিখিত প্রস্তাব পাঠানো হয় নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার সম্পর্কে খোলামনে আলাপ করার জন্য। কিন্তু নির্বাচন বাতিল ও সরকারের পদত্যাগের কোনো কথা না থাকায় উক্ত প্রস্তাব প্রত্যাখান হয়। এর পরে ৯ মার্চ

Dhaka University Institutional Repository

হতে সরকার পতন না হওয়া পর্যন্ত বিরোধী দলগুলোর লাগাতার অসহযোগ আন্দোলন শুরু করে। এই অসহযোগের মধ্যেই প্রধানমন্ত্রীর অনুরোধে রাষ্ট্রপতি সংলাপ আহবানের জন্য বিরোধী দলগুলোর সাথে মতবিনিময় করেন; দুই নেত্রীর পত্র বিনিময় হয়; পাঁচ বুদ্ধিজীবী বিভিন্নভাবে সমঝোতা আনয়নের চেষ্টা করেন। কিন্তু সব প্রচেষ্টাই প্রধানমন্ত্রীর অনমনীয় পদক্ষেপের কারণে ব্যর্থতায় পর্যবেসিত হয়। [৬১]

এই অসহযোগের মাঝেই ১৯ মার্চ খালেদা জিয়ার নেতৃত্বে মন্ত্রীপরিষদ গঠিত হয় এবং ৬ষ্ঠ সংসদের অধিবেশন বসে। কিন্তু অসহযোগের ফলে দেশ এক রক্তক্ষয়ী গৃহ যুদ্ধের দিকে ধাবিত হচ্ছিল। আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে গঠিত হয় জনতার মঞ্চ এবং সরকারের পদত্যাগ না হওয়া পর্যন্ত অবস্থান ধর্মঘট শুরু করে। এতে সরকারী কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের একটি বিরাট অংশও যোগ দেয়। ২৮ মার্চ সচিবালয়ের অভ্যন্তরে ১৪৪ ধারা জারি করেও সরকারের সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। শেষ পর্যন্ত জনগণের দাবির মুখেই বিগত সরকার পদত্যাগ করতে এবং তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবি মেনে নিতে বাধ্য হয়। এভাবে লাগাতার তিন সপ্তাহের অসহযোগ এবং দুই বছরের রাজনৈতিক সংকটের অবসান হলো। প্রশ্ন হলো তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলন কি গণতান্ত্রিক? এই প্রশ্নের উত্তরে প্রাথমিক সাক্ষাৎকার প্রার্থীদের বিভিন্ন শ্রেণীর উত্তরদাতাদের মধ্যে ৭৬% বলেছেন তত্ত্বাবধায়ক সরকার আন্দোলন গণতান্ত্রিক ছিলো এবং ২৪% নেতিবাচক তথ্য দিয়াছেন (দেখুন সারণী- ৬.৭)।

সারণী-৬.৭

বিরোধী দলগুলোর তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলন কি গণতান্ত্রিক? এর ওপর মতামত

উত্তরের ধরন	গণসংখ্যা				
	সংসদ-সদস্য	শিক্ষক	ছাত্র	মোট	শতকরা
হ্যাঁ	১৮	১৬	২৩	৫৭	৭৬
না	৭	৯	২	১৮	২৪

পঞ্চম পার্লামেন্ট ও বিরোধী দল

পৃথিবীর সবগুলো গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রেই একাধিক রাজনৈতিক দল থাকে এবং ঐ ধরনের রাষ্ট্রে বিরোধী দল সরকারী যন্ত্রেরই একটি অংশ বিশেষ হিসাবে পরিচিত ও স্বীকৃত। বৃটেন বা কানাডায় বিরোধী দলের নেতা-নেত্রী বা উপনেতা সরকারীভাবে স্বীকৃত এবং বেতন- ভাতা ও সরকার প্রদত্ত অন্যান্য সুবিধা ভোগকারী কর্মকর্তা। ডুভারজার (Duverger) উল্লেখ করেছেন যে, "গ্রেটবৃটেনে সংখ্যা লঘিষ্ঠ দলের নেতাকে রাষ্ট্র কর্তৃক বেতন প্রদানের পাশাপাশি 'মহামান্য' রানীর বিরোধী দলীয়

Dhaka University Institutional Repository

নেতাকে সরকারী উপাধী প্রদান করে। প্রকৃতপক্ষে বিরোধী দলকে সরকারের অংশ হিসাবে মর্যাদা দেয়া হয়েছে।[৬২] সুতরাং একথা প্রমাণ করার অপেক্ষা রাখে না যে বিরোধী দল সংসদীয় সরকার ব্যবস্থার একটি অপরিহার্য অঙ্গ।

স্যার আইভর জেনিংস (Sir Ivor Jennings) বিরোধী দলের গুরুত্ব তুলে ধরে বলেন, "তাৎক্ষণিক ভাবে বিরোধী দল সরকারের বিকল্প এবং গণঅসন্তোষের কেন্দ্রবিন্দু হিসাবে কাজ করে থাকে। এর কার্যক্রম অনেকাংশে সরকারের ন্যায়ই গুরুত্বপূর্ণ। বিরোধী দল না থাকলে গণতন্ত্র থাকে না। 'মহামান্য' রানীর কাছে বিরোধী দলের প্রয়োজনীয়তা সরকারী দলের মতই।[৬৩] বস্তুতঃ পক্ষে "বিরোধী দল এবং সরকার ঐকমত্যের ভিত্তিতে পরিচালিত হয়। সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের সমালোচনা করার অধিকার স্বীকার করে নিতে হবে। পারস্পরিক সহনশীলতা না থাকলে সংসদীয় সরকার প্রক্রিয়া ভেঙ্গে যায়।[৬৪] বিরোধী দলের ইতিবাচক ভূমিকা সম্পর্কে হেরল্ড লাস্কী (Harold Laski) বলেছেন, 'The opposition spends its time in revealing the defects of the government programme.' [৬৫] বিরোধী দলের সমালোচনার তীব্রতা ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত দলকে সংযত ও সতর্কভাবে চলতে বাধ্য করে এবং ক্ষমতার অপব্যবহার ও স্বৈরাচারী মনোভাবকে প্রতিহত করে।

স্বাভাবিক কারণেই সংসদীয় ব্যবস্থায় বিতর্ক ও আলোচনার অধিকার স্বীকৃত বলে বিরোধী দল প্রায়ই সুযোগ খুঁজবে সরকারের ব্যর্থতা, দুর্বলতা ও ত্রুটি-বিচ্যুতিকে তুলে ধরার জন্য। তারা সরকারী দলের পাবলিক পলিসি ও রাজনৈতিক অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের ভুলত্রুটি তুলে ধরবে এবং যুক্তির মাধ্যমে জনগণকে এমন ধারনা দেবে যে, ক্ষমতায় গেলে তারা ক্ষমতাশীল দলের চেয়ে অধিকতর সুষ্ঠুভাবে দেশকে পরিচালিত করতে পারবে।[৬৬]

এছাড়া সংসদীয় ব্যবস্থায় বিরোধী দলই যে শুধু বিরোধিতার ভূমিকা নেবে তা নয়। সরকারী দলের অসন্তুষ্ট অংশ ও বিশেষ ক্ষেত্রে দলের অভ্যন্তরে গঠনমূলক ও কার্যকর সমালোচনা ও বিরোধিতা করবে। অনুরূপ বক্তব্য দিয়েছেন আর,এইচ,এস, ক্রসম্যান (R.H.S. Crossman), সেমুয়েল বিয়ার (Samual Beer), জেমস লিন্স্কী (James Lynsky) প্রমুখ লেখক। বিরোধী দলকে সুপরিকল্পিত নীতিমালা ও কর্মসূচী প্রণয়ন ও রাজনৈতিক কৌশলের আশ্রয় নিতে হয়। কেননা, বিরোধী দলের ভূমিকা শক্তিশালী হয়, কার্যকর হয়, যদি তাদের কর্মসূচীতে সুনির্দিষ্ট ও সুচিন্তিত বক্তব্য থাকে।[৬৭]

সংসদীয় সরকার ব্যবস্থায় গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত সরকারকে পরিবর্তন করার প্রধান পন্থাগুলো হচ্ছে (১) শাসনতান্ত্রিক উপায়ে অনাস্থাপ্রস্তাব পাশ করে, (২) জনগণের আস্থা অর্জনের মাধ্যমে এবং (৩) নির্বাচন বা ব্যালটের মাধ্যম। সুতরাং বিরোধী দলকে জাতীয় স্বার্থকে সবার ওপরে স্থান দিয়ে নিজেদের পক্ষে জনমত গঠন করতে হবে। আর বেগম খালেদা জিয়াকে মনে রাখতে হবে যে, "তিনি শুধুমাত্র বি.এন.পির প্রধানমন্ত্রী নন, তিনি সারা দেশেরই প্রধানমন্ত্রী। আর বিরোধী দলগুলোকে মনে রাখতে হবে যে বিরোধিতার জন্য বিরোধিতা করাই বিরোধী দলের কাজ নয়। কখনও সরকারের সাথে সহযোগিতা করাও অপরিহার্য হয়ে পড়ে।[৬৮] পঞ্চম সংসদে বিরোধী দলগুলো কেবলমাত্র বিরোধিতার জন্য বিরোধিতা করে, এর ওপর প্রাথমিক সাক্ষাৎকারের জরিপে বিভিন্ন শ্রেণীর উত্তরদাতাদের দেয়া তথ্য বিশ্লেষণ করে যে তথ্য বের হয়ে আসছে তা হচ্ছে, ১৩.৩৩% বলেছেন সম্পূর্ণ, ২৯.৩৩% অধিকাংশ, ৩৮.৬৬% আংশিক, ১২% মোটামুটি, ৫.৩৩% মোটেই না এবং ১.৩৩% কোনো উত্তর দেয়নি (দেখুন সারণী ৬.৮)।

সারণী-৬.৮

বিরোধী দলগুলো কেবল মাত্র বিরোধিতার জন্য বিরোধিতা করে-এর ওপর মতামত

উত্তরের ধরন	গণসংখ্য				
	সদস্য-সংখ্যা	শিক্ষক	ছাত্র	মোট	শতকরা
সম্পূর্ণ	১	৮	১	১০	১৩.৩৩
অধিকাংশ	৮	৫	৯	২২	২৯.৩৩
আংশিক	১০	৮	১১	২৯	৩৮.৬৬
মোটামুটি	২	৩	৪	৯	১২
মোটেই না	৪	-	-	৪	৫.৩৩
জানি না	-	১	-	-	১.৩৩

সংসদীয় সরকারে সাধারণতঃ রাষ্ট্র প্রধান জাতীয় সংসদ-সদস্যদের ভোটে নির্বাচিত হন। এক্ষেত্রে ভোটাভুটির নজির খুবই বিরল। ভারত, অষ্ট্রেলিয়া ও কানাডায় সংসদের সংখ্যাগরিষ্ঠ দল থেকে রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন। সেখানে কোনো বিরোধী দল কর্তৃক উক্ত পদের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয় না। গত ৮ অক্টোবর ১৯৯১ বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের সময় দেখা গেছে প্রধান বিরোধী দল আওয়ামীলীগের ভূমিকা ছিলো বি.এন.পিকে বিনা চ্যালেঞ্জে কোনো কিছু করতে দেবে না।[৬৯] এভাবে শুরুতেই বিরোধী দলের একটি অনমনীয় মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। যা গণতান্ত্রিক চরিত্রের রীতি বিরোধী।

Dhaka University Institutional Repository

সন্ত্রাস গণতন্ত্র ও দেশের নিরাপত্তার জন্য হুমকীস্বরূপ। সরকার ও বিরোধী দলগুলোকে ঘৃণিত সন্ত্রাস সৃষ্টিকারী মাস্তানদেরকে প্রত্যাখান করতে হবে। সেজন্য প্রয়োজন রাজনৈতিক দলমত ও নির্বিশেষে সকলকে সন্ত্রাসীর বিরূদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ। পার্টির ছত্রছায়ায় সন্ত্রাসীদের আশ্রয় দিয়ে গণতন্ত্র চর্চা করা যাবে না এবং রাজনৈতিক উন্নয়নও সম্ভব হবে না। বর্তমানে দেখা যাচ্ছে প্রধান দলগুলো তাদের দায়িত্ব এড়িয়ে যাচ্ছেন। শিক্ষা ক্ষেত্রে বিরাজিত সন্ত্রাস এর বিরুদ্ধে বেগম খালেদা জিয়া ও শেখ হাসিনার যুক্ত বিবৃতি প্রদান এখনও সম্ভবপর হয়নি। পাঁচ দল নেতা রাশেদ খান মেননের মতে 'সন্ত্রাস' দূর করতে হলে আগে নিজের ঘর পরিস্কার করতে হবে।[৭০] এখানে আরও উল্লেখ্য যে, সন্ত্রাসের বিরূদ্ধে ৭ দফা চুক্তি করার পরপরই বিরোধী দল আওয়ামীলীগ ও ক্ষমতাশীল বি.এন.পি চুক্তি ভঙ্গ করেছে। ন্যাপ নেতা পংকজ ভট্টাচার্যও অভিযোগ করে বলেছেন, "খালেদা জিয়া ও শেখ হাসিনা একদিকে সন্ত্রাসকারীদের প্রশ্রয় দিচ্ছে, অপর দিকে সন্ত্রাস বিরোধী কথা বলছে।" সরকার এবং বিরোধী দলের উত্তপ্ত বাক্য বিনিময়, অভিযোগ, পাল্টা অভিযোগ এবং পরস্পরের ওপর দোষারোপ করে সমস্যার সমাধান করা যাবে না। বি.এন.পির অভিযোগ গণতন্ত্রকে ব্যাহত করার জন্য সুপরিকল্পিতভাবে সারা দেশে সন্ত্রাস চালানো হচ্ছে। অপরদিকে, আওয়ামীলীগের বক্তব্য হচ্ছে সরকারের আন্তরিকতা নেই, তাই সন্ত্রাস দমন করতে পারছেনা, কিন্তু ব্যাপক সন্ত্রাস বা অরাজকতা সৃষ্টি করলে পুনঃপ্রবর্তিত সংসদীয় গণতন্ত্র ব্যর্থ হয়ে যাবে।[৭১] বাস্তবেও তাই হলো স্বৈরাচারী এরশাদ সরকারের পতন ও পতনের কারণের সাথে খালেদা জিয়া সরকারের পতনের তফাৎ ছিলো না।

"রাজপথ" কোনো বিশেষ রাজনৈতিক দলের সম্পত্তি নয়। আর সংসদীয় গণতন্ত্রকে "রাজপথে" নিয়ে গেলে সেটা ব্যর্থ হয়ে যাবে, "রাজপথ আমরা কাউকে ইজারা দেইনি" বা "বি.এন.পিকে আমরা গণতন্ত্র শিক্ষা দিয়ে ছাড়বো" এ ধরনের বক্তব্য উস্কানীমূলক, গঠনমূলক নয়। বাংলাদেশে বর্তমানে প্রধান রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে পারস্পরিক শত্রুতা, অবিশ্বাস, অসহযোগিতা এবং অসহনশীলতা তাঁদেরকে একযোগে কাজ করার পথে বিরাট অন্তরায় সৃষ্টি করেছে। সংসদে বিরোধী দলের পেশকৃত বিল পাশ না হলে রাজপথে নামতে হবে সরকার পতন ঘটাবার জন্য, এই ধরনের প্রজেক্ট সংসদীয় গণতন্ত্রে স্বীকৃত নয়। বৃটেন, ভারত, অষ্ট্রেলিয়া বা কানাডার দিকে তাকালেই সেটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। তদুপরি, দুরভিসন্ধিমূলক তৎপরতা,কুৎসা রটানো, সংসদে বিতর্ক চলাকালীন সময়ে ফাইল ছুঁড়ে দেয়া, জুতো প্রদর্শন করা, উস্কানীমূলক কটুক্তি করা ইত্যাদি পার্লামেন্টারি প্রাকটিসের পরিপন্থী।[৭২] আওয়ামীলীগের শীর্ষ পর্যায়ের একজন নেতা বলেছেন, "শেখ হাসিনা চাইলে এই সরকারের পক্ষে ১৫ দিনও ক্ষমতায় টিকে থাকা সম্ভব নয়।[৭৩]সংসদীয় গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে সেটা কি করে সম্ভব তা আমাদের জানা নেই। কারণ, সংসদীয় গণতন্ত্রে জোর করে যেমন দীর্ঘ দিন

Dhaka University Institutional Repository

ক্ষমতায় থাকা যায়না, তেমনি জোর করে বলপূর্বক ক্ষমতা দখলেরও কোনো সুযোগ নেই। পাশাপাশি অন্য একজন আওয়ামীলীগ নেতার বক্তব্য হচ্ছে, আমি কখনও মনে করিনা যে বি, এন, পি'র সব কিছুই ভুল। আবার একথাও সত্য নয় যে, সকল বিরোধী দল সবসময়েই নির্ভুল। এমন বস্তুনিষ্ঠ বক্তব্য গণতন্ত্রের জন্য সহায়ক।

পঞ্চম পার্লামেন্টে প্রধান বিরোধী দলের দায়িত্ব ও কর্তব্যের সংক্ষিপ্ত আলোচনা হতে ইহা স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, সংসদীয় গণতন্ত্রে প্রধান বিরোধী দলকে বিকল্প সরকার মনে করা হয়। কিন্তু মানুষের কছে বিকল্প সরকারের ছবি তৈরী করার জন্য একটি ছায়া সরকার গঠন করা প্রয়োজন। পঞ্চম সংসদে আমাদের প্রধান বিরোধী দল ছায়া সরকার গড়ে তোলবার কোনো প্রচেষ্টাই করেনি। ফলে সংগঠিত ভাবে বিরোধী দল সরকারের মোকাবেলা করতে পারেনি। এই দায় দেশের প্রধান বিরোধী দলকে স্বীকার করতে হবে। ছায়া সরকার বাস্তব সরকারের একটা কল্প স্বরূপ। অর্থাৎ সরকারের বদল হলে ছায়া সরকার সেখানে অধিষ্ঠিত হবে। এ সরকারের মাধ্যমে বিরোধী দলের নীতি সম্বন্ধে ধারনা জন্মে। তবে ছায়া সরকার গঠন করা মানে এই নয় যে বিরোধী দল নির্বাচনে জিতলে মন্ত্রী হবেন। ছায়া মন্ত্রীসভার লক্ষ্য হলো সংগঠিতভাবে সরকারের বিরোধিতা করা ও বিরোধী দলের নীতি ও সম্ভাব্য দক্ষতাকে মানুষের সামনে তুলে ধরা।

সংসদীয় সরকার হচ্ছে দলীয় সরকার। দলের মধ্যেই যদি গণতান্ত্রিক চর্চা না থাকে তবে দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারেনা। বাংলাদেশে রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে গণতন্ত্রের চর্চা বিরল। বি, এন, পি'র গণতন্ত্রে দলের চেয়ারম্যানের হাতে সর্বময় ক্ষমতা দেয়া হয়েছে। তিনি দলের ব্যাপারে একক ভাবে সিদ্ধান্ত নিতে পারেন ও নেন। জাতীয় পার্টিতেও একই অবস্থা। আওয়ামীলীগের গঠনতন্ত্রে গণতন্ত্রের বিধান আছে। কিন্তু বাস্তবে ভিন্ন অবস্থা। "দলের নেত্রী যা বলেন তাই হয়ে থাকে ভিন্ন মত তেমন কোনো মূল্য পায় না।[৭৪]

পঞ্চম পার্লামেন্টের সংক্ষিপ্তে আলোচনা হতে প্রতীয়মান হয় যে, বি.এন.পি সরকার ক্ষমতায় আসার পূর্বে জনগণকে দেয়া নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী সংসদীয় পদ্ধতিতে তাদের কার্যধারা বাস্তবায়ন করতে পারেনি। সরকারের অঙ্গীকার অনুযায়ী দুর্নীতি মুক্ত সরকার প্রতিষ্ঠা, সকল কালাকানুন বাতিল, আইনের শাসন ও বহুদলীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়নি। জনগন পায়নি বিচার বিভাগের স্বাধীনতা, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, রেডিও টেলিভিশনের স্বায়ত্তশাসন,প্রশাসন আইন ও সংবিধান অনুযায়ী কাজ করতে পারেনি। কৃষকরা ন্যায্যমূল্যে সার ও বীজ পায়নি, সঠিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়নি বাজার অর্থনীতির ধারা, প্রতিশ্রুতি দিয়েও তাঁত ঋণ, বিত্তহীনদের ঋণ ও সমবায়ী ঋণ

মওজুদ করেনি। গণতান্ত্রিক ধারার প্রথম পদক্ষেপ নির্বাচনের ক্ষেত্রে দেখা দেয় নিরপেক্ষতার অভাব। অপরদিকে বিরোধী দলগুলোও বিরোধিতার জন্যই সংসদীয় রীতি-নীতির বাইরে বিভিন্ন উস্কানিমূলক কথাবার্তা বলে, ক্রমাগত সংসদ বর্জন, ঘনঘন হরতাল ডেকে ব্যাপক সহিংসতা ও ভাংচুর, রেলপথ, রাজপথ অবরোধ করে একদিকে যেমন দেশের রাজনীতি ও অর্থনীতির ধ্বংস সাধন করে অপরদিকে জনগণের জীবনকে করে তুলেছিলো বিপর্যস্ত। যার প্রেক্ষাপটেই বহু প্রতীক্ষিত পঞ্চম পার্লামেন্টের কার্যবাহে সংসদীয় গণতান্ত্রিক ধারা ব্যর্থ হয়। পঞ্চম পার্লামেন্টের কার্যবাহ সংসদীয় পদ্ধতিতে সম্পন্ন সম্পর্কে প্রাথমিক সাক্ষাৎকারের জরিপে বিভিন্ন শ্রেণীর উত্তরদাতাদের নেয়া তথ্য বিশ্লেষণ করে যে পরিসংখ্যান পাওয়া যায়, তা হচ্ছে, হ্যাঁ বলেছেন ১২%, না ৫.৩৩%, অধিকাংশ ১৩.৩৩%, আংশিক ৫৭.৩৩% এবং মোটামুটি ১২% বলেছেন (দেখুন সারণী-৬.৯)।

সারণী-৬.৯

পঞ্চম পার্লামেন্টের কার্যবাহ সংসদীয় পদ্ধতিতে সম্পন্ন সংক্রান্ত মতামত

উত্তরের ধরন	সংসদ-সদস্য	শিক্ষক	ছাত্র	মোট	শতকরা
হ্যাঁ	৫	২	২	৯	১২
না	৩	১	০	৪	৫.৩৩
অধিকাংশ	৩	৪	৩	১০	১৩.৩৩
আংশিক	১১	১৫	১৭	৪৩	৫৭.৩৩
মোটামুটি	৩	৩	৩	৯	১২

বহু প্রতীক্ষিত পঞ্চম পার্লামেন্ট যে উদ্দেশ্য নিয়ে যাত্রা করেছিলো সে উদ্দেশ্য পূরণ করতে সম্পূর্ণ ব্যর্থ না হলেও গবেষকের দৃষ্টিকোণ থেকে আংশিক সফলতা লাভ করেছে। প্রাথমিক সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ করে যে পরিসংখ্যান পাওয়া গেছে তাতেও সংখ্যাগরিষ্ঠের মতামত অনুরূপ ছিলো। তবে উদ্দেশ্য পূরণের জন্য প্রথম প্রয়োজন ছিলো সরকারের দায়িত্বশীলতা বা দায়বদ্ধতা। কেননা ইহা হচ্ছে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রাণতুল্য। সংসদীয় সরকার তত্ত্বগতভাবে দায়িত্বশীল সরকার হিসেবে পরিগণিত হলেও বাস্তবে এ ব্যবস্থায় দায়িত্বশীলতার সমস্যা দেখা যায়। তবে বাংলাদেশে যেহেতু রাষ্ট্রপতি পদ্ধতির সরকার বার বার নানাবিধ কারণে একনায়কতন্ত্রে অথবা স্বৈরতন্ত্রে পর্যবসিত হয়েছে, তাই সংসদীয় পদ্ধতির সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও বাংলাদেশে মানুষের দুর্বলতা সংসদীয় পদ্ধতির প্রতিই বার বার প্রদর্শিত হয়েছে। ভবিষ্যতে জাতীয় ঐকমত্যের ফসল হিসেবে সংসদীয় ব্যবস্থা থেকে কাংখিত ফল লাভ করতে হলে এ ব্যবস্থায় সরকারের জবাবদিহি বা

Dhaka University Institutional Repository

দায়িত্বশীলতা সুনিশ্চিত করতে হবে। এ দায়িত্ব অবশ্য সরকার ও বিরোধী দল উভয়েরই। বাংলাদেশে সংসদীয় গণতন্ত্র ব্যর্থতার প্রধান কারণ হিসাবে প্রাথমিক সাক্ষাৎকারে বিভিন্ন শ্রেণীর উওরদাতাদের ১০০%-ই রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে সহযোগিতার অভাবকে দায়ী করেছেন। গবেষকও উত্তরদাতাদের সাথে একমত। সংসদীয় রীতি-নীতি ও তার ঐতিহ্যের প্রতি রাজনৈতিক নেতৃত্বের আস্থা ও অঙ্গীকার থাকা যেমন প্রয়োজন, তেমনি প্রয়োজন সুস্থ রাজনৈতিক প্রতিযোগিতার বিকাশ এবং বিরোধী দলের সদাসর্তক ও দায়িত্ববান "বিরোধী ভূমিকা "। সংসদীয় কমিটিসমূহকে কার্যকর করতে পারলে সরকারের ওপর সংসদের নিয়ন্ত্রণ ও খবরদারী অনেকটা নিশ্চিত হতে পারে। প্রচার মাধ্যমসমুহও এক্ষেত্রে পালন করতে পারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। সবশেষে তথা চূড়ান্ত পর্যায়ে বলা যায় যে, জনগণের সচেতনতা এবং গণতান্ত্রিক সংস্কৃতির লালন, পোষণ ও পরিপুষ্ট সাধনের মাধ্যমেই দায়িত্বশীল সরকার প্রতিষ্ঠার অনুকূল পরিবেশ গড়ে উঠতে পারে।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্যনির্দেশ ও টীকা

১. মাহবুবুর রহমান, "সংসদীয় গণতন্ত্র ও সরকারের দায়িত্বশীলতা", অধ্যাপক এমাজউদ্দীন আহমদ (সম্পাদিত), বাংলাদেশে সংসদীয় গণতন্ত্র প্রাসঙ্গিক চিন্তা-ভাবনা, ঢাকা করিম বুক কর্পোরেশন, মে, ১৯৯২, পৃষ্ঠাঃ ৬৭।

২. ঐ, পৃষ্ঠাঃ ৬৭-৬৮।

৩. ঐ, পৃষ্ঠাঃ ৬৮।

৪. অধ্যাপক কানাইলাল চট্টোপাধ্যায়, রাষ্ট্র বিজ্ঞানের রূপ-রেখা, কলকাতা ঃ পাইওনিয়ার প্রিন্টিং ওয়ার্কাস, অক্টোবর, ১৯৮০ পৃষ্ঠাঃ ৩৫০।

৫. অধ্যাপক এমাজউদ্দীন আহমদ (সম্পাদিত), বাংলাদেশে সংসদীয় গণতন্ত্র প্রাসঙ্গিক চিন্তা-ভাবনা, ঢাকা ঃ করিম বুক কর্পোরেশন, মে ১৯৯২ পৃষ্ঠাঃ ৮৭।

৬. অধ্যাপক সত্য সাধন চক্রবর্তী, অধ্যাপক নিমাই প্রামাণিক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান কলকাতাঃ শ্রী ভূমি পাবলিশিং কোম্পানী, জুলাই, ১৯৭৯, পৃষ্ঠাঃ ৪৫৮-৪৬০।

৭. ডঃ আবুল ফজল হক, ডঃ মোহাম্মদ শামসুর রহমান ও মোহাম্মদ মকসুদুর রহমান, রাষ্ট বিজ্ঞান তত্ত্ব ও নীতিমালা, রাজশাহী, বুক্স প্যাভিলিয়ন, জুন, ১৯৯০ পৃষ্ঠাঃ ১১৬।

৮. অধ্যাপক কানাইলাল চট্রোপাধ্যয়, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠাঃ ৩৫০।

৯. সংবাদ, মে, ১৯৯১।

১০. খবরের কাগজ, ২৩ মে, ১৯৯১, পৃষ্ঠাঃ ১৫-১৬।

১১. ঐ, পৃঃ ১৪।

১২. সংবাদ, ২ এপ্রিল, ১৯৯১।

১৩. ঐ, ১৬ এপ্রিল, ১৯৯১।

১৪. খবরের কাগজ, ২৩ মে, ১৯৯১, পৃষ্ঠা ঃ ৯।

১৫. সংবাদ, ৬ জুন, ১৯৯১।

১৬. সাপ্তাহিক ম্যাগাজিন, চিত্র বাংলা, ৫-১১ এপ্রিল,১৯৯৬।

১৭. ঐ।

১৮. সংবাদ, ৩ ডিসেম্বর, ১৯৯৩।

১৯. আজকের কাগজ, ১৫ জানুয়ারি ১৯৯৪।

২০. ঐ, ২ এপ্রিল, ১৯৯৪।

Dhaka University Institutional Repository

২১. সংবাদ,২৬ এপ্রিল,১৯৯৪।

২২. দৈনিক লালসবুজ, ১৭ জুলাই, ১৯৯৪।

২৩. দৈনিক জনতা, ২৪ জুলাই, ১৯৯৪।

২৪. সংবাদ, ২১ মার্চ, ১৯৯৫।

২৫. দৈনিক আল আমীন, ২৩ জুলাই ১৯৯৫।

২৬. সাপ্তাহিক ম্যাগাজিন, চিত্রবাংলা, ৫-১১ এপ্রিল, ১৯৯৬।

২৭. ঐ।

২৮. আজকের কাগজ, ২০ এপ্রিল, ১৯৯৬।

২৯. সংবাদ, ২৪ মার্চ, ১৯৯৫।

৩০. ঐ, ১২ জুন, ১৯৯৫।

৩১. সংবাদ, ২০ এপ্রিল, ১৯৯৬।

৩২. সাপ্তাহিক মানচিত্র, ১২ এপ্রিল, ১৯৯৬।

৩৩. ঐ।

৩৪. ভোরের কাগজ, ৪ নভেম্বর, ১৯৯৫।

৩৫. সাপ্তাহিক ম্যাগাজিন, চিত্রবাংলা, ৫-১১ এপ্রিল, ১৯৯৬।

৩৬. রিপোর্ট অব দি পাবলিক একাউন্টস কমিটি, জুলাই,১৯৯৩, পৃঃ ৭-৯।

৩৭. যায় যায় দিন, ২২ ফেব্রুয়ারী, ১৯৯৪।

৩৮. ঐ।

৩৯. দৈনিক ইত্তেফাক, ২৫ মে, ১৯৯৪।

৪০. সাপ্তাহিক ম্যাগাজিন, চিত্রবাংলা, ৫-১১ এপ্রিল, ১৯৯৬।

৪১. ঐ, ১২-১৮ এপ্রিল, ১৯৯৬।

৪২. সৈয়দ আলী কবির, সংসদীয় গণতন্ত্রের চর্চা ও অন্যান্য প্রসঙ্গ, ঢাকা, রিলায়্যাবল কম্পিউটারস, ১৬ ডিসেম্বর, ১৯৯৫, পৃষ্ঠাঃ ১৮।

৪৩. ঐ,পৃষ্ঠাঃ ১৮।

৪৪. বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ, বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের কার্যবাহের সারাংশ, ১৯৯১-১৯৯৫ (২২ খন্ড)।

৪৫. রোববার,৩ ডিসেম্বর, ১৯৯৫।

৪৬. বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ,বুলেটিন, ১৯৯১-১৯৯৫,২২ খন্ড।

৪৭. সাপ্তাহিক ম্যাগাজিন, চিত্রবাংলা, ৫-১১ এপ্রিল, ১৯৯৬।

৪৮. ঐ, ১২-১৮ এপ্রিল, ১৯৯৬।

৪৯. ঐ, ৫-১১ এপ্রিল,১৯৯৬।

৫০. আশরাফ কায়সার,বাংলাদেশে রাজনৈতিক হত্যাকান্ড, ঢাকাঃ মাওলা ব্রাদার্স, ১৯৯৫,পৃষ্ঠাঃ১।

৫১. দৈনিক জনকণ্ঠ,২০ অক্টোবর, ১৯৯৫।

৫২. ঐ

৫৩. মোঃ আব্দুল হালিম, সংবিধান, সাংবিধানিক আইন ও রাজনীতি ঃ বাংলাদেশ প্রসঙ্গ, ঢাকা ঃ রিকো প্রিন্টার্স, জুন, ১৯৯৭, পৃষ্ঠা ঃ ৩৬১-৩৬২।

৫৪. বাংলাবাজার পত্রিকা, ২মার্চ ,১৯৯৪।

৫৫. আব্দুল হালিম, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠাঃ ৩৬২।

৫৬. ঐ।

৫৭. দৈনিক জনকণ্ঠ, ২০ অক্টোবর,১৯৯৫।

৫৮. আব্দুল হালিম, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৬৩।

৫৯. ঐ।

৬০. ৫ বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবীরা হচ্ছেন- সাবেক প্রধান বিচারপ্রতি কামাল উদ্দিন হোসেন, সাবেক কূটনীতিক ফসরুদ্দিন আহম্মেদ, আইনজীবী ব্যরিষ্টার ইশতিয়াক আহমেদ, অর্থনীতিবিদ প্রফেসর রেহমান সোবহান এবং সাংবাদিক ফয়েজ আহমেদ।

৬১. আব্দুল হালিম, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠঃ ৩৬৪।

৬২. Maurice Duverger, Political parties, London, Msthven Co. Ltd. 1955, P.414.

৬৩. Sir Ivor Jennings, Cabinet Goverment, Cambridge, Cambridge university press,1961, P.16.

৬৪. ঐ, পৃষ্ঠাঃ ৫০০।

৬৫. Harold J. Laski, Democracy in crisis, London, George Allen and Unwin Ltd. 1933, P. 32.

৬৬. Alex N. Dragnich, Major European Goverment, Third Edition, Illinois: Dorsey Press, 1974,P.78.

৬৭. Maurice Duverger, Op. cit. P. 415.

৬৮. শামসুর রাহমান, " রাজনৈতিক দল যেন সন্ত্রাসীদের অভয়াশ্রম না হয়", বাংলার বাণী, ঢাকা, নভেম্বর ৩, ১৯৯১, পৃষ্ঠাঃ ৪।

৬৯. কামাল উদ্দিন আহমেদ, "সংসদীয় গণতন্ত্রে বিরোধী দলের ভূমিকা", অধ্যাপক এমাজউদ্দীন আহমদ (সম্পাদিত), বাংলাদেশে সংসদীয় গণতন্ত্র প্রাসঙ্গিক চিন্তা-ভাবনা, করিম বুক করপোরেশন, ঢাকা, মে, ১৯৯২, পৃষ্ঠা ঃ ৯২।

৭০. দৈনিক ইনকিলাব, ২৩ অক্টেবর, ১৯৯১।

৭১. কামাল উদ্দিন আহমেদ, "সংসদীয় গণতন্ত্রে বিরোধী দলের ভূমিকা", অধ্যাপক এমাজউদ্দীন আহমদ (সম্পাদিত), প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠাঃ ৯৩।

৭২. ঐ, ৯৫।

৭৩. আজকের কাগজ, ১৯ নভেম্বর, ১৯৯১।

৭৪. খবরের কাগজ, ১১ জুলাই, ১৯৯১, পৃষ্ঠাঃ ১৫।

Dhaka University Institutional Repository

সপ্তম অধ্যায়

উপসংহার

সুজলা সুফলা শস্য শ্যামলা এই বাংলাদেশ ছিলো বিভিন্ন ঔপনিবেশিকদের আকর্ষণীয় স্থান। ঐতিহ্যগতভাবে পূর্ব-বাংলা নামে পরিচিত এদেশকে একে একে শাসন-শোষণ করেছে ওলান্দাজ, পর্তুগীজ, ফরাসী ও ব্রিটিশরা। সবশেষে ২৪ বছর ছিলো পাকিস্তানী অভ্যন্তরীণ উপনিবেশবাদের অধীনে।

ব্রিটিশ শাসন আমলে ১৯১৯ সাল পর্যন্ত ভারতবর্ষে কোনো পৃথক আইনসভার অস্তিত্ব ছিলো না। ১৮৬১, ১৮৯২ এবং ১৯০৯ সালে বিভিন্ন সংস্কার আইনের দ্বারা গভর্ণর জেনারেলের শাসন পরিষদকে আইন পরিষদ হিসেবে কাজ করার ক্ষমতা দেয়া হয়। কিন্তু এই আইন পরিষদগুলো জনপ্রতিনিধিত্বমূলক ছিলো না এবং প্রকৃতপক্ষে সেগুলো গভর্ণর জেনারেলের উপদেষ্টা কমিটি হিসেবই কাজ করে।

১৯১৯ সালের ভারত শাসন আইনে সর্বপ্রথম কেন্দ্র ও প্রদেশে স্বতন্ত্রভাবে আইনসভা গঠনের বিধান করা হয়। এ আইনের দ্বারা গঠিত আইনসভাগুলোকে অপেক্ষাকৃত প্রতিনিধিত্বমূলক করা হলেও নির্বাচনের পাশাপাশি মনোনয়ন প্রথা বহাল ছিলো এবং আইন, শাসন ও অর্থ সংক্রান্ত ব্যাপারে তাঁদের প্রকৃত ক্ষমতা ছিলো না। এসব ক্ষেত্রে গভর্ণর-জেনারেল বা গভর্ণরই ছিলেন সর্বেসর্বা। প্রাদেশিক মন্ত্রীরা তাঁদের কাজের জন্য আইনসভার নিকট দায়ী থাকলেও গভর্ণররা দায়ী ছিলেন না। গভর্ণরগণ বিভিন্নভাবে মন্ত্রীদের কাজে হস্তক্ষেপ করতে পারতেন এবং অনেক সময় হস্তান্তরিত বিষয়ে মন্ত্রীদের পরামর্শ উপেক্ষা করে নিজ খেয়াল-খুশিমত শাসন পরিচালনা করতেন।

১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনেও নির্বাচনের পাশাপাশি সদস্যদের মনোনয়নের ব্যবস্থা বহাল থাকে এবং এর অধীনে গঠিত আইনসভার ক্ষমতাও ছিলো সীমিত। আইন, শাসন ও অর্থসংক্রান্ত ব্যাপারে গভর্ণর জেনারেলের স্বেচ্ছাধীন ও স্বীয় বিচার-বুদ্ধিজনিত ক্ষমতা ছিলো প্রচুর। গভর্ণর-জেনারেল মন্ত্রীদের সাথে পরামর্শ না করেই সংরক্ষিত বিষয়গুলো পরিচালনা করতেন। তিনি হস্তান্তরিত বিষয়সমূহের ক্ষেত্রে মন্ত্রীদের সাথে পরামর্শ করলেও তাঁর "বিশেষ দায়িত্ব" পালনের অজুহাতে মন্ত্রীদের পরামর্শ অগ্রাহ্য করে স্বীয় বিচারবুদ্ধি অনুযায়ী কাজ করতে পারতেন। এসব কোনো কাজের জন্যই গভর্ণর-জেনারেলকে আইনসভার কাছে জবাবদিহি করতে হতো না। এই আইনে কেন্দ্রে দ্বি-কক্ষ বিশিষ্ট আইনসভা ছিলো।

Dhaka University Institutional Repository

১৯৩৫ সালের আইনে ১৯১৯ সালে প্রদেশে প্রদত্ত দ্বৈত শাসন বিলোপ করলেও প্রকৃত দায়িত্বশীল সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়নি। গভর্ণরের হাতে ব্যাপক ক্ষমতা থেকে যায়।

মোটকথা, ১৮৬১-১৯৩৫ সাল পর্যন্ত ভারত শাসন আইনগুলো পর্যায়ক্রমে বিশ্লেষণ করে প্রতীয়মান হচ্ছে যে, কোনো আইনই ভারতীয় জনগণের দাবি-দাওয়ার প্রেক্ষাপটে বাস্তবায়নের অনুকূলে ছিলো না। ১৯১৯ ও ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনে যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার প্রবর্তন ও প্রণীত আইন পরিষদগুলোতে ভারতীয়দেরকে ব্যাপক প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা দিলেও আইন প্রণয়ন ও সরকারকে নিয়ন্ত্রণ করার কার্যকর ক্ষমতা আইনসভাগুলোকে দেয়া হয়নি। উহা ছিলো ক্ষমতাহীন রাবার ষ্ট্যাম্প। ফলে ব্রিটিশ আমলে ভারতবর্ষে দুটি প্রধান রাজনৈতিক দল জাতীয় কংগ্রেস ও মুসলিমলীগ কোনো দলই একটি আইনও মেনে নিতে পারেনি। প্রেক্ষাপটে, ১৯৪৭ সালের ভারত স্বাধীনতা আইন অনুযায়ী পাকিস্তান ও ভারত নামে দু'টো স্বাধীন রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয়। আমাদের পূর্ব-বাংলা ধর্মীয় চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে পাকিস্তান রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হয়।

১৯৪৭ সালের ভারত স্বাধীনতা আইন অনুযায়ী পাকিস্তানের সংবিধান প্রণয়ন ও অন্তবর্তীকালীন আইনসভা হিসাবে কাজ করার জন্য একটি গণপরিষদ গঠিত হয়। ব্রিটিশ ভারতে পরোক্ষভাবে নির্বাচিত সদস্যরা এই গণপরিষদের সদস্য ছিলেন। ফলে গণপরিষদে জনগণের প্রত্যক্ষ প্রতিনিধিত্ব ছিলো না।

ভারত স্বাধীনতা আইনের দ্বারা গভর্ণর-জেনারেলের স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা বিলোপ করা হলেও গভর্ণর-জেনারেলকে সর্বদা মন্ত্রীসভার পরামর্শ অনুযায়ী কাজ করবেন এমন কোনো সুনির্দিষ্ট বিধান ছিলো না। এরূপ অস্পষ্টতার সুযোগে গভর্ণর-জেনারেল মন্ত্রীসভার পরামর্শ উপেক্ষা করতেন। পাকিস্তানের জাতিরপিতা ও অপ্রতিদ্বন্দ্বী গভর্ণর-জেনারেল মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ্ এতই ক্ষমতাশালী ছিলেন যে ,মন্ত্রীসভা তাঁর সম্মতি ছাড়া কোনো কাজই করতে পারতেন না। কার্যতঃ মন্ত্রীসভা আইনসভার নিকট দায়ী না থেকে জিন্নাহ্র অধীনস্থ একটি সংস্থা ছিলো। তিনি সাংসদদের চেয়ে আমলাদের ওপর বেশী আস্থাবান ছিলেন। জিন্নাহ্র পর গভর্ণর-জেনারেল গোলাম মোহাম্মদের হাতে সংসদীয় ব্যবস্থার আরো অবনতি ঘটে। তিনি আইন পরিষদে সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের আস্থা থাকা সত্ত্বেও নাজিমুদ্দিন মন্ত্রীসভাকে বরখাস্ত করেন। অপরদিকে তিনি পরিষদে সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা নির্বাচিত না হওয়া সত্ত্বেও মোহাম্মদ আলীকে প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত করেন এবং নিজের ইচ্ছামত সদস্যদের নিয়ে মন্ত্রীসভা গঠন করেন। গোলাম মোহাম্মদ নিজেও একজন আমলা ছিলেন এবং তাঁর

Dhaka University Institutional Repository

সময় রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে সামরিক ও বেসামরিক আমলাদের কর্তৃত্ব বৃদ্ধি পায়। ফলে পাকিস্তানের গুরুত্বপূর্ণ কোনো জাতীয় বা আন্তর্জাতিক পর্যায়ে কোনো সমস্যা সম্পর্কে সিদ্ধান্ত আইন পরিষদে না হয়ে গভর্ণর-জেনারেল ও কতিপয় আমলাদের সিদ্ধান্ত মোতাবেক হতো।

সংসদীয় ব্যবস্থায় সাফল্য অনেকাংশে নির্ভর করে বিরোধী দলের যথাযথ ভূমিকার ওপর। কিন্তু পাকিস্তানের প্রথম গণপরিষদে মাত্র বারো জন সদস্য বিরোধী দলের আসনে ছিলেন। উল্লেখ্য তাঁরা সবাই হিন্দু থাকায় প্রকৃত বিরোধী দলের ভূমিকা পালন করতে পারেনি। কারণ তাঁরা পাকিস্তান সৃষ্টির বিরোধিতা করায় তাদেঁরকে দেশপ্রেমিক বিরোধী দল হিসেবে বিবেচনা করা হতো না। ফলে তাঁরা কখনো সংসদে যথাযথ ভূমিকা পালন করতে পারেনি।

দ্বিতীয় গণপরিষদে যুক্তফ্রন্ট মুসলিমলীগের সাথে কোয়ালিশন সরকার গঠন করে। ফলে আওয়ামীলীগ প্রধান বিরোধী দল হিসেবে ভূমিকা গ্রহণ করে। এ পরিষদে বিরোধী দলের সদস্য-সংখ্যা বৃদ্ধি পেলে ও দায়িত্বশীল সরকার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে তাঁরা কার্যকর ভূমিকা রাখতে সক্ষম হয়নি। আওয়ামীলীগ সংসদীয় গণতন্ত্রের প্রতি তাদেঁর আস্থা প্রকাশ করলেও দলটি সংসদীয় ব্যবস্থা কার্যকর করার ব্যাপারে ততটা সক্রিয় ছিলো না, যতটা পূর্ব-বাংলার আঞ্চলিক স্বায়ত্ত শাসনের ব্যাপারে সক্রিয় ছিলো।

দ্বিতীয় গণপরিষদে পাকিস্তানের প্রথম সংবিধান ২৯ ফেব্রুয়ারি ১৯৫৬ সালে গৃহীত হয় এবং ২৩ মার্চ হতে উহা কার্যকর হয়। এই সংবিধানের মাধ্যমে পাকিস্তানে পার্লামেন্টারি ও যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার প্রবর্তন করা হয়। এই সংবিধান অনুসারে ইস্কান্দার মীর্জা রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন। কিন্তু এই সংবিধান ও সংসদীয় সরকার বেশী দিন স্থায়ী হয়নি। কারণ সংবিধানে প্রেসিডেন্টকে ব্যাপক ক্ষমতা দেয়ায় তিনি তাঁর ইচ্ছামত সংসদীয় রীতি-নীতি উপেক্ষা করে স্বেচ্ছধীন ক্ষমতাবলে প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ ও বরখাস্ত করতেন; সামন্যতম ছল-ছুতোয়া কেন্দ্রীয় সরকার জরুরী অবস্থা ঘোষনা করে প্রাদেশিক ক্ষমতা নিজ হাতে তুলে নিতেন; রাজনৈতিক দলগুলোর কাজে হস্তক্ষেপ করতেন ইত্যাদি। এছাড়াও সুসংগঠিত ও সুশৃংখল রাজনৈতিক দলের অভাব, নির্বাচনের অভাব, কায়েমী স্বার্থবাদীমহল এবং তাঁর প্রতিভূ সামরিক ও বেসামরিক আমলাগণ প্রভৃতি কারণে ইস্কান্দার মীর্জা ১৯৫৮ সালের ৭ অক্টোবর সারাদেশে সামরিক আইন জারি করেন। বাতিল হয়ে যায় সংবিধান ও মন্ত্রীসভা। ২৭ অক্টোবর ইস্কান্দার মীর্জাকে বিতাড়িত করে রাষ্ট্রপতির পদটি দখল করেন প্রধান সেনাপতি আইয়ূব খান।

Dhaka University Institutional Repository

১৯৬২ সালের জুন মাসে আইয়ুব খান সামরিক আইন প্রত্যাহার করে তাঁর পছন্দমত এক সংবিধান প্রবর্তণ করেন। এই সংবিধানের অধীনে পাকিস্তানের জন্য এক অভিনব রাষ্ট্রপতি পদ্ধতির শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়। এ শাসন ব্যবস্থা ছিলো কার্যতঃ এক "সাংবিধানিক একনায়কত্ব" পদ্ধতি এখানে ৮০,০০০ মৌলিক গণতান্ত্রী " দ্বারা পরোক্ষভাবে নির্বাচিত পার্লামেন্ট ছিলো বস্তুতঃ প্রেসিডেন্টের অধীনস্থ একটি সংস্থা। প্রাদেশিক গভর্ণর প্রেসিডেন্টের এজেন্ট হিসেবে একচ্ছত্র ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন। প্রাদেশিক আইনসভা গভর্ণরের অধীনস্থ ছিলো। সুতরাং ইহা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, এধরনের সংবিধান প্রণয়ন উপহাস ছাড়া কিছুই নয়।

উপরোল্লিখিত আলোচনা হতে দেখা যাচ্ছে যে, পাকিস্তান শাসন আমলেও এদেশে দায়িত্বশীল সংসদীয় শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়নি। আইন সভাগুলো সত্যিকার জনপ্রতিনিধিত্বমূলক ছিলো না। আইন, শাসন ও অর্থসংক্রান্ত ব্যাপারে আইন পরিষদগুলোকে যথাযথ ক্ষমতা ও মর্যাদা দেয়া হয়নি। এ সময়ে রাষ্ট্রের প্রকৃত ক্ষমতা দেশের সামরিক ও বেসামরিক আমলাদের হাতে কেন্দ্রীভূত ছিলো।

১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ পাকিস্তান বাহিনীর সশস্ত্র আক্রমনের প্রেক্ষিতে শেখ মুজিবুর রহমানের ডাকে বাংলাদেশে স্বাধীনতা যুদ্ধ শুরু হয়। যুদ্ধ পরিচালনার লক্ষ্যে ১৯৭০ সালে নির্বাচিত জাতীয় পরিষদ ও প্রাদেশিক পরিষদের সদস্যগণ নিজেদের সমন্বয়ে ১৯৭০ সালের ১০ এপ্রিল একটি গণপরিষদ গঠন করেন এবং আনুষ্ঠানিকভাবে স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র জারি করেন। ঘোষণাপত্রে বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতিকে নির্বাহী, আইন প্রণয়ন, অর্থসংক্রান্ত ও সামরিক সকল ক্ষেত্রে সার্বিক ক্ষমতা প্রদান করা হয় এবং দেশে একটা সুষ্ঠু শাসন ব্যবস্থা তথা সংবিধান প্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের দায়িত্বও রাষ্ট্রপতিকে দেয়া হয়।

১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পর ১৯৭২ সালের ১১ জানুয়ারী রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের জন্য একটি অস্থায়ী সংবিধান জারি করেন। এই সংবিধানের অধীনে আইন প্রণয়নমূলক ক্ষমতাসহ অন্যান্য ক্ষমতা রাষ্ট্রপতির হাতেই থেকে যায়। কিন্তু তাতে বলা হয় যে, রাষ্ট্রপতি সকল ক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শক্রমে কাজ করবেন এবং প্রধানমন্ত্রীকে গণপরিষদের আস্থাভাজন ব্যক্তি হতে হবে। স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রে পরিকল্পিত রাষ্ট্রপতি পদ্ধতির পরিবর্তে সংসদীয় শাসন ব্যবস্থা সূচনা করে। বাংলাদেশ গণপরিষদে পূর্ণাঙ্গ সংবিধান গৃহীত হয় ৪ নভেম্বর ১৯৭২ এবং কার্যকরী হয় ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭২ থেকে।

Dhaka University Institutional Repository

সংবিধানে বাংলাদেশের জন্য সংসদীয় গণতন্ত্র প্রবর্তন করা হয়। এতে আইন প্রণয়ন, বাজেট অনুমোদন, শাসন বিভাগের ওপর নিয়ন্ত্রণ, সংবিধান সংশোধন প্রভৃতি ক্ষেত্রে আইনসভার প্রাধান্য স্বীকৃত হয়। কিন্তু ১৯৭৫ সালের ২৫ জানুয়ারী গৃহীত সংবিধানের চতুর্থ সংশোধনীর দ্বারা সংসদীয় পদ্ধতির পরিবর্তে একদলীয় রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকারের প্রবর্তন করা হয়। এর ফলে জাতীয় সংসদের আইন প্রণয়ন ও নিয়ন্ত্রণমূলক ক্ষমতা ব্যাপকভাবে হ্রাস পায় এবং রাষ্ট্রপতি ক্ষমতার উৎসে পরিণত হন।

বাংলাদেশ দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার একটি উন্নয়নশীল দেশ। এখানেও বেশ কয়েকবার সফল ও ব্যর্থ সামারিক অভ্যুত্থান ঘটেছে। প্রথমতঃ ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট ঢাকায় এক সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবুর রহমান ক্ষমতাচ্যুত ও সপরিবারে নিহত হন। দ্বিতীয়তঃ ১৯৭৫ সালের ৩ নভেম্বর বাংলাদেশে দ্বিতীয়বারের মত ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফের নেতৃত্বে সামরিক অভ্যুত্থান ঘটে। তৃতীয়তঃ একই বছরে ৭ নভেম্বর ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফের বিরুদ্ধে এক সিপাহী বিপ্লব সংঘটিত হয়। এতে খালেদ মোশাররফ তাঁর অনেক সমর্থকসহ নিহত হন। মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান কার্যতঃ বাংলাদেশের শাসন ক্ষমতা গ্রহণ করেন। জেনারেল জিয়া এক সামরিক ঘোষণার দ্বারা ৮ নভেম্বর এক দলীয় ব্যবস্থা বাতিল করে রাষ্ট্রপতি পদ্ধতি বহাল রাখেন।

জেনারেল জিয়া তাঁর সামরিক শাসনকে বৈধ করার উদ্দেশ্যে যথাক্রমে গণভোট ও রাষ্ট্রপতি নির্বাচন ছাড়াও ১৯৭৯ সালে পার্লামেন্টের নির্বাচন সম্পন্ন করেন। জিয়াউর রহমান সামরিক আদেশ বলে কয়েক দফায় সংবিধানের কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন সাধন করেন। ১৯৭৯ সালে নির্বাচিত পার্লামেন্টে পঞ্চম সংশোধনীর মাধ্যমে উক্ত পরিবর্তনসমূহ আনুষ্ঠানিকভাবে অনুমোদন করেন।

সংবিধানের চতুর্থ সংশোধনীর দ্বারা জাতীয় সংসদ কর্তৃক গৃহীত বিলে রাষ্ট্রপতিকে ভেটো প্রদানের ক্ষমতা দেয়া হয়। তিনি স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতাবলে মন্ত্রীদের নিয়োগ করতেন। মন্ত্রীগণ রাষ্ট্রপতির সন্তুষ্টি অনুযায়ী পদে বহাল থাকতেন; তাঁরা সংসদের নিকট দায়ী ছিলেন না। পঞ্চম সংশোধনীর দ্বারা রাষ্ট্রপতির ভেটো ক্ষমতা বিলোপ করা হয় এবং বিধান করা হয় যে, প্রধানমন্ত্রী হবেন, সংসদে সংখ্যাগরিষ্ঠের আস্থাভাজন একজন সদস্য এবং মন্ত্রীদের অন্যূন চার-পঞ্চমাংশ সংসদ-সদস্যদের মধ্য থেকে নিয়োগ করা হবে। মন্ত্রীগণ সংসদের কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করতে পারবেন, কিন্তু তাঁরা সংসদের নিকট দায়ী না থেকে রাষ্ট্রপতির নিকট দায়ী থাকবেন। এভাবে পঞ্চম সংশোধনীর দ্বারা পার্লামেন্টের আইন প্রণয়নমূলক ক্ষমতা বৃদ্ধি পেলেও বাংলাদেশে প্রকৃত দায়িত্বশীল সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়নি। ফলে ১৯৭৩ সালে নির্বাচিত প্রথম পার্লামেন্টের তুলনায় ১৯৭৯ সালে

Dhaka University Institutional Repository

নির্বাচিত প্রথম পার্লামেন্ট ছিলো কম ক্ষমতা ও মর্যাদাসম্পন্ন। কিন্তু দ্বিতীয় পার্লামেন্টও তার পূর্ণ মেয়াদ শেষে করতে পারেনি, ৩০ মে '৮১ এক সেনা অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে জেনারেল জিয়ার নির্মমভাবে নিহত হওয়ার পর এ পার্লামেন্টের অবসান ঘটে। উপরাষ্ট্রপতি আব্দুস সাত্তার অস্থায়ীভাবে রাষ্ট্রপতির দায়িত্বভার গ্রহণ করেন এবং ১৫ নভেম্বর' ৮১ সালে বিপুল ভোটে প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হলেন। সাত্তারের এ ক্ষমতা বেশী দিন স্থায়ী হলো না, মাত্র চার মাস যেতেই আর এক সেনা অভ্যুত্থানের মাধ্যমে নির্বাচিত সরকারকে অপসারিত করে ২৪ মার্চ ' ৮২ ক্ষমতায় আসেন জেনারেল এরশাদ। ভেঙ্গে যায় জাতীয় সংসদ এবং স্থগিত হয় সংবিধান। এরশাদ তাঁর সামরিক শাসনকে বৈধ করার লক্ষ্যে যথাক্রমে ইউনিয়ন পরিষদ, পৌরসভা, গণভোট, উপজেলা ও রাষ্ট্রপতি নির্বাচন ছাড়াও ৭ মে' ৮৬ ও ৩ মার্চ' ৮৮ যথাক্রমে তৃতীয় ও চতুর্থ পার্লামেন্টে নির্বাচন সম্পন্ন করেন। এরশাদ তাঁর ক্ষমতা বলে সপ্তম সংশোধনীর মাধ্যমে তাঁর সামরিক শাসনামলের সকল কার্যক্রমকে বৈধ করে নেন। তৃতীয় ও চতুর্থ পার্লামেন্টের ক্ষমতা দ্বিতীয় পার্লামেন্টের ন্যায় ছিলো। কিন্তু দীর্ঘ নয় বছর ব্যাপী এরশাদের ছিনতাই ঔদ্ধত্য কার্যকলাপ, যেমনঃ রাজনীতিকে ধ্বংসের চক্রান্ত, ছাত্র জনতার ওপর অমানুষিক নির্যাতন, সামরিক জান্তার অবাধ লুটপাট, বাকস্বাধীনতা রুদ্ধ, গণতান্ত্রিক ও মানবিক মুল্যবোধ ধ্বংসের অশুভ পাঁয়তারা দেখে চুপ করে বসে থাকতে পারে না এ দেশের গণতন্ত্র প্রিয় জনগণ। যার ফলে তিন জোটের রূপ রেখা অনুসারে এক দুর্বার গণঅভ্যুত্থানের মাধ্যমে ০৬ ডিসেম্বর, ১৯৯০ এরশাদ সরকারের পতন ঘটে। শুভ সূচনা হয় গণতন্ত্রের। একটি সুষ্ঠু নির্বাচনের লক্ষ্যে বিচার পতি সাহাবুদ্দীন আহমেদকে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি করে একটি উপদেষ্টা পরিষদের মাধ্যমে ২৭ ফেব্রুয়ারী, ১৯৯১ পঞ্চম পার্লামেন্ট নির্বাচন হয়। বেগম খালেদা জিয়ার নেতৃত্বে বি, এন, পি সরকার ক্ষমতায় আসে। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচনের মাধ্যমে ১৯৯১ সালে প্রতিষ্ঠিত পঞ্চম পার্লামেন্টে সংবিধানের দ্বাদশ সংশোধনীর মাধ্যমে বাংলাদেশে আবার সংসদীয় গণতন্ত্র প্রবর্তন করা হয়। এতে আইন প্রণয়ন, সংবিধান সংশোধন, বাজেট অনুমোদন, শাসন বিভাগের ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রভৃতি ক্ষেত্রে জাতীয় সংসদের প্রাধান্য স্বীকৃত হয়। ফলে ক্ষমতা ও মর্যাদার দিক থেকে প্রথম ও পঞ্চম পার্লামেন্টের মধ্যে পার্থক্য ছিলো না।

সংসদ-সদস্যদের জীবন বৃত্তান্ত বিশ্লেষণ থেকে দেখা যায় যে, প্রথম পার্লামেন্টে ৫৬ এর উর্ধ্বে বয়সের সদস্য ছিলেন ৫% সেখানে পঞ্চম পার্লামেন্টে ২১%। তাহলে এক কথায় বলা যায় প্রথম পার্লামেন্টের তুলনায় পঞ্চম পার্লামেন্টে বেশী অভিজ্ঞতা সম্পন্ন সদস্য ছিলেন। কারণ বয়স যত বেশী হবে অভিজ্ঞতার পরিধি তত বাড়তে থাকে। উভয় পার্লামেন্টে ৩৬ -৪৫ বছরের সদস্য বেশী ছিলেন। প্রথম ঃ পঞ্চম=১১২ঃ১১৩(সারণী -৪.৪)।

Dhaka University Institutional Repository

শিক্ষাগত যোগ্যতার দিক থেকে প্রথম ও পঞ্চম পার্লামেন্টের মধ্যে তেমন পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়নি। প্রথম পার্লামেন্টে যেখানে পোষ্ট গ্রাজুয়েট ৯০ জন এবং গ্রাজুয়েট ১২৭ জন সেখানে পঞ্চম পার্লামেন্টে পোষ্ট গ্রাজুয়েট ৯৬ জন এবং গ্রাজুয়েট ১৫১ জন। তাহলে দেখা যাচ্ছে উভয় পার্লামেন্টেই প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের বেশী উচ্চশিক্ষিত। (সারণী -৪.৫)

১৯৫৪, ১৯৭৩ এবং ১৯৯১ এ আইন সভায় নির্বাচিত সাংসদদের পেশাগত অবস্থানের তুলনা থেকে দেখা যায় যে, পার্লামেন্টে ক্রমশঃ মধ্যবিত্তের সংখ্যা দ্রুত কমতে থাকে এবং উচ্চ-বিত্তের সংখ্যা একইভাবে বাড়তে থাকে। ১৯৫৪ সালে আইন সভায় আইনজীবী, ব্যবসায়ী ও শিল্পপতি এবং কৃষিজীবী সদস্য সংখ্যা যেখানে ছিলো যথাক্রমে ১১৬ ,১১ ও ৫৬ জন। সেখানে ১৯৭৩ সালে ছিলো ৭৫,৬৭ ও ৫০ জন এবং ১৯৯১ সালে ছিলো ৫৬, ১৭৭ ও ১২ জন (সারণী-৪.৭)। বাংলাদেশ পার্লামেন্টে সাধারণতঃ ব্যবসায়ী এবং শিল্পপতি সদস্যরা উচ্চবৃত্তি সম্পন্ন হয়। বর্তমানে সংসদ নির্বাচনের সময় নির্বাচকদের নমিনেসন দেয়া হয় টাকার অংক বিচার করে। টাকার কাছে প্রায়ই যোগ্যতা হার মানায়। ফলে দিন দিন সংসদে মধ্যবিত্তের সংখ্যা কমে যাচ্ছে (সারণী ৪.৬)।

সাংসদদের সংসদীয় অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রে ব্যাপক পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। কারণ প্রথম সংসদে যেখানে ১২৭ জনের অভিজ্ঞতা শূন্য ছিলো সেখানে পঞ্চম সংসদে ২০৪ জনের অভিজ্ঞতা শূন্য (সারণী -৪. ৯)।

পঞ্চম জাতীয় সংসদ পূর্ণ মেয়াদ অতিক্রান্ত সময়কালে মোট ২২টি অধিবেশনে ৪০১ কার্যদিবসে ১৮৩৮.১২ ঘন্টা বৈঠকে বসেছে। স্থায়িত্ব ও কার্যক্রমের ব্যাপকতায় এবং সরকারী ও বিরোধী দলের সংখ্যাগত অবস্থানের নৈকট্যে এই সংসদ অতীতের সংসদগুলোকে অতিক্রম করেছে। উল্লেখ্য যে, পূর্ববর্তী চারটি সংসদের মধ্যে প্রথম ও দ্বিতীয় সংসদ মেয়াদ পূর্তির আগেই সামরিক শাসকগণ কর্তৃক ভেঙ্গে দেয়া হয়। এছাড়া এরশাদ আমলে তৃতীয় ও চতুর্থ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে প্রধান বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলো অংশগ্রহণ না করায় এ পার্লামেন্টগুলো গ্রহণযোগ্যতা পায়নি। ফলে তৃতীয় পার্লামেন্ট এরশাদ নিজেই ভেঙ্গে দেন এবং চতুর্থ পার্লামেন্টের পতন হয় ৯০ এর গণ অভ্যুত্থানের মাধ্যমে।

সংসদীয় গণতন্ত্র ও কার্যক্রমের মূল্যায়নে পঞ্চম পার্লামেন্টের কার্যকলাপ আলোচনা হতে স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, বহু প্রতীক্ষিত সংসদীয় গণতন্ত্র চালু হলেও সংসদীয় পদ্ধতিতে এ পার্লামেন্টের

Dhaka University Institutional Repository

কার্যধারা বাস্তবায়িত হয়নি। নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী সরকার দুর্নীতিমুক্ত সরকার প্রতিষ্ঠা, সকল কালাকানুন বাতিল, আইনের শাসন ও বহুদলীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়নি। জনগণ পায়নি বিচার-বিভাগের স্বাধীনতা, সংবাদ পত্রের স্বাধীনতা, রেডিও-টেলিভিশনের স্বায়ত্তশাসন, প্রশাসন আইন ও সংবিধান অনুযায়ী কাজ করতে পারেনি, কৃষকরা ন্যায্যমূল্যে সার ও বীজ পায়নি, সঠিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়নি বাজার অর্থনীতির ধারা। গণতান্ত্রিক ধারার প্রথম পদক্ষেপ নির্বাচনের ক্ষেত্রে দেখা দেয় নিরাপেক্ষতার অভাব। অপরদিকে বিরোধী দলগুলো কারণে-অকারণে বিভিন্ন উস্কানিমূলক কথাবার্তা বলে, ক্রমাগত সংসদ বর্জন, ঘন ঘন হরতাল ডেকে ব্যাপক সহিংসতা ও ভাংচুর, রেলপথ-রাজপথ অবরোধ করে, দেশের রাজনীতি ও অর্থনীতির ধ্বংস সাধন করে জনগণের জীবনকে করে তুলেছিলো বিপর্যস্ত। যার প্রেক্ষাপটেই বহু প্রতীক্ষিত পঞ্চম পার্লামেন্টের সংসদীয় গণতান্ত্রিক ধারা ব্যর্থ হয়।

পঞ্চম জাতীয় সংসদে সরকারী উদ্যোগে মোট ২০৯টি সাধারণ বিলের নোটিশ পাওয় যায়। তন্মধ্যে ১৮৪টি বিল সংসদে উত্থাপিত হয়। উত্থাপিত বিলগুলোর মধ্যে ১৭২ টি বিল পার্লামেন্টে গৃহীত হয়। এ পার্লামেন্টে বেসকারী উদ্যোগে ৮২টি সাধারণ বিলের নোটিশ প্রদত্ত হয়। তন্মধ্যে ১২টি বিল সংসদে উত্থাপিত হয়। উত্থাপিত বিলগুলোর মধ্যে ১টি সংসদে গৃহীত হয়। অর্থাৎ এ পার্লামেন্টে মোট ১৭৩টি সাধারণ বিল পাস হয়।

পঞ্চম পার্লামেন্টে গৃহীত ১৭৩টি সাধারণ বিলের মধ্যে ১৬৬ টি (৬৭%) ছিলো মৌলিক বিল এবং ৫৭ টি (৩৩%) ছিলো রাষ্ট্রপতি কর্তৃক পূর্বাহ্নে জারিকৃত অধ্যাদেশ, যেগুলো অনুমোদনের জন্য সংসদে পেশ করা হয়।

গবেষণার জন্য প্রস্তাবিত পঞ্চম সংসদে গৃহীত ১৭৩ টি বিলের মধ্যে ১৫৫ টি, অর্থাৎ (৬৬%) এর ওপর সংসদে সাধারণ আলোচনা অনুষ্ঠিত হয় এবং বাকী ৫৮ টি, অর্থাৎ ৩৪% বিল কোনো রকম আলোচনা ছাড়াই পাস হয়। ১৭৩ টি বিলের মধ্যে ২৫ টি (১৪%) বিলের ওপর পার্লামেন্টে পর্যাপ্ত আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়।

১৯৯১-৯৫ সময়কালে পঞ্চম পার্লামেন্টে পাসকৃত ১৭৩ টি বিলের মধ্যে ৪২ টি, অর্থাৎ ২৪% সংশোধনীসহ গৃহীত হয় এবং অবশিষ্ট ১৩১ টি, অর্থাৎ ৭৬% সাধারণ বিল যে ধরনের পার্লামেন্টে উত্থাপিত হয় ঠিক সে ধরনেরই পাস হয়। এসংসদে সরকার দলীয় ১৩০ টি এবং বিরোধী দলের ১৫ টি সংশোধনী গৃহীত হয়।

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম সংসদে গৃহীত ১৭৩ টি সাধারণ বিলের মধ্যে মাত্র ৮ টি (৫%) বিল বিভিন্ন কমিটিতে প্রেরণের রিপোর্টের ভিত্তিতে গৃহীত হয়। তন্মধ্যে বাছাই কমিটিতে ২ টি, বিশেষ কমিটিতে ৫ টি এবং ১ টি বিল আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটিতে প্রেরণ করা হয়। বাংলাদেশে সংসদীয় সরকারের আমলে আইন প্রণয়নমূলক কাজের মধ্যে কোনো পার্থক্য ছিলো কিনা তা' অনুধাবনের জন্য প্রথম ও পঞ্চম পার্লামেন্টের আইন প্রণয়নমূলক কাজের তুলনামূলক পার্থক্য প্রদর্শিত হলো (দেখুন সারণী -৭.১)

সারণী - ৭.১

প্রথম ও পঞ্চম সংসদীয় পার্লামেন্টের আইন প্রণয়নমূলক কাজের তুলনামূলক চিত্র

	প্রথম সংসদ		পঞ্চম সংসদ	
	সংখ্যা	শতকরা হার	সংখ্যা	শতকরা হার
১. মোট অধিবেশন	৭	-	২২	-
২. মোট কার্য দিবস	১১৪	-	৪০১	-
৩. মোট কার্য ঘন্টা	৪০৭	-	১৮৩৮.১২	-
৪. সাধারণ বিলের নোটিশ	১১৩	-	২০৯	-
৫. সংসদে উত্থাপিত বিল	১০৭	৮৫	১৮৪	৮৮
৬. সংসদে গৃহীত বিল	১০০	৯৩	১৭৩	৯৪
(ক) মৌলিক বিল	৪৫	৪৫%	১১৬	৬৭%
অধ্যাদেশ আকারে পূর্বাহ্নে জারিকৃত বিল	৫৫	৫৫%	৫৭	৩৩%
(খ) আলোচনার মাধ্যমে গৃহীত বিল	৫৬	৫৬%	১১৫	৬৬%
আলোচনা ছাড়া পাসকৃত বিল	৪৪	৪৪%	৫৮	৩৪%
(গ) সংশোধনীসহ গৃহীত বিল	২৯	২৯%	৪২	২৪%
সংশোধনী ছাড়া গৃহীত বিল	৭১	৭১%	১৩১	৭৬%
(ঘ) কমিটির রিপোর্টের ভিত্তিতে গৃহীত বিল	৩	৩%	৮	৫%
কমিটিতে প্রেরিত হয়নি এরূপ গৃহীত বিল	৯৭	৯৭%	১৬৫	৯৫%

উৎস ঃ বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ, বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের কার্যবাহের সারাংশ ১৯৭৩ হতে ১৯৭৫ (৭খন্ড), বিতর্ক (৭খন্ড) এবং ১৯৯১ হতে ১৯৯৫, কার্যবাহের সারাংশ (২২খন্ড), বিতর্ক (২২খন্ড)।

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম পার্লামেন্টে পাঁচটি বাজেট পাস হয়। সংসদে গৃহীত পাঁচটি বাজেটের ওপর আলোচনায় মোট ১০৭৫ জন সাংসদ অংশগ্রহণ করেন। তন্মধ্যে ৫৪৪ জন সাংসদ ছিলেন বিরোধী দলের। উল্লেখ্য যে, চতুর্থ ও পঞ্চম বাজেট সংসদে গৃহীত হয় কেবলমাত্র সরকার দলীয় সদস্যদের মধ্যে আলাপ-আলোচনার ভিত্তিতে। এ বাজেট দু'টোর ওপর মোট ১১৯ জন সদস্য আলোচনার সুযোগ পান।

পার্লামেন্টে গৃহীত পাঁচটি সম্পূরক বাজেটের ওপর ২৬২ টি ছাটাই প্রস্তাব সংসদে উত্থাপিত ও আলোচিত হয় এবং সবগুলো প্রস্তাবই সংসদ-সদস্যদের কণ্ঠভোটে নাকচ হয়ে যায়। এছাড়া পাঁচটি বাজেটের মোট ৩৫৯ টি মঞ্জুরী-দাবির মধ্যে মাত্র ২৯টি দাবির ওপর সংসদে আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। ফলে প্রায় ৯২% মঞ্জুরী-দাবি কোনো রকম আলোচনা ছাড়াই পাস হয়।

পঞ্চম সংসদে গৃহীত পাঁচটি সাধারণ বাজেটের ওপর ৪৮৭২টি ছাটাই প্রস্তাব সংসদে উত্থাপিত ও আলোচিত হয় এবং সবগুলো প্রস্তাবই সংসদ-সদস্যদের কণ্ঠ ভোটে নাকচ হয়ে যায়। এছাড়া পাঁচটি সাধারণ বাজেটের মোট ৬৪০ টি মঞ্জুরী দাবির মধ্যে মাত্র ৫৬টি দাবির ওপর সংসদে আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। ফলে প্রায় ৯১% মুঞ্জুরী-দাবি কোনো রকম আলোচনা ছাড়াই পাস হয়। উল্লেখ্য যে, চতুর্থ ও পঞ্চম বাজেট পাসে বিরোধী দল সংসদে না থাকায় এ বাজেট দু'টোতে সম্পূরক বাজেটে ১৫১টি এবং সাধারণ বাজেটে ২৬০টি মঞ্জুরী-দাবি সরকারী দল কোনো রকম আলোচনা ছাড়াই সংসদে পর্যায়ক্রমে উত্থাপনের মাধ্যমে পাস করিয়ে নেয়। এ বাজেট দু'টোর ওপর কোনো ছাটাই প্রস্তাব সংসদে উত্থাপিত হয় নাই।

পঞ্চম সংসদে সংবিধানের একাদশ ও দ্বাদশ দু'টো সংশোধনী গৃহীত হয়। একাদশ সংশোধনীটি অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি হিসাবে প্রধান বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহ্মদের নিয়োগ, তাঁর যাবতীয় ক্ষমতা প্রয়োগ ও দায়িত্ব পালন এবং তৎকর্তৃক প্রণীত সকল আইন ও অধ্যাদেশ এবং কৃত ও গৃহীত সকল কাজকর্ম ও ব্যবস্থা অনুমোদন ও সমর্থন এবং পুনরায় প্রধান বিচারপতি পদে প্রত্যাবর্তন প্রসঙ্গে সংসদে গৃহীত হয়। কিন্তু দ্বাদশ সংশোধনীর দ্বারা সংবিধানে সরকারের কাঠামো, ক্ষমতা ও বৈশিষ্ট্যের মৌলিক পরিবর্তন সাধিত হয়। এর ফলে রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকারের পরিবর্তে মন্ত্রীপরিষদ শাসিত সরকার প্রবর্তন করা হয়। একাদশ ও দ্বাদশ সংশোধনীটি সংসদে গৃহীত হয় ব্যাপক আলোচনার ভিত্তিতে। একাদশ সংশোধনী আলোচনায় বাষট্টি জন সাংসদ অংশগ্রহণ করেন এবং এর ওপর একটি সংশোধনী গৃহীত হয়। দ্বাদশ সংশোধনী আলোচনায় সাতানব্বই জন সংসদ-সদস্য অংশগ্রহণ করেন এবং এর ওপর তিনটি সংশোধনী গৃহীত হয়।

Dhaka University Institutional Repository

জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালী-বিধিতে অনাস্থা প্রস্তাব, প্রশ্ন জিজ্ঞাসা, মুলতবী প্রস্তাব, সংক্ষিপ্ত আলোচনার প্রস্তাব, মনোযোগ আকর্ষণী প্রস্তাব, বিশেষ অধিকার প্রস্তাব, সিদ্ধান্ত-প্রস্তাব, অর্ধ-ঘন্টা আলোচনা প্রস্তাব (সাধারণ), সদস্য কর্তৃক বিবৃতি প্রভৃতি উত্থাপনের মাধ্যমে পার্লামেন্ট কর্তৃক শাসন বিভাগকে নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা আছে।

বর্তমান গবেষণায় প্রস্তাবিত সংসদে সরকারের বিরুদ্ধে বিরোধী দল কর্তৃক সংসদে একটি অনাস্থা প্রস্তাব উত্থাপিত হয় কিন্তু অনাস্থা প্রস্তাবটির পক্ষে সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের সমর্থন না থাকায় উহা বাতিল হয়ে যায়।

মন্ত্রীপরিষদ শাসিত সরকারে শাসন বিভাগ নিয়ন্ত্রণের কলাকৌশলগুলোর মধ্যে প্রশ্নোত্তর পদ্ধতিটি পার্লামেন্ট কর্তৃক সর্বাপেক্ষা কার্যকরভাবে প্রয়োগ হয়। পঞ্চম পার্লামেন্টে সংসদ-সদস্যগণ মোট ৩৭৯০৭ টি তারকা চিহ্নিত প্রশ্নের নোটিশ দেন। তন্মধ্যে ৯৩৯১টি, অর্থাৎ প্রায় ২৫% প্রশ্ন স্পীকার কর্তৃক বিধিসম্মত বলে গৃহীত হয়। কিন্তু ৮৬৯২টি, অর্থাৎ প্রায় ৯৩% প্রশ্নের উত্তর দেয়া হয়। অবশিষ্ট প্রশ্ন তামাদি ও বাতিল হয়ে যায়।

১৯৯১-'৯৫ সময়কালে পার্লামেন্টে সাংসদগণ ৯৪৬৩টি তারকা চিহ্নবিহীন প্রশ্নের নোটিশ জমা দেন। তার মধ্যে স্পীকার কর্তৃক ৩৩৬৩টি, অর্থাৎ প্রায় ৩৬% প্রশ্ন গৃহীত হয়। গৃহীত প্রশ্নের ৩০৫৭টি, অর্থাৎ প্রায় ৯১% প্রশ্নের উত্তর দেয়া হয়।

পঞ্চম সংসদে সাংসদরা ২১৪টি স্বল্পকালীন নোটিশের প্রশ্ন আনেন। তার মধ্যে সংসদে আলোচনা ও উত্তর দানের জন্য স্পীকার কর্তৃক ১০টি প্রশ্ন গৃহীত হয়। তবে ৫টি প্রশ্নের উত্তর দেয়া হয়। এ সংসদে উত্থাপিত ৪০টি বৈধতার প্রশ্নের ওপর ২৩৮ জন সাংসদ বিবৃতি প্রদান করেন।

পঞ্চম পার্লামেন্টে ১৮০৩টি মুলতবী প্রস্তাবের নোটিশ জমা পড়ে। যার মধ্যে স্পীকার মাত্র ৬টি প্রস্তাব বিধিসম্মত বলে গ্রহণ করেন। গৃহীত প্রস্তাবের মধ্যে ৫টির ওপর সংসদে আলোচনা হয়। ২২টি মুলতবী প্রস্তাব কমিটিতে প্রেরিত হয়। কিন্তু কোনো কমিটিই রিপোর্ট প্রদান করেনি।

১৯৯১-'৯৫ সময়কালে সংসদে ৫৮৮০টি মনোযোগ আকর্ষণের নোটিশ পাওয়া যায়, যার মধ্যে স্পীকার কর্তৃক ৫৮১টি প্রস্তাব বিবৃতি দানের জন্য গৃহীত হয়। কিন্তু তার মধ্যে ৩৪০টি প্রস্তাবের ওপর সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীরা সংসদে বিবৃতি প্রদান করেন।

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম সংসদে জরুরী জন-গুরুত্বসম্পন্ন বিষয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনার জন্য ৮১১টি নোটিশ আসে। তার মধ্যে আলোচনার জন্য স্পীকার কর্তৃক ৮৫টি প্রস্তাব বিধিসম্মত বলে গৃহীত হয়। তার মধ্যে ৪০টি, অর্থাৎ প্রায় ৪৭% প্রস্তাব সংসদে আলোচিত হয়। এছাড়া এ সংসদে অর্ধ-ঘন্টা আলোচনার জন্য ১৪৩টি নোটিশ দেয়া হয়। যার মধ্যে স্পীকার কর্তৃক গৃহীত হয় ১৪টি এবং সংসদে আলোচিত হয় মাত্র ৩টি, অর্থাৎ প্রায় ২১%।

পঞ্চম সংসদে বেসরকারী সদস্যদের নিকট থেকে ৫৫৩২৩টি সিদ্ধান্ত প্রস্তাবের নোটিশ জমা পড়ে। যার মধ্যে ব্যালটে প্রদানের জন্য স্পীকার কর্তৃক বিধিসম্মত বলে ১৮৫০০টি নোটিশ গৃহীত হয় কিন্তু ব্যালটে স্থান লাভ করে ৩২৪টি, অর্থাৎ প্রায় ২%। তন্মধ্যে সংসদে উত্থাপিত হয় ১৮৮টি, অর্থাৎ প্রায় ৫৮% এবং আলোচিত হয় ১১২টি (৬০%)। তা'হলে দেখা যাচ্ছে বেসরকারী সিদ্ধান্ত-প্রস্তাব নোটিশের মাত্র ০.২০% প্রস্তাব সংসদে আলোচনা হয়। আলোচনায় ৬১২ জন সাংসদ অংশগ্রহণ করেন। আলোচিত সিদ্ধান্ত প্রস্তাবের পাঁচটি প্রস্তাব গৃহীত হয়।

১৯৯১-'৯৫ সময়কালে পঞ্চম সংসদে ১০৭৮টি বিশেষ অধিকার প্রস্তাবের নোটিশ আসে, যার মধ্যে স্পীকার কর্তৃক বিধিসম্মত বলে ২০৩টি গৃহীত হয়। ২০১টি প্রস্তাব কমিটিতে প্রেরিত হয় এবং কমিটির রিপোর্টের ভিত্তিতে ৭টি প্রস্তাব সংসদে গৃহীত হয়। তন্মধ্যে ৬টি প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

পঞ্চম জাতীয় সংসদে প্রস্তাব (সাধারণ) ২৬টি গৃহীত ও আলোচিত হয়। এছাড়া সংসদ-সদস্য কর্তৃক ৭৯৯টি বিবৃতি, সংসদ নেত্রী, বিরোধী দলের নেত্রী, সংসদ উপনেতা, স্পীকার, ডেপুটি স্পীকার, মন্ত্রী ও প্রতিমন্ত্রীগণের ১২৬টি বিবৃতি এবং ১১টি সাধারণ আলোচনা হয়।

স্বাধীনতার পর বর্তমান সময় পর্যন্ত বাংলাদেশ পার্লামেন্টে প্রতিষ্ঠিত দু'টো সংসদীয় সরকার, অর্থাৎ প্রথম ও পঞ্চম সংসদে আইন বিভাগ কর্তৃক শাসন বিভাগ নিয়ন্ত্রণে গুরুত্বপূর্ণ কার্যকলাপের একটা তুলনামুলক চিত্র উল্লেখ করা হলো (দেখুন সারণী ৭.২)। গবেষকের দৃষ্টিতে এ পার্থক্য থেকে সহজেই অনুধাবন করা যাবে সংসদীয় কার্যক্রমের কি তেমন কোনো পরিবর্তন হয়েছে, না অপরিবর্তিত।

সারণী - ৭.২

প্রথম ও পঞ্চম সংসদীয় সংসদে শাসন বিভাগের ওপর আইনসভা কর্তৃক নিয়ন্ত্রণমূলক কার্যকলাপের তুলনামূলক চিত্র

	প্রশ্ন/ প্রস্তাবের নোটিশ সংখ্যা		স্পীকার কর্তৃক গৃহীত প্রশ্ন/ প্রস্তাবের সংখ্যা		উত্তর প্রদত্ত প্রশ্ন/ আলোচিত প্রস্তাবের সংখ্যা *	
	প্রথম সংসদ	পঞ্চম সংসদ	প্রথম সংসদ	পঞ্চম সংসদ	প্রথম সংসদ	পঞ্চম সংসদ
তারকা চিহ্নিত প্রশ্ন	৭৫৭৬	৩৭৯০৭	৫৪১৩	৯৩৯১	৪১৮১(৭৭%)	৮৬৯২ (৯৩%)
তারকা চিহ্নবিহীন প্রশ্ন	৩০	৯৪৬৩	২৬	৩৩৬৩	০৪(১৫%)	৩০৫৭ (৯১%)
স্বল্পকালীন নোটিশের প্রশ্ন	১০৮	২১৪	৫০	১০	২৫(৫০%)	০৫ (৫০%)
মুলতবী প্রস্তাব	১৬	১৮০৩	০১	০৬	০০	০৫ (৮৩%)
বেসরকারী সদস্যদের সিদ্ধান্ত-প্রস্তাব	৩৪৩	৫৫৩২৩	২৭২	১৮৫০০	০৬(০২%)	১১২ (০৬০%)
মনোযোগ আকর্ষণী প্রস্তাব	২২৯	৫৮৮০	৫১	৫৮১	২৮(৫৫%)	৩৪০ (৫৯%)
অর্ধ-ঘন্টা আলোচনার প্রস্তাব	০৪	১৪৩	০০	১৪	০০	০৩ (২১%)
সংক্ষিপ্ত আলোচনার প্রস্তাব	১৯	৮১১	০৫	৮৫	০৪(৮০%)	৪০ (৪৭%)
অনাস্থা প্রস্তাব	০০	০১	০০	০১	০০	০১ (১০০%)

উৎস ঃ বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের কার্যবাহের সারাংশ, প্রথম পার্লামেন্ট (৭খন্ড), পঞ্চম পার্লামেন্ট (২২খন্ড)।

* স্পীকার কর্তৃক গৃহীত প্রশ্ন / প্রস্তাবের শতকরা হার বন্ধনীর মধ্যের অংকগুলো।

Dhaka University Institutional Repository

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম জাতীয় সংসদের কার্যকলাপের ব্যাপক আলোচনা ও এ সংসদের সাথে প্রথম সংসদের কার্যকলাপের তুলনামূলক চিত্র থেকে প্রতীয়মান হয় যে, বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ তার যথাযথ ভূমিকা পালনে ব্যর্থ। পঞ্চম সংসদে বেসরকারী সদস্যদের নিকট থেকে ৮৪টি বিলের নোটিশ পাওয়া গেলেও ১২টি বিল সংসদে উত্থাপিত হয় কিন্তু গৃহীত হয় মাত্র একটি। প্রথম পার্লামেন্টে কোনো বেসরকারী বিলই পাস হয়নি। সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে বেসরকারী বিলকে পাস করতে দেয়া হয় না। অধ্যাদেশ জারি করার সুযোগ নিয়ে বহু সংখ্যক বিল এরূপ জারি করা হয়। যার ওপর আলোচনা করার সুযোগ থাকে কম। পঞ্চম ও প্রথম পার্লামেন্টে পাসকৃত আলোচনাহীন বহু বিল রয়েছে (সারণী- ৭.১)।

ইংল্যান্ড ও ভারতের মত সংসদীয় ব্যবস্থায় কমিটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। বিভাগীয় স্থায়ী কমিটিগুলো শুধু আইনের প্রস্তাবই বিবেচনা করে না। তারা নিয়মিতভাবে বৈঠকে বসে, মন্ত্রীসহ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের কমিটির সামনে হাজির হয়ে সাক্ষ্য দেয়ার জন্য ডাকতে পারে ও যে-কোনো নথি তলব করে প্রকাশ্য শুনানি গ্রহণ করতে পারে। বাংলাদেশের সংবিধানেও সংসদের কার্যপ্রণালী-বিধিতে বাছাই কমিটি, বিশেষ কমিটি ও মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত স্থায়ী কমিটির ব্যবস্থা আছে। প্রথম পার্লামেন্টে কমিটির ব্যবহার তেমন ছিলো না। কিন্তু পঞ্চম পার্লামেন্টে কমিটির ব্যাবহার কোনো ক্ষেত্রেই কমতি ছিলো না তবে উহার যথাযথ বাস্তবায়ন হয়নি। কেননা কমিটিগুলো আইনের প্রস্তাব, শাসন বিভাগকে নিয়ন্ত্রণ করার প্রস্তাব প্রভৃতি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করলেও সরকারের কার্যাবলী অবাধে নিরীক্ষা করতে সক্ষম হয়নি। আবার কমিটিগুলোর রিপোর্ট সংসদে গৃহীত হলেও সরকার কদাচিৎ বাস্তবায়িত করেন। উল্লেখ্য যে, মন্ত্রী যদি হয় কমিটিগুলোর সভাপতি। সেখানে সফলতার আশা ক্ষীণ।

বাজেটের ক্ষেত্রেও পঞ্চম পার্লামেন্ট কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারেনি। অধিকাংশ মঞ্জুরী-দাবি গিলোটিনের মাধ্যমে, অর্থাৎ আলোচনা ছাড়াই পাস হয়। সংসদ-সদস্যদের দাবির ফলে নিত্য ব্যবহার্য কয়েকটি দ্রব্যের ওপর থেকে কর প্রত্যাহার বা হ্রাস করা হয়। কিন্তু বিত্তবানদের ব্যবহার্য দ্রব্যের ওপর কর বৃদ্ধির প্রস্তাব করলেও তা তেমন কার্যকর হয়নি।

তবে পঞ্চম সংসদে শাসন বিভাগের ওপর পার্লামেন্টের কার্যকর নিয়ন্ত্রণ না থাকলেও আংশিক নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম হয়েছে। এ পার্লামেন্টে ছিলো একটি শক্তিশালী প্রধান বিরোধী দলসহ ব্যাপক বিরোধী দলীয় সদস্য। যাঁরা একের পর এক বিভিন্ন প্রশ্ন ও প্রস্তাব উত্থাপন করে সরকারকে

Dhaka University Institutional Repository

চাপের মুখে রেখে কিছুটা হলেও জবাবদিহিতা আদায় করতে সমর্থ হন। এক্ষেত্রে প্রশ্নোত্তর পদ্ধতিটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। এছাড়া শাসন বিভাগ নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে মুলতবী প্রস্তাব, বেসরকারী সদস্যদের সিদ্ধান্ত-প্রস্তাব, অনাস্থা প্রস্তাব, বিশেষ অধিকার প্রস্তাব, সংক্ষিপ্ত আলোচনা, মনোযোগ আকর্ষণী প্রস্তাব, ওয়াক আউট প্রভৃতিরও ভূমিকা ছিলো। প্রথম সংসদে এগুলোর ভূমিকা ছিলো না বললেই চলে। এছাড়া এসংসদে মাত্র আট জন বিরোধী সদস্য থাকায় কার্যপ্রণালী-বিধি অনুযায়ী শাসন বিভাগকে নিয়ন্ত্রণের অনেক প্রস্তাবই সংসদে উত্থাপন করা যায়নি। যেমন, কোনো অনাস্থা প্রস্তাব পেশ করতে হলে ৩০ জন সদস্যের সমর্থনের প্রয়োজন।

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, আইন প্রণয়ন, বাজেট প্রণয়ন, শাসন বিভাগকে নিয়ন্ত্রণ প্রভৃতি ক্ষেত্রে ইহা যথাযথ ভূমিকা পালন করতে পারেনি। এই ব্যর্থতার জন্য নিম্নোক্ত কারণগুলোকে অভিন্ন বলে চিহ্নিত করা যেতে পারেঃ

(ক) **সংসদীয় সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের অভাবঃ** দীর্ঘ ঔপনিবেশিক শাসনামলে বাংলাদেশে সংসদীয় রাজনীতির চর্চা ছিলো অপ্রতুল এবং ব্রিটিশ ও পাকিস্তান আমলে শাসন বিভাগীয় প্রাধান্য বাংলাদেশ উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করে।

(খ) সংসদ ও সাংসদদের মর্যাদা, ক্ষমতা ও অধিকারের অপ্রতুলতাঃ ১৯৭২ সালের মূল সংবিধানে জাতীয় সংসদকে পর্যাপ্ত ক্ষমতা ও মর্যাদা দেয়া হয়। কিন্তু সংবিধানের ৭০ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী সংসদ-সদস্যদের ওপর কঠোর দলীয় নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা হয়। এতে বিধান করা হয় যে, কোনো সাংসদ তাঁর দল ত্যাগ কিংবা সংসদে দলের বিরুদ্ধে ভোটদান করলে সংসদে তাঁর আসন শূন্য হয়ে যাবে। যে অনুচ্ছেদটি দ্বাদশ সংশোধনীর মাধ্যমেও অবিকল থেকে যায়। সুতরাং সদস্যপদ হারাবার ভয়ে সাংসদগণ দলের বিরুদ্ধাচারণ করতে সাহস পায় না। ফলে অনেকে নীতির বিরুদ্ধে স্বৈরাচারী নিয়ম-নীতিও মেনে নেয়। যার প্রেক্ষাপটে, আইন বিভাগ শাসন বিভাগকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারছে না।

(গ) সংসদীয় ব্যবস্থার প্রতি প্রধান রাজনৈতিক শক্তি সমূহের অঙ্গীকারের অভাবঃ ১৯৭৩-'৭৫ সময়কালে সংসদীয় রাজনীতির উপযোগী রাজনৈতিক পরিমন্ডল ছিলো না; প্রধান বিরোধী দলগুলো বিপ্লবের মাধ্যমে সমাজতন্ত্র কায়েম করতে চায় এবং পার্লামেন্টকে অকার্যকর করার জন্য সহিংস পথ অবলম্বন করে। ১৯৭৯-'৯০ সময়কালে বিপ্লবী দলগুলো তাদের কৌশল পরিবর্তন করলেও সংসদীয় ব্যবস্থাকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য তাদের আগ্রহ ছিলো না। অপরদিকে, এই সময়কালের জিয়া ও এরশাদ সামরিক সরকার অবৈধ পন্থায় ক্ষমতা লাভ করে কালক্রমে বৈধতা

Dhaka University Institutional Repository

পেলেও পার্লামেন্টের বাহিরে এককভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। উল্লেখ্য যে, শেখ মুজিব সরকার সামরিক বাহিনীর না হয়েও উপর্যুক্ত ক্ষমতা অবলীলায় এককভাবে প্রয়োগ করেছেন। পঞ্চম সংসদের খালেদা জিয়া সরকার এ ধরনের ক্ষমতা প্রত্যক্ষভাবে প্রয়োগ না করলেও সরকার গঠনের প্রাথমিক পর্যায়েই দেখা যায় সংসদীয় সরকার প্রতিষ্ঠায় অনীহা। তিনি চেয়েছিলেন রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার প্রতিষ্ঠা করে পূর্বোক্ত সরকারের ন্যায় জাতীয় সংসদের ওপর একচ্ছত্র আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করতে। কিন্তু বিরোধী দলের অনমনীয় মনোভাব ও সাহাবুদ্দীন সরকারের চাপের মুখে সে আশায় গুড়েবালি হলেও তিনি পরোক্ষভাবে সংসদীয় সরকারের রীতি-নীতিকে উপেক্ষা করে চলেছেন, যা জাতীয় সংসদের কার্যকলাপে ব্যাঘাত ঘটিয়েছে। যেমন, দিনের পর দিন পার্লামেন্টের অধিবেশনে অনুপস্থিত থাকা, আসলেও কথা না বলা ইত্যাদি।

পঞ্চম সংসদে দলীয় শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য " ফ্লোর ক্রসিং রোধ" এর যে বিধান সংযোজিত হয়েছিলো তা গণতান্ত্রিক সরকারের স্থিতিশীলতার জন্য কাম্য হলেও, এ বিধান সরকারের দায়িত্বশীলতা নিশ্চিত করার পথে একটি বিরাট অন্তরায় ছিলো। সংসদে দলীয় শৃংখলা বজায় রাখার এ বিধান থাকার ফলে সংসদে সরকারকে নিয়ন্ত্রণ করার বদলে সরকার সংসদকে নিয়ন্ত্রণ করেছে।

শাসন বিভাগের কার্যকলাপকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালী-বিধিতে ওয়াক আউট বিধান থাকলেও কারণে-অকারণে বিরোধী দলের ঘন ঘন ওয়াক আউট সংসদের কার্যক্রমে ব্যাঘাত সৃষ্টি করেছে। এছাড়াও দিনের পর দিন হরতাল, ধর্মঘট পালন করে দেশটাকে এক নৈরাজ্যমূলক বিশৃংখলার মধ্যে নিপাতিত করা হয়েছিলো।

সংসদীয় সরকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ যে যাত্রা করেছিলো তাতে বাহ্যিক অবয়বের প্রায় সবকিছুই সন্নিবেশিত হয়েছিলো বলা চলে। যেমন, একটি প্রধান বিরোধী শক্তিশালী রাজনৈতিক দল, কমিটি সিস্টেম, ফ্লোর ক্রসিং রোধ ইত্যাদি। কিন্তু গণতন্ত্রের স্বপ্ন দেখেছে এদেশের মুক্তকামী মানুষ, সেই গণতন্ত্র বহু দূরেই থেকে গেছে। অনেক সংগ্রামের বিনিময়ে পাওয়া সংসদ তিন বছরের বেশি কাজ করতে পারেনি। জনগণের ভোটের অধিকার নিয়ে আবার মানুষকে সংগ্রাম করতে হয়েছে। প্রহসনের নির্বাচনকে রুখতে হয়েছে। শেষ পর্যন্ত জাতীয় সংসদ তার কার্যক্রমকে চালিয়ে গেলেও সমগ্র প্রক্রিয়ার অভিজ্ঞতা কোনো ক্রমেই সুখকর নয়।

Dhaka University Institutional Repository

কিন্তু সেই গণতন্ত্র কি কেবল ভোটের, নির্বাচনের অথবা একটি সংসদ বা সংসদীয় ব্যবস্থা কায়েম করার, সে ব্যবস্থাতো কায়েম হয়েছিলো, আবার হয়েছে, কিন্তু তারপরও গত পঁচিশ বছরের সেই স্বৈরাচারের উত্থান হয়েছে বার বার।

আসলে অসুখটা মূলে। মুক্তিযুদ্ধের বিজয় সেই মূলে টান দিয়েছিলো। কিন্তু উৎপাটিত করতে পারেনি। পুরনো সমাজটা রয়ে গেছে, রাষ্ট্রব্যবস্থা রয়েছে, রয়ে গেছে শাসক শ্রেণী ও তার কর্তৃত্ব। সেই সমাজটা টিকিয়ে রেখে জাতীয় সংসদকে নিরঙ্কুশ করা যাবে না, এই সত্যটা বিজয়ের পঁচিশ বছর বার বার চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়েছে। এর জন্য প্রয়োজন ঐ জমিনটা উল্টে-পাল্টে নতুন জমিন তৈরী করা।

পঁচিশ বছর কম সময় নয়। গেলো পঁচিশ বছরে আমাদের যা করার ছিলো তা করতে পারিনি। নিজেদের বিজয়কেই আমরা ধ্বংস করেছি। সামনের সময় আর নষ্ট করবার নয়। একবিংশ শতাব্দীর দোড়গোড়ায় আমরা। সেই নতুন শতাব্দীতে আমাদের ছেলে-মেয়েরা যেন মাথা উঁচু করে বিজয়ের নতুন জয়ন্তী পালন করতে পারে।

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট

উত্তরদাতাদের জন্য নির্বাচিত প্রশ্নমালা

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ (১৯৯১-১৯৯৫)ঃ এর কার্যকারিতার পর্যালোচনা

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ (১৯৯১-১৯৯৫)ঃ এর কার্যকারিতা শীর্ষক পর্যালোচনার জন্য প্রশ্নমালা। গবেষণা কর্মটি সমৃদ্ধ করার জন্য প্রয়োজনীয় স্থানে সুচিন্তিত মতামত লিখুন। (সংগৃহীত তথ্যাবলী কেবলমাত্র গবেষণার কাজে ব্যবহৃত হবে এবং এর গোপনীয়তা রক্ষা করা হবে।)

সুপারভাইজারের স্বাক্ষর ও তারিখ- তথ্যসংগ্রহকারীর স্বাক্ষর ও তারিখ-

১. উত্তরদাতার নামঃ ----------

২. প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানাঃ ----------
---

৩. উত্তরদাতার পদবীঃ ----------

৪. শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ □এস, এস, সি □এইচ, এস, সি □ স্নাতক □স্নাতকোত্তর-তদুর্দ্ধ

৫. কেবলমাত্র আইনসভার সদস্যদের ক্ষেত্রেঃ ক) পার্লামেন্টের পদ এবং অবস্থান ----------
খ) মন্ত্রীপরিষদের পদ এবং অবস্থান ----------
গ) দলীয় পদ এবং অবস্থান---------- ঘ) সংসদীয় অভিজ্ঞতা ----------
ঙ) রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা----------।

প্রশ্নমালা

১. পঞ্চম সংসদে প্রায় এক-তৃতীয়াংশ অধ্যাদেশ সংক্রান্ত আইন পাশ কি গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় ব্যাঘাত সৃষ্টি করেছে? □ হ্যাঁ □ না

মন্তব্যঃ ----------
---

২. কমিটি সমূহের রির্পোট এবং সুপারিশ কদাচিৎ বাস্তবায়নে সরকারের স্বচ্ছতা বা জবাবদিহিতা কতোটুকু সুনিশ্চিত হয়েছে। □ সম্পুর্ণ □ মোটেই না □ অধিকাংশ □ আংশিক □ মোটামুটি

Dhaka University Institutional Repository

৩. সংসদ থেকে বিরোধী দলগুলোর একযোগে পদত্যাগই কি ছিলো একমাত্র পথ? ☐ হ্যাঁ ☐ না

মন্তব্যঃ ----------

---

৪. বিরোধীদের সংসদ থেকে পদত্যাগের পর সরকারী দলের কি উচিৎ ছিলো সংসদ ভেঙ্গে দেয়া?

☐ হ্যাঁ ☐ না

মন্তব্যঃ ----------

---

৫. বিরোধী দলগুলো কেবলমাত্র বিরোধিতার জন্য বিরোধিতা করে উহা কতোটুকু সত্য।

☐ সম্পূর্ণ ☐ অধিকাংশ ☐ আংশিক ☐ মোটামুটি ☐ মোটেই না।

৬. পঞ্চম সংসদে উপনির্বাচনগুলো কি অবাধ, নিরপেক্ষ এবং সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়েছিলো?

☐ হ্যাঁ ☐ না ☐ অধিকাংশ ☐ আংশিক ☐ মোটামুটি।

৭. ষষ্ঠ পার্লামেন্ট নির্বাচনও কি অবাধ ও নিরপেক্ষ ছিলো?

☐ হ্যাঁ ☐ না ☐ অধিকাংশ ☐ আংশিক ☐ মোটামুটি।

৮. বিরোধী দলগুলোর তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলণ কি গণতান্ত্রিক ছিলো?

☐ হ্যাঁ ☐ না।

৯. পঞ্চম পার্লামেন্টের কার্যবাহ সংসদীয় পদ্ধতিতে সম্পন্ন হয়েছিলো কি?

☐ হ্যাঁ ☐ না ☐ অধিকাংশ ☐ আংশিক ☐ মোটামুটি।

১০. বাংলাদেশে সংসদীয় গণতন্ত্র চালু হয়েও উহার বাস্তবায়ন হচ্ছে না কেন?

ক) সরকারের দায়িত্বশীলতার অভাব;
খ) বিরোধী দল সঠিক ভূমিকা পালনে ব্যর্থ;
গ) আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় ব্যর্থতা;
ঘ) আমলাদের প্রাধান্য;
ঙ) রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে সহযোগিতার অভাব;
চ) জনগণের সচেতনতার অভাব ইত্যাদি।

Dhaka University Institutional Repository

গ্রন্থপঞ্জী
(BIBLIOGRAPHY)

আহমেদ, এমাজউদ্দীন, *বাংলাদেশ ঃ সমাজ, সংস্কৃতি ও রাজনীতি*, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯২।

----------, *গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৪।

----------, *রাষ্ট্রবিজ্ঞানের কথা*, বাংলাদেশ বুক করপোরেশন লিঃ, ঢাকা, জুন, ১৯৯৪।

আহমদ, আবুল মনসুর, *আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর*, খোশরোজ কিতাব মহল, ঢাকা, ১৯৮৪।

আনিসুজ্জামান (সম্পাদিত), *শহীদ ধীরেন্দ্রনাথ দত্তের আত্মকথা*, শহীদ ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত স্মৃতিরক্ষা পরিষদ, ঢাকা, ১৯৯৫।

আহমদ কামরুদ্দীন, *স্বাধীন বাংলার অভ্যুদয় এবং অতঃপর*, নওরোজ কিতাবিস্তান, ঢাকা, ১৯৮২।

ইসলাম, সৈয়দ সিরাজুল (সম্পাদিত), *বাংলাদেশের ইতিহাস ১৭০৪-১৯৭১*, রাজনৈতিক ইতিহাস, ১ম খন্ড, এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ, ১৯৭৩।

উল্লাহ, আহম্মদ (সম্পাদিত), *পঞ্চম জাতীয় সংসদ প্রামাণ্য গ্রন্থ*, সুচয়ন প্রকাশন, ঢাকা, ১৯৯২।

ওমর, বদরুদ্দীন, *পূর্ব বাংলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি*, খন্ড ১ ও ২, মওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ১৯৭০।

কামাল, মোস্তফা, *বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব থেকে জননেত্রী শেখ হাসিনা*, বাংলাদেশের ২৫ বছর, কাকলী প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯৭।

করিম, সরদার ফজলুল, *দর্শনকোষ*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৫।

খান, মিজানুর রহমান, *সংবিধান ও তত্ত্বাবধায়ক সরকার বিতর্ক*, সিটি প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯৫।

গঙ্গোপাধ্যায়, সৌরেন্দ্রমোহন, *রাজনীতির অভিধান*, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৯৯৭।

চক্রবর্তী, সত্যসাধন ও নিমাই প্রামাণিক, *রাষ্ট্রবিজ্ঞান*, শ্রীভূমি পাবলিশিং কোম্পানি, ১৯৭৯।

ফিরোজ, জালাল, *পার্লামেন্টারি শব্দকোষ*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৮।

ভট্টাচার্য, নির্মলচন্দ্র ও অশোক কুমার মুখোপাধ্যায়, *ভারতের শাসন ব্যবস্থা ও রাজনীতি*, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কলকতা, ১৯৮৮।

মতীন, হাসিনা, *মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও আমেরিকান স্টাডিজ*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৪।

মুখার্জী, অনিল, *স্বাধীন বাংলাদেশ সংগ্রামের পটভূমি*, মনীষা গ্রন্থালয়, কলকতা, ১৯৭২।

রশীদ, আমিনুর (সম্পাদিত), *প্রামাণ্য সংসদ*, তথ্যসেবা, ঢাকা, ১৯৯৭।

রহমান, আতিউর, *স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশের উন্নয়ন ও স্বপ্ন ভঙ্গের চালচিত্র*, রাজনীতির সামরিকীকরণ, প্রতীক প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯১।

শফিক, মাহমুদ, *জনগণ সংবিধান নির্বাচন*, আমাদের বাঙলা প্রেস লিঃ, ঢাকা, ১৯৯৬।

হাননান, মোহম্মদ, *হাজার বছরের বাংলাদেশ. ইতিহাসের অ্যালবাম*, সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা, ১৯৯৫।

হামিদ, মোঃ আবদুল, *আইনকোষ*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৪।

হালিম, মোঃ আবদুল, *সংবিধান, সাংবিধানিক আইন ও রাজনীতি ঃ বাংলাদেশ প্রসঙ্গ*, রিকো প্রিন্টার্স, ঢাকা, ১৯৯৭।

হক, আবুল ফজল, *বাংলাদেশের শাসনব্যবস্থা ও রাজনীতি*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৭৪।

----------, *বাংলাদেশের রাজনীতি ঃ সংঘাত ও পরিবর্তন (১৯৭১-১৯৯৪)*, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী, ১৯৯৪।

হোসেন, শওকত আরা, *বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভা ১৯২১-১৯৩৬ অবিভক্ত বাংলার সমাজ ও রাজনীতি*, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা, ১৯৯০।

Ahmed, Kamruddin, *A Socio Political History of Bengal and the Birth of Bangladesh*, Inside Library, Dhaka, 1975.

Ayto, John, *Dictionary of Word Origin*, GoYL Saak, New Delhi, 1992.

Ahmed, Emazuddin (ed.), *Society and Politics in Bangladesh*, Academic Publishers, Dhaka, 1987.

Ahmed, Mustaq, *Government and Politics in Pakistan*, Pakistan Publishing House, Karachi, 1963.

Ahmed, Moudud, *Bangladesh : Constitutional Quest For Autonomy (1950-1971)*, The University Press, Dhaka, 1979.

Brand, Jack, *British Parliamentary Parties, Policy and Power*, Clarendon Press Oxford, New York, 1992.

Bromhead, P.A., *Private Members Bill in the British Parliament*, Routledge and Kegan Paul, 1956.

Choudhury, Dilara, *Constitutional Development in Bangladesh*, Stresses and Strains, UPL, Dhaka, 1995.

Collin, P.H. *Law Dictionary, Second Edition*, University Book Stall, New Delhi, 1996.

Comfort, Nicholas, *Brewer's Politics*, Revised Edition, Cassell, London, 1995.

Cook, Chris, *Macmillan Dictionary of Historical Terms*, Second Edition, Macmillan Reference Books, London, 1989.

Dhaka University Institutional Repository

Croon J.H., *The Encyclopedia of the Classical Word,* Prentice Hall, Inc. New Jersey, 1965.

Callard, Keith, *Pakistan : A Political Study,* George Allen & Unwin Ltd., 1968.

Choudhury, G.W., *Democrcy in Pakistan,* Green Book House, Dhaka, 1963.

----------, *Constitutional Development in Pakistan,* Longmans, Lahore, 1959.

Chaudhuri, Muzaffar Ahmed, *Government and Politics in Pakistan,* Puthighar Ltd., Dhaka, 1968.

Dye, Thomas R., *Governing the American Democracy St. Martin's Press,* New York, 1980.

Elliot, Florence and Sammerskill, Michael, *A Dictionary of Politics,* Panguin Books, London, 1961.

Gehlot, N.S., *Office of the Speaker in India,* Deep and Deep Publications, New Delhi, 1985.

Harun, Shamsul Huda, *Parliamentary Behavior in a Multi-National State 1947-58 : Bangladesh Experiance,* Asiatic Society of Bangladesh, Dhaka 1984.

HMSO, *Parliament,* HMSO Books, London, 1991.

Hussain, Shawkat Ara, *Politics and Socity in Bengal,* Bangla Academy, Dhaka, 1991.

Harris, Fred R., *American's Democracy*, University of New Mexico Press, 1983.

Jacobs, Francis and Corbett, Richard, *The European Parliament,* Westview Press UK, 1990.

Jahan, Rounaq, *Pakistan : Failure in National Integration,* University Press Limited, Dhaka, 1977.

----------, Bangladesh Politics : Problems and Issues, The University Press Ltd., Dhaka, 1980.

Jennings, Sir Ivor, *Cabinet Government,* Cambridge University, Cambridge, 1961.

Kalra, K.B., *Dictionary of Economics,* Academic (India) Publishers, New Delhi, 1996.

Kaul, M.N. and Shakdher, S.L., *Practice and Procedure of Parliament,* Fourth Edition, New Delhi, 1997.

Kenyon, J.P., *Dictionary of British History,* Words-worth Edition, London, 1994.

Laver, Michael and Shepsle, Kenneth A. (Ed.), *Cabinet Ministers and Parliamentary Government,* Cambridge University Press, New York, 1994.

Laski, Harold J. *A Grammar of Politics,* George Allen and Unwin Ltd., London, 1950.

Lineberry, Robert L., *Government in America : People Politics and Policy,* Little Brown and Company, Boston, 1983.

Meny, Yves, *Government and Politics in Western Europe,* Second Edition, University Press Limited, New York, 1993.

Maniruzzaman, Talukder, *Radical Politics and the Emergence of Bangladesh,* Bangladesh Books International, Dhaka, 1975.

----------, *The Politics of Development : The case of Pakistan (1947-1958),* Green Book House Ltd., Dhaka, 1971.

Nanda T.Re (Ed.), *Dictionary of Political Science,* Anmol Publications, New Delhi, 1993.

Palmer, A.W., *A Dictionary of Modern History,* 1789-1945, The English Library, London, 1962.

Plano, Jack C. and Greenberg, Milton, *The American Political Dictionary,* Seventh Edition, Holt, Rinehart and Winston, New York, 1985.

Radice, Lisanne, Vallance, Elizabeth and Wills, Virginia, *Member of Parliament : The Job of a Backbencher,* Second Edition, Macmillan, London, 1990.

Dhaka University Institutional Repository

Rashid, Harun-or, *The Foreshadowing of Bangladesh,* Asiatic Society of Bangladesh, 1987.

Ray, Rabi, *Parliamentary Diplomacy,* S. Chand and Company Ltd., New Delhi, 1991.

Robertson, David, *A Dictionary of Modern Politics,* Second Edition, Europa Publications Limited London, 1993.

----------, *Dictionary of Politics,* Penguin Books, 1985.

Shafritz, Jay M., *The Harper Collins Dictionary of American Government and Politics,* Harperperenial, New York, 1992.

Sen, Rangalal, *Political Elites in Bangladesh,* University Press Limited, Dhaka, 1986.

Summerscale, John, *The Penquin Encyclopedia,* Penguin Books, 1985.

Sayeed, K.B., *Pakistan : The formative Phase,* Oxford University Press, London, 1968.

Stewart, Michael, *The British Approach to Politics,* George Allen and Unwin Ltd., London, 1967.

সরকারী দলিল পত্র (Public Documents)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান, বাংলাদেশ সরকারী প্রেস, ১৯৭২।

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ, বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের কার্যবাহের সারাংশ, ১৯৭৩-'৭৫, ৭ খন্ড, বাংলাদেশ সরকারী প্রেস, ঢাকা।

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ, বিতর্ক, ১৯৭৩-'৭৫, ৭ খন্ড, বাংলাদেশ সরকারী প্রেস, ঢাকা।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান, বাংলাদেশ সরকারী প্রেস, ১৯৯০, ১৯৮৮ সালের ৩০ জুন পর্যন্ত সংশোধিত।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান, বাংলাদেশ সরকারী প্রেস, ঢাকা ১৯৯৯, ১৯৯৬ সালের ২৮ মার্চ পর্যন্ত সংশোধিত।

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালী-বিধি, ১৯৭৩, ১৯৭৪, ১৯৮০, ১৯৯৭, বাংলাদেশ সরকারী প্রেস, ঢাকা।

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ, বিতর্ক, ১৯৯১-'৯৫, ২২ খন্ড, বাংলাদেশ সরকারী প্রেস, ঢাকা।

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের কার্যবাহের সারাংশ, ১৯৯১-'৯৫, ২২ খন্ড বাংলাদেশ সরকারী প্রেস, ঢাকা।

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ, বুলেটিন, ১৯৯১-'৯৫, ২২ খন্ড, বাংলাদেশ সরকারী প্রেস, ঢাকা।

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ, প্রশ্ন ও উত্তর, ১৯৯১-'৯৫, ২২ খন্ড, বাংলাদেশ সরকারী প্রেস, ঢাকা।

Bangladesh, Government of the People's Republic of *The Bangladesh Gazette extraordinary,* 1991-1995, Bangladesh Government Press, Dhaka.

----------, Bangladesh Election Commission. *Report on the Election to East Bengal Legislative Assembly, 1954.* Bangladesh Government Press, 1977

----------, Bangladesh Election Commission, *Report on the First General Election to Parliament in Bangladesh, 1973,* Bangladesh Government Press, 1973.

----------, Bangladesh Election Commission, *Report on the Fifth Parliamentary Election, 1991,* Bangladesh Government Press, Dhaka, 1991.

Pakistan, *The Constitution of the Islamic Republic of Pakistan,* Manager of Publications, Karachi, 1956.

----------, *The Constitution of the Islamic Republic of Pakistan,* Manager of Publications, Karachi, 1962.

---------, Ministry of Law and Parliamentary Affairs, *Constitutional Documents,Vol. I, II and III,* Manager of Publications, 1964.

----------, Government of Election Commission, *Report on General Elections,Pakistan,1970-1971, Vol. I,* Manager of Publications,1972.

Dhaka University Institutional Repository

প্রকাশিত প্রবন্ধ (Articles)

Akanda, S.A., "The National Language Issue-Potent Force for Transforming East Pakistan Nationalism into Bengali Nationalism," *The Journal of the Institute of Bangladesh Studies,* Vol. I, No. 1, 1976.

----------, "The Working of the Ayab Constitution and the People of Bangladesh," *The Journal of the Institute of Bangladesh Studies,* Vol. 3, 1978.

Banu, U.A.B. Razia Aktar, "The Fall of Sheikh Mujib Regime An Analysis," *Indian Political Science Review,* Vol.15, No.1, January 1981.

Barua, B.P., "Philosophy of the Bangladesh Constitution," *The Journal of Constitutional and Parliamentary Studies,* Vol. 8, No. 2, April-June, 1974.

Choudhury, G.W., "Parliamentary Government in Pakistan", *Parliamentary Affairs,* Vol. II, Winter, 1957-58.

Haq, Abul Fazal, "The Parliament and Politics of Bangladesh, 1973-1982, *South Asian Studies,* Vol. 22, No. 2, July-December, 1987.

----------, "Constitutional Development in Bangladesh", *The Journal of the Institute of Bangladesh Studies,* Vol. VI, 1982-'88.

Jahan, Rounaq, "Bangladesh in 1972 : Nation Building in a New State", *Asian Survey,* Vol. XIII, No. 2, February, 1973.

Maniruzzaman, Talukder, "Bangladesh in 1975 : The Fall of the Mujib Regime and it Aftermath", *Asian Survey,* Vol. XVI, No. 2, February, 1976.

----------, "The Fall of the Military Dictator : 1991 Elections and the Prospect of Civilian Rule in Bangladesh", *The Journal of Pacific Affairs,* Vol. 65, No. 2, Summer 1992.

Dhaka University Institutional Repository

সংবাদপত্র ও সাময়িকী (Newspapers and Periodicals)

দৈনিক ইত্তেফাক, ঢাকা।

ভোরের কাগজ, ঢাকা।

আজকের কাগজ, ঢাকা।

সংবাদ, ঢাকা।

দৈনিক ইনকিলাব, ঢাকা।

দৈনিক লালসবুজ, ঢাকা।

দৈনিক জনতা, ঢাকা।

দৈনিক আল-আমীন, ঢাকা।

সাপ্তাহিক বিচিত্রা, ঢাকা।

সাপ্তাহিক মানচিত্র, ঢাকা।

যায়যায়দিন, ঢাকা।

রোববার, ঢাকা।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ঢাকা।

বাংলাবাজার পত্রিকা, ঢাকা।

Weekly Holiday, Dhaka.

The New Nation, Dhaka.

The Bangladesh Observer, Dhaka.

The Bangladesh Times, Dhaka.

The People, Dhaka.

The Morning News, Dhaka.